একুশ শতকের এজেন্ডা

আবুল আসাদ

একুশ শতকের এজেন্ডা

www.amarboi.org

একুশ শতকের এজেন্ডা

আবুল আসাদ

মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

www.amarboi.org

প্রকাশক

লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী

মিজান পাবলিশার্স

৩৮/৪, বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২

মোবাইল ঃ ০১১-৮৬৪৩২৬, ০১৭১-৪০০২১৮

ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১১২৩৯১

প্রকাশকাল

একুশে বইমেলা, ২০০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

নাসিম আহমেদ

বর্ণবিন্যাস

লাভলী কম্পিউটার

৩৮, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড

২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১১২৩৯৫

মূল্য

২০০ টাকা মাত্র

ISBN

984-8613-06-4

'Ekush Sataker Agenda', Written by Abul Asad
Published By : Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka- 1100.
Printed By : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limited
24, Srish Das Lane, Dhaka- 1100.

www.amarboi.org

উৎসর্গ

বঞ্চিত, নির্যাতিতদের উদ্দেশ্যে

www.amarboi.org

ভূমিকা

আমার তিরিশ বছরের সাংবাদিকতার এক ফসল হিসাবে কয়েক হাজার প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছড়িয়ে আছে সংবাদপত্রের পাতায়। এর বাইরে রয়েছে বিভিন্ন সেমিনারে পড়া অনেক প্রবন্ধ। এ বিরাট সংখ্যার খুব অল্পই আমার সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ থেকে কয়েকটি আমি এ প্রবন্ধ সংকলনের জন্যে বাছাই করেছি। বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের জরুরি প্রয়োজনকে আমি অগ্রাধিকার দিয়েছি। আজকের দুনিয়ায় বিশ্ব শান্তিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করছে মতবাদিক নীতি-দর্শন। ঠাণ্ডা-যুদ্ধের পর যার মৃত্যু ঘটল বলে আমরা মনে করেছিলাম, সেই মতবাদিক দ্বন্দ্বই আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিবর্তন ঘটেছে শুধু পাত্রের। নব্বই-পূর্ব দ্বন্দ্বটা ছিল পুঁজিবাদী-বস্তুবাদের সাথে কমুনিস্ট-বস্তুবাদের। আর এখন দ্বন্দ্বটা পুঁজিবাদী বস্তুবাদের সাথে আদর্শবাদের। এ বিষয়ক আমার অনেকগুলো লেখা এ বইতে আমি নিয়ে এসেছি। এর বাইরে যে লেখাগুলো, তার অধিকাংশই জাতীয় ইতিহাস ভিত্তিক, যার সাথে আমাদের নতুন প্রজন্মের পরিচয় খুবই জরুরি। সময়ের প্রয়োজনের সাথে সংযুক্ত অন্য বিষয়ক দু'একটি প্রবন্ধও রয়েছে।

প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই একুশ শতক শুরুর আগের। তবু বইটির নামকরণ আমি করেছি 'একুশ শতকের এজেন্ডা'। তার কারণ কম্যুনিজমের পতনের পর নব্বই দশকেই একুশ শতকের এজেন্ডা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। নাইন-ইলেভেনের উপর লেখা প্রবন্ধকে বইয়ের প্রথম আর্টিকেল করেছি এজন্যে যে, একুশ শতকের প্রথম বছরে সংঘটিত নাইন-ইলেভেনের ঘটনা একুশ শতক-এজেন্ডার দ্বার-উদ্বোধক।

বইটি প্রকাশে আগ্রহী হওয়ায় মিজান পাবলিশার্সের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আবুল আসাদ

২৬ জানুয়ারি, ২০০৫

www.amarboi.org

সূচিপত্র

আমেরিকা ঃ নাইন-ইলেভেনের পর – ৯
থার্ড মিলিনিয়াম, উন্নয়ন ও বিশ্বাস – ২১
বাংলাদেশ সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান – ২৬
মানবাধিকারের স্বর্ণযুগ – ৩৪
আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন – ৪৩
একুশ শতকের এজেন্ডা – ৪৮
উনবিংশ শতকের অনন্য জাতীয় উত্থান – ৫৪
ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার পুনরুজ্জীবন – ৬৫
সোনালী সূর্যের প্রত্যাশা – ৭৭
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম – ৮৫
বিশ শতকে মুসলিম জাগরণের সূচনা পর্ব – ৯৩
পোপ, ক্রুসেডের পাপ ও পাশ্চাত্য – ১১৪
পশ্চিমের তথ্য-সম্রাজ্য – ১১৮
নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার বিকল্প – ১২৩
সন্ত্রাস-দুর্নীতির ইতিকথা – ১৩৫
দিকে দিকে পুনঃজ্বলিয়া উঠিছে – ১৪৫
সিপাহী বিপ্লবোত্তর মুসলিম রাজনীতি – ১৫৩
মুসলিম সংহতি-আন্দোলন – ১৬৩
দ্বিতীয় বঙ্গ বিভাগ – ১৭১
স্বাধীনতা যুদ্ধের সমাপ্তি-দৃশ্য – ১৮৭
আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার – ১৯৭
অপরাধ দমনের দর্শন – ২০৩
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা – ২১০

www.amarboi.org

www.amarboi.org

আমেরিকা ঃ নাইন-ইলেভেনের পর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমরা যখন মিসিগানের ডেয়ারবোর্নে, ভয়েস অব আমেরিকা থেকে একটা টেলিফোন পেলাম। আমাদের সফর সম্পর্কে ওরা জানতে চায়। একটা প্রশ্ন এই রকম যে, এর আগেও আমি একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলাম, তা থেকে এ সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছি কিনা? খুবই সংগত প্রশ্ন। আমার মনে হয়, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগেও সফর করেছেন এবং এখন সফর করছেন, তাদের কাছে এই পরিবর্তনের ব্যাপারটাই প্রথম বিষয় হবে। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড এয়ার লাইন্সে উঠতে গিয়েই এই পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছিলাম। শুধু জুতা খুলতেই হলো না। বডি সার্চের জন্য বিশেষ স্থানে বিশেষ নিয়মে দাঁড়াতে হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাল ফ্লাইটগুলোতেও যেমন ওয়াশিংটন থেকে মিসিগান এবং মিসিগান থেকে নিউইয়র্ক যাবার সময়েও এই ধরনের চেকিং-এর মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিমান ও যাত্রীদের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিকর। এ বিরক্তি এড়াবার জন্যেই নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন যাবার ইন্টারন্যাল ফ্লাইটের সুযোগ না নিয়ে আমি সড়কপথে ওয়াশিংটন গিয়েছি। আরেকটা বিষয়, এই চেকিং-এর চাপটা নন-আমেরিকান,, নন-ইউরোপিয়ানদের ওপরই বেশি। তবে সাধারণভাবে সকলকেই চেকিং-এর শিকার হতে হয়। ওয়াশিংটনে একটা লাঞ্চে একজন মার্কিন কূটনীতিকের সাথে কথা হচ্ছিল আমাদের। তিনি জানালেন, তাঁকেও বার বার এ ধরনের চেকিং-এর শিকার হতে হয়েছে শুধু নয়, জওয়াবদিহিও করতে হয়েছে কেন তিনি এত বেশি আরব দেশ সফর করেছেন। এটা তার কূটনৈতিক দায়িত্বের অংশ সে কথা বলার আগে তারা বুঝেনি। উল্লেখ্য, ঐ কূটনীতিকের মুখে মুসলমানদের মত দাড়ি রয়েছে।

নাইন-ইলেভেনের পরবর্তী সময়ে এই পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র পরিবর্তন নয়। নাইন ইলেভেনে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা উপলক্ষ করে দুনিয়ায় নানামুখী পরিবর্তনের যে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং সেখানেও পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে সেখানে—আইন ও সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে। পরিবর্তন এসেছে সেখানকার জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে। ইতিবাচক-নেতিবাচক সব ধরনেরই। কিন্তু এতকথা সেদিন ভয়েস অব আমেরিকাকে বলার সময় হয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দেশ। সেখানে কোন কালাকানুন নেই। নাগরিক অধিকার কোনভাবেই সেখানে পদদলিত হয় না অনেক দেশের মত। এটা ছিল আমেরিকানদের গর্ব। কিন্তু নাইন-ইলেভেনের পর এই গর্বে ধ্বংস নেমেছে। নাইন-

www.amarboi.org

ইলেভেনের পর ঐ বছরই ২৬ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট বুশ একটা আইন পাস করেন। তার নাম 'USA Patriot Act'. সে দেশের সংবিধান বিশেষজ্ঞের মতে এ আইনটি 'eroded civil liberties'. এই আইনে প্রশাসন সন্দেহভাজনদের দীর্ঘ সময়, এমনকি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে। কোন অন্যায়ের সাথে জড়িত না হলেও শুধু সন্দেহ হলেই যে কোন নাগরিকের বাড়ি-ঘর, ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান ও রেকর্ড পত্র সার্চ করতে পারা যায় এই আইনের অধীনে। তিনশ' পৃষ্ঠার এই আইনে নাগরিক স্বাধীনতার অনেক কিছুই বাঁধা পড়েছে। কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, সেলসশপ ১০ হাজার অথবা তার বেশি অঙ্কের ডলার মূল্যের জিনিস কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করলে তার তথ্য সরকারকে জানাতে হবে।

নাগরিক অধিকার খর্বকারী এই 'প্যাট্রিয়ট এ্যাক্ট' প্রবর্তন করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন জনগণের নিরাপত্তা বিধানের নামে। মার্কিন 'বিল অব রাইটস' এর পরিপন্থী এই আইন পাস না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি ক্ষতি হতো বলা মুশকিল, তবে এই আইন ক্ষতি করছে বিশেষ করে মার্কিন মুসলমানদের এবং অন্যান্য দেশের মুসলমানদের। নাইন-ইলেভেনের পর বিপুল সংখ্যক মার্কিন মুসলিম নাগরিককে ডিটেনশনে রাখা হয়েছে এই আইনের অস্ত্র প্রয়োগ করে। বিনা অপরাধে বিনাবিচারে এই আটকে রাখাকে সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনীর পরিপন্থী বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই। মার্কিন সংবিধানের এই ষষ্ঠ সংশোধনীতে বলা হয়েছে," .....The accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation, to be confronted with the witnesses against him." কিন্তু নাইন-ইলেভেনের পর সংবিধানের এই নাগরিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে।

নাইন- ইলেভেনের ঘটনার সাথে মুসলমানদের জড়িত করা হয়েছে। সংবিধানসম্মত নিরপেক্ষ কোন কোর্টে তা প্রমাণিত না হলেও মুসলমানরা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ বিদেশী মুসলমানরাও পাইকারিভাবে সন্দেহের তালিকায় পড়েছে। দু'হাজার এক সালের নবেম্বরে মার্কিন এটর্নি জেনারেলের আদেশ অনুসারে এই ধরনের ৫ হাজার মুসলমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার মধ্যে মাত্র ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়, তাও সন্ত্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অভিযোগে নয়। এরপরও আরও তিন হাজার মুসলিম ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের ঘোষণা এটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে দেয়া হয়।

মুসলিম ব্যক্তির মত মুসলিম দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ওপরও বৈষম্যমূলক আইনের ছোবল গিয়ে পড়ে। দু'হাজার এক সালের ৪ ডিসেম্বর এক আদেশ বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'হোলি ল্যান্ড ফাউন্ডেশন ফর রিলিফ এন্ড ডেভলপমেন্ট' (HLF) নামের

www.amarboi.org

মুসলিম দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। মার্কিন সরকার এই সংগঠনকে ফিলিস্তিনী 'হামাস' গ্রুপের সাহায্যকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে। কিন্তু HLF পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় তারা কোনভাবেই কোন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নয়। তারা রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে ফিলিস্তিনী ইয়াতিম, বিধবা ও দরিদ্রদের সাহায্য করে। এই মানবিক সাহায্যের বাইরে কোন দল বা পক্ষকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য তারা দেয়নি। মনে করা হয় ফিলিস্তিনীদের অধিকার দলনকারী ইহুদি লবী বহুদিন থেকে চেষ্টা করছিল এই ধরনের মুসলিম দাতব্য সংস্থার কণ্ঠরোধ করার জন্যে। নাইন-ইলেভেনকে একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে মার্কিন প্রশাসনকে দিয়ে এইভাবে তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করল। HLF এর পর গ্লোবাল রিলিফ ফাউন্ডেশন (GRF) ও বেনেভলেন্স ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন (BIF)-এর ওপরও মার্কিন সরকার অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। অথচ এই দাতব্য সংস্থার বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার সুনির্দিষ্ট কোন সন্দেহের কথা বলতে পারেনি, কিংবা তাদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ এনে মামলাও দায়ের করতে পারেনি। এইদিক থেকে বলা যায়, একেবারে বিনা অপরাধেই তিনটি দাতব্য সংস্থাকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এই তিনটি মুসলিম দাতব্য সংস্থারই রেকর্ড রয়েছে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রিলিফ কার্যক্রম পরিচালনায়। তারা অনেকগুলো উন্নয়ন প্রকল্পও পরিচালনা করতো। সংস্থাগুলো বন্ধ করে দেয়ায় পঞ্চাশ হাজার নিয়মিত দাতার দানের হাতকে ভেঙে দেয়া হয়েছে। সরকারি এই কার্যক্রম সমালোচিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকেই। 'Bill of Rights' এর পরিপন্থী বলে একে অভিযুক্ত করা হয়েছে। Bill of Rights (Fourth Amendment)-এ বলেছে, "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated and no warrants shall issue, but upon probable cause."

একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সামাজিক ও গবেষণা সংস্থার কাজেও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে নাইন-ইলেভেনের পর। দু'হাজার দুই সালের জানুয়ারিতে 'Operation Green Quest' এর অংশ হিসেবে গোপন ও বেনামা' প্রমাণের ভিত্তিতে 'material support for foreign terrorist organization' এর অভিযোগ তুলে ইসলামি সংস্কার আন্দোলন বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, (IIIT) এবং 'গ্রাজুয়েট স্কুল অব ইসলামিক সোস্যাল সায়েন্স' এর মত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও অভিযান চালানো হয়। এই ধরনের অভিযানকে মার্কিন সংবিধানের পরিপন্থী বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ".... The use of secret evidence is in violation of the Fifth Amendment, which states that no person shall be deprived of life, liberty, or property, without due process of Law."

www.amarboi.org

নাইন-ইলেভেনের ঘটনার জন্যে সর্বতোভাবে মুসলমানদের দায়ী করা এবং নিরাপত্তার জন্যে শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে ক্ষতিকর মনে করার এই সরকারি প্রবণতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরের এক শ্রেণীর ব্যক্তি ও সংস্থার মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ উস্কিয়ে দেয়। 'সাউদার্ন ব্যাপিস্ট কনভেশন' (SBC) দু'হাজার দুই সালের বার্ষিক সম্মেলনে জ্যাকস ভিল ব্যাপ্টিস্ট চার্চ-এর রেভারেন্ড জেরী ভাইনস মুসলমানদের প্রতি কুৎসিত আক্রমণ করে বলেন, "Prophet Muhammad was a 'demon possessed pediphile.' Allah is not Jehovah either. Jehovah's not going to turn you into terrorists that will try to bomb people and take the lives of thousands and thousands people." 'ক্রিশ্চিয়ান ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক' তার '700 club' প্রোগ্রামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলে যে, 'ভয়ংকর ও ধ্বংসকামী মুসলমানদের দ্বারা আমেরিকা আক্রান্ত।' তিনি বলেন, "স্বয়ং কুরআন বলেছে, যেখানেই কাফেরদের দেখ হত্যা কর।" মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় রক্ষণশীল ভাষ্যকার এ্যানি কোলটার মুসলমানদেরকে 'Camel riding nomad' বলে অভিহিত করেন। তিনি তাঁর 'Online column' এ লিখেন, "We should invade their (Muslim) countries, kill their leaders and convert them to Christianity" ফ্রি কংগ্রেস ফাউন্ডেশন-এর সভাপতি Paul Weyrich মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক বিভাগকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, ' ডাক বিভাগের 'Eid Greeting' সীলে 'টুইন টাওয়ার'-এর অবয়ব উৎকীর্ণ থাকতে হবে।' কারণ তাঁর মতে 'American's most notable experince with Islam was the attacks on 9-11." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ইভানজেলিস্ট রেভারেন্ড বিলি গ্রাহামের ছেলে ইভানজেলিস্ট ফ্রাংকলিন গ্রাহাম বার বার ইসলামকে 'Wicked', 'violent' হিসেবে অভিহিত করেন। টিভি চ্যানেল NBC-এর এক প্রোগ্রামে তিনি বলেন, " We are not attacking Islam, but Islam attacked us. The God of Islam is not the same God..... It is a different God..... I belive it is a very eivil and wicked religion". অবশ্য পরে বিলি গ্রাহাম বলেন, 'It is not my calling to analyze Islam? কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার ভ্রান্তি দূর করার জন্যে আলোচনার আহ্বান করলে তিনি আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেন। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার এভাবে চলতেই থাকে। Idaho স্টেটের 'ক্রসরোডস এ্যাসেম্বলি অব গড চার্চ' এর একটি ডিসপ্লে সাইনবোর্ড এ লিখা হয় "The spirit of Islam is the spirit of the Antichrist." লসএঞ্জেলসের 'Simon wiesenthal centre Museum of tolerence' এর ডীন রাব্বি মারভিন হায়ার টিভি চ্যানেল CNN কে বলেন, "There are direct references in the Quran to violence." "টুওয়ার্ড ট্রাডিশন"-এর সভাপতি রাব্বি ড্যানিয়েল ল্যাপিম ঘোষণা করেন,

www.amarboi.org

"Conservative Christian are the natural allies of the Jewish community..... Today we are witnessing two distinet religious civilization in conflict : That of the Quran, allied with the believers in no God, violently challenging the civilization of the Bible, of Christianity and Judaism."

এ ধরনের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী বিষোদগারের দৃষ্টান্ত অজস্র। নাইন-ইলেভেনের পর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্যে সরকারিভাবে মুসলমানদের টার্গেট করার সঙ্গে সঙ্গেই স্রোতের মত এই বিষোদগার শুরু হয়। এই বিষোদগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক শ্রেণীর মানুষকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করে। নানা স্থানে মুসলিম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়। Council on American-Islamic Relation (CAIR) এর একটা রিপোর্ট বলছে, "The 9-11 attacks were followed by a dramatic rise in anti-Muslim hate crimes. CAIR received 1717 reports of harassment, violence and other discriminatory acts in the first six months. Although violent attacks have dropped sharply, CAIR has logged more than 325 complains in the second six months period after the attacks-a 30 percent increase over the same period prior to 9-11."

ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী 'hate-speech' ও 'hate-crime' এর মত নেতিবাচক পরিবর্তনের পাশাপাশি আরেকটা ইতিবাচক পরিবর্তন মার্কিন জনজীবন প্রত্যক্ষ করে। ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী হিংসাত্মক অপপ্রচারের প্রতিটির জবাব আমেরিকান মুসলমানরা দেবার চেষ্টা করেছে। তাদের পাশাপাশি আমেরিকান মুসলমানদের দুর্দিনে এগিয়ে এসেছে বিবেকসম্পন্ন অমুসলিম আমেরিকানরা। 'Southern Baptist Convention'-এর মুসলিম ও ইসলাম বিরোধী জঘন্য অপপ্রচারের জবাবে এগিয়ে এসেছে 'American Baptists' নামের ভিন্ন একটি সংগঠন। দু'হাজার দুই সালের ১৪ জুন 'American Baptist Churches' এর সাধারণ সম্পাদক A. R. Medley বলেন, ".........I am deeply saddened by remarks made by some Baptist leaders and other Christans that have maligned the Islamic faith and religion ......" এর আগে দু'হাজার এক সালের নবেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'General Board of American Baptist churches' এর পক্ষ থেকে anti-Islam, anti-Muslim ও anti-Arab প্রচারণার তীব্র প্রতিবাদ করে এক ঘোষণা প্রচার করা হয়। সে ঘোষণায় আমেরিকানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় ঃ

1. To persue a better understanding of Islam, Muslims and Arabs (including Arab Christians) by including in their

www.amarboi.org

churche's educational programs a study of Islam, of Muslim world and the Christian minorities within that world. The world and of the issues that have united and divided us by inviting Muslims and Arabs to be a part of the leadership and fellowship of such programme;

2. To encourage local and regional ecumenical and interfaith agencies to seek conversation and cooperation with Muslim religious organisations.

3. To advocate and defend the civil rights of Arabs and Muslim living in the U. S. by such means as monitoring organisation and agencies which exercise responsibility for the peace, welfare and security of the community;

4. To reject the religious and political demogoguery and manipulation manifest in the reporting of events related to the middle east, to seek an understanding of the underlying causes of the event, and to condemn violence as a means of enforcing national will or achieving peace;

5. To challenge and rebut statements made about Islam, Muslims and Arabs that embody religious stereotyping, prejudice and bigotry."

"ন্যাশনাল ব্যাপ্টিস্ট কনভেশন" নামের আরও একটি আমেরিকান সংস্থা ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী হিংসাত্মক প্রপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়, "To pray for calm and rational thought and behaviour, to pray that our shock and anger not turn to hatred of fear, to pray that our passion do not goad us into cries for vengence, to pray that the finest character of America will emerge from the chaos of this experience". নর্থ আমেরিকান কংগ্রেস অন ল্যাটিন আমেরিকা', 'কংগ্রেসনাল ব্ল্যাক এসোসিয়েট', 'দি সিভিল লিবারাটিজ কোয়ালিশন' প্রভৃতি সংস্থা মুসলিম বিরোধী প্রোপাগান্ডা ও কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করে। The Congressional Black Associates দু'হাজার এক সালের ১৬ নবেম্বর নতুন কালাকানুনের বিরোধিতা করে বলে, ... Although profiling is now being directed primarily at Muslims and people who look Middle Eastern, experience shows that it will also be used

www.amarboi.org

against other minorities." দু'হাজার এক সালের ডিসেম্বরে The American Civil Liberties Union, (ACLU) এবং অন্য আরো ১৮টি সংস্থা ফেডারেল কোর্টে গিয়ে আটক লোকদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, যেমন তার কি অপরাধ, তারা কোথায় কতদিন ধরে আছে, তাদের উকিলদের নাম কি ইত্যাদি জানার চেষ্টা করে। তারা 'গ্লোবাল রিলিফ ফাউন্ডেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা রাবিহ হাদ্দাদের আমেরিকা থেকে বহিষ্কারাদেশ সংক্রান্ত মামলার প্রকাশ্য শুনানির দাবিতে দুটি মামলা দায়ের করে। ACLU দু'হাজার দুই সালের জানুয়ারি মাসে শিকাগোর আদালতে দায়ের করে এ ধরনের আরও দুটি মামলা।

এসব প্রতিবাদ ও আইনী লড়াই ইতিবাচক ফলও দান করে। দু'হাজার দু'সালের আগস্টে একজন ফেডারেল বিচারক তার রায়ে বলেন যে, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট রাবিহ হাদ্দাদের মামলার শুনানি রুদ্ধদ্বার কক্ষে করে অসাংবিধানিক আচরণ করছে। কোর্ট জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে আটক ব্যক্তিদের নাম প্রকাশেরও নির্দেশ দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনের অসাংবিধানিক উদ্যোগকে সিনেটও বানচাল করে দেয়। দু'হাজার এক সালের ৮ নবেম্বর সিনেটর রবার্ট সি. স্মিথ 'Intelligence Authorisation Bill' নামে একটি আইন পাস করানোর জন্য সিনেটে আনেন। এই আইনের লক্ষ্য ছিলো, অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া হলো কোন তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে, তা অভিযুক্ত পক্ষের কাছ থেকে গোপন রাখা। সিনেটর প্যাট্রিক লেহী এবং সিনেট বব গ্রাহামের মতো ডিমোক্রেট সিনেটরদের সোচ্চার কণ্ঠের বাধা এই আইন প্রণয়নের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

কংগ্রেসের হাউস জুডিশিয়ারী কমিটি ও ব্ল্যাক ককাসের সদস্য জন কনিয়াস জুনিয়র কালাকানুনের একজন তুখোড় সমালোচক। তিনি নানাভাবে মুসলিম আটকদের সহায়তা দান করেন। দু'হাজার দু'সালের ২২ জানুয়ারি তিনি The Detroit News-এ বলেন, "To be clear, I have firmly supported the need to bring terrorists to justice, while consistently protesting against government abuses of our constitution...... I fear the Justice Department, in its zealousness to protect our freedoms by detaining Middle Easterner without disclosing evidence and holding secret hearings, is quickly whittling away the constitutional foundation that has made freedom a becon for the world."

নাইন-ইলেভেনের পর ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মার্কিন মিডিয়া আগ্রাসন ছিলো খুবই ভয়ংকর। সিয়ান হ্যানিটি, বিল ও' রেলি, রীচ লোয়ারী, ড. ল'রা শ্লেসিংগার, রস লিমবার্গ, ক্যাল টমাস এবং এ্যালেন কিয়েসের মতো বিখ্যাত মার্কিন ভাষ্যকাররা তাদের মুখ থেকে বিষ উদ্‌গার করেন। এরই পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের

www.amarboi.org

কিছু কিছু উদ্যোগ ইসলাম ও সন্ত্রাসের মধ্যকার পার্থক্য প্রদর্শনে এগিয়ে আসে। 'Oprah winfrey show' নামের NBC টেলিভিশনের ১ ঘন্টার টেলিভিশন অনুষ্ঠান মুসলমানদের জীবন ও ইসলামি আদর্শ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরে। অনুষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয় ছিলো। 'ওয়ার্নার ব্রাদার্স টেলিভিশন নেটওয়ার্ক-এর 'Seventh Heaven Show' এবং Noggin and Nickelodeon- এর A walk in your shoes' প্রোগ্রাম ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে ভুল ধারণা নিরসনে এগিয়ে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'Washington Post' সহ অনেক সংবাদপত্র তাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে মার্কিন প্রশাসনের বৈষম্যমূলক আইন ও আচরণের তীব্র সমালোচনা করে। দু'হাজার দুই সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন পোস্ট লিখে,"Ten days after the 9-11 attacks, the administration instructed its immigration judges to keep certain proceedings closed. Not only would hearings be conducted in secret with 'no visitors, no family, and no press' present, but the' 'record of the proceeding (was) not to be released to anyone' either including 'confirming or deying whether such a case is on the docket or scheduled for a hearing'........ . Public access has been not-existent anyway. Immigration cases carry enormous consequences for people's freedom. The trials should, like criminal trials, be open for public scruitiny and criticism unless there is a compelling reason to the contrary. Holding trials in secret is a tactic unworthy of a great legal system.

উপরে যে আলোচনা হলো তার গোটাটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরের কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও এমন কথা বলার অনেক আছে। বিশেষ করে নাইন-ইলেভেনের পর আফগানিস্তান, ইরাকসহ বিভিন্ন দেশের ব্যাপারে যে মার্কিন পলিসির প্রকাশ ঘটেছে, মার্কিন সংবিধানের নিরিখে সে সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। কিন্তু আজ এ বিষয়টা আমার আলোচ্য নয়। তবে গুয়ানতানামো বন্দীখানার ব্যাপারটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের ব্যাপায় নয়। প্রায় সাতশ'র মতো লোককে সেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে। যারা মার্কিন কোর্ট ও মার্কিন আইনের আশ্রয় পাচ্ছে না। অথচ তারা মার্কিনীদেরই হাতে বন্দী। মার্কিন সরকারের বন্দী হলেও মার্কিন আইন ও মার্কিন কোর্টের হাত তাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না এবং তাদের ব্যাপারে পৃথিবীর সব আইন অক্ষম। মানবাধিকার লংঘনের এতোবড় ঘটনা সভ্য জগতের ইতিহাসে নেই। নাইন-ইলেভেন-পরবর্তী মার্কিন জীবনের এটাও একটা পরিবর্তন। গুয়ানতানামোকে বাদ দিয়ে মার্কিন ইতিহাস লেখা যাবে না।

www.amarboi.org

নাইন-ইলেভেন মার্কিন আইন ও মার্কিন আচরণের মতো মার্কিন মুসলমানদের জীবনেও পরিবর্তন এনেছে। হত্যা-ধর্ষণ থেকে শুরু করে সম্পত্তির ক্ষতি, নানাভাবে নির্যাতন ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার তারা শিকার হয়েছে। কিন্তু এই নেতিবাচক পরিবর্তন তাদের জীবনে আরেকটা ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। সেটা হলো আমেরিকানদের দৃষ্টি ইসলাম ও আমেরিকান মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই ইসলামকে বোঝার ও মুসলমানদের জানার জন্যে তারা এগিয়ে এসেছে। নাইন-ইলেভেনের পরপরই মার্কিন প্রশাসনের একটা অংশ ও একশ্রেণীর আমেরিকানের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধিতা যেমন তীব্র হয়ে ওঠে, তেমনি এ সময়ই সাধারণ ও সচেতন আমেরিকানদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি আগ্রহ দারুণভাবে বেড়ে যায়। এর একটা পরিমাপক হলো নাইন-ইলেভেনের পর প্রথম এক কোয়ার্টারে ইসলাম গ্রহণের হার ছিল প্রতি মাসে ৪ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার। নাইন-ইলেভেনপূর্ব সময়ের চেয়ে এই হার প্রায় চার গুণের মতো বেশি। পরে এই হার কমে এসেছে বটে, কিন্তু তবু বর্তমান হারও নাইন-ইলেভেন পূর্ব সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। সাধারণ আমেরিকানরা খুঁজে খুঁজে ইসলামি বই-পত্র ও পত্র-পত্রিকা যোগাড় করে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে জানার আগ্রহ মেটাচ্ছে। সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরে একদিন আমি নিউইয়র্কে মেসেজ সম্পাদকের টেবিলে বসেছিলাম। এ সময় তার কাছে একটা টেলিফোন এলো আটলান্টা থেকে। একজন অমুসলিম মেয়ে মেসেজ পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলি জানার জন্যে এই টেলিফোন করেছিল। মেয়েটি কোথাও থেকে এই পত্রিকার নাম পেয়েছিল। সম্পাদক সাহেব বললেন, এ ধরনের টেলিফোন, চিঠিপত্র, ই-মেল তারা অহরহই পাচ্ছেন। এই সফরে ওয়াশিংটন ডেট্রয়েট, নিউইয়র্ক যেখানেই ধর্মনেতা, আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদদের সাথে দেখা হয়েছে, তাঁরা বলেছেন যে, নাইন-ইলেভেনের পর রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ও অনুষ্ঠানে তাদের ডাক বেড়ে গেছে। স্থানীয়ভাবে মুসলমানরা স্থানীয় রাজনীতিক ও সমাজ নেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারা পরিবর্তনের আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক। নাইন-ইলেভেনের পর থেকে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দলের স্থানীয় নেতা এবং সিনেট ও কংগ্রেস সদস্যরা মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছেন। নাইন-ইলেভেন পরবর্তী বিপর্যয়কর মুহূর্তে বহু ক্ষেত্রেই তাদের সহযোগিতা-সান্ত্বনায় মুসলিম আমেরিকানরা নিরাপত্তা বোধ করেছে। মেরিল্যান্ড অথবা ভার্জিনায় একটা চমকপ্রদ গল্প শুনেছিলাম। সেখানকার গভর্নর অফিসে একজন মুসলিম আমেরিকান চাকরি করেন। নাইন-ইলেভেনের ঘটনার পরদিন তিনি ভয়ে অফিসে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। গভর্নর এ বিষয়টা জানার সাথে সাথেই নিচে ছুটে যান কর্মচারির বাড়িতে এবং তাকে অভয় দিয়ে অফিসে নিয়ে আসেন।

নাইন-ইলেভেনের পর আমেরিকান মুসলমানদের জীবনে পরিবর্তনের আরেকটা বড় দিক হলো, তাদের দৃষ্টি এবার তাদের নিজেদের দিকে খুব ভালোভাবেই পড়েছে

www.amarboi.org

বলে আমার মনে হয়েছে। তাদের শক্তি ও সম্ভাবনাকে যেন তারা নতুন করে আবিষ্কার করছে। এবার মিসিগানের ডেট্রয়েট-ডিয়ারবোর্নে থাকাকালে সেখানে আরব-আমেরিকানদের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দলের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। তিন দিনের এই কনভেনশনে ডেমোক্র্যাটিক দলের নমিনেশনকামী আটজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীই বক্তৃতা করেন। শুনেছি, আরব-আমেরিকান এই কনভেনশন মার্কিন রাজনীতিকদের কাছে এবার যে গুরুত্ব পেয়েছে, তার শতভাগের এক ভাগ গুরুত্বও অতীতে পায়নি। কনভেনশনের দ্বিতীয় দিনে বার্ষিক ডিনার অনুষ্ঠিত হয়। আমরা এই ডিনারে দাওয়াত পেয়েছিলাম। ডিনার পার্টিতে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিক পার্টির নেতৃবৃন্দসহ একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বক্তৃতা করেন। তারা সবাই মুসলিম স্বার্থের পক্ষে কথা বলেন। আমেরিকান মুসলমানরা যে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে তাও তারা স্বীকার করেন এবং এ জন্যে সরকারকে তারা অভিযুক্ত করেন। কিন্তু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আরব-আমেরিকান নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় তাদের আত্ম-সমীক্ষা ও আত্মসমালোচনা ছিল। মুসলমানদের বিভিন্ন গ্রুপ-নামে বিভক্ত থাকাজনিত অনৈক্যকে তারা আমেরিকান মুসলমানদের দুর্বলতা ও দুর্ভাগ্যের একটা কারণ বলে উল্লেখ করেন। এই দুর্বলতা না থাকলে তারা মার্কিন রাজনীতির মূল স্রোতধারায় তাদের শক্তিশালী অবস্থান চিহ্নিত করতে সমর্থন হতো। মুসলিম নেতৃবৃন্দ বলেন, 'ভোট আমাদের Right এবং ব্যালট আমাদের Might. এই অস্ত্র আমরা এতদিন ব্যবহার করিনি, ব্যবহার করতে হবে এখন এই অস্ত্র।' উক্তিটি আমি মনে করি সব আমেরিকান মুসলমানদেরই। মসজিদগুলোর সামনে শামিয়ানা টাঙিয়ে মুসলমানদের ভোটার রেজিস্ট্রেশনের হিড়িকের মধ্যে এই মনোভাবেরই সরব প্রকাশ আমি দেখেছি। আত্মপরিচয়সহ নিজেদের প্রকাশ করার দৃঢ়তাও সৃষ্টি হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে নাইন-ইলেভেনের পর। নিউইয়র্কে অথবা ওয়াশিংটনে একজন কলেজ শিক্ষকের কাছে গল্প শুনেছিলাম যে, নাইন-ইলেভেনের পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম মেয়েদের মধ্যে মাথায় রুমাল পরার অভ্যাস বাড়ছে। ভয়-সংকোচের বদলে তারা সাহসী হয়ে উঠেছে। একটা বিস্ময়কর ঘটনা হলো, ভার্জিনিয়ার স্টেট সিনেটের জন্যে সাঈদ আফিফা নামে একজন বোরখাধারী মহিলা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নমিনেশন পাওয়ার নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে। এটা কোন মিরাকল নয়। মিথ্যার ওপর সত্যের জয় এভাবেই সূচিত হয়ে থাকে।

নাইন-ইলেভেনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'হোম এ্যাফেয়ার্স'-এ এত পরিবর্তন এলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ফরেন এ্যাফেয়ার্স'-এ কোন পরিবর্তন লক্ষ করিনি। সফরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগান পলিসি, ইরাক পলিসি, ফিলিস্তিন-ইসরাইল পলিসি ও 'ওয়ার অন টেরর' প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক মতবিনিময় আমাদের হয়েছে। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে কোন নতুন চিন্তার কোন ইঙ্গিত আমরা পাইনি। টুইন টাওয়ার

www.amarboi.org

ধ্বংসের ঘটনার সাথে একজন আফগান জড়িত না থাকলেও এবং লাদেন এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার প্রত্যক্ষ ও সন্দেহাতীত প্রমাণ না মিললেও হত্যা-ধ্বংসের মাধ্যমে আফগানিস্তান দখল এবং ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের নাম-নিশানা পাওয়া না গেলেও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইরাক কুক্ষিগত করাকে মার্কিন প্রশাসন এখনও সম্পূর্ণ সঠিক মনে করছে। এটা তাদের সিদ্ধান্তগত দৃঢ়তা, না ঘটনা-পূর্ব কোন মাইন্ড সেট-এর ফল, তা বলা মুসকিল। তবে সত্য এই যে সত্যের মুখোমুখি মার্কিন প্রশাসনকে একদিন দাঁড়াতেই হবে। সিনেটর রবার্ট বায়ার্ডও এ কথাই বলেছেন। দু'হাজার তিন সালের ২১ মে সিনেটের এই সাবেক মেজরিটি লিডার ডেমোক্র্যাট দলীয় সিনেটর বায়ার্ড সিনেটের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে এ কথাটাই বলেছিলেন এভাবে;

"Truth has a way of asserting itself despite all attempts to obscure it. Distortion only serves to derail it for a time. No matter to what lengths we humans may go to obfuscate facts or delude our fellows, truth has a way of squeezing out through the cracks, eventually.... the American people unfortunately are used to political shading, spin, and the usual chicanery they hear from public officials. They patiently tolerate it up to a point. But there is a line. It may seem to be drawn in invisible ink for a time, but eventually it will appear in dark colors, tinged with anger. When it comes to shedding American blood-when it comes to wreaking havoc on civilians, on innocent men, women, and children-callous dissembling is not acceptable. Nothing worth that kind of lie-not oil, not revenge, not reelection, not somebody's grand pipedream of a democracy domino theory. And mark my words, the calculated intimidation which we see so often of late by the powers that be' will only keep the loyal opposition quiet for just so long. Because eventually, like it always does, the truth will emerge. And when it does, this house of cards, built of deceit, will fall."

অনুরূপভাবে ফিলিস্তিন-ইসরাইল ব্যাপারেও মার্কিন পলিসি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বাপর সব ঘটনা এটাই প্রমাণ করে, মার্কিন সরকার ফিলিস্তিনে অবশ্যই শান্তি চায়, কিন্তু সে শান্তি ইসরাইলী অভিভাবকত্বে, ইসরাইলকে অদ্বিতীয় অবস্থায় রেখে। ব্যাপারটা ঠিক ভারতের ব্রিটিশ শাসক লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক দেশীয় রাজ্যগুলোর জন্যে প্রণীত অধীনতামূলক মিত্রতার মতই। এ না হলে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা

www.amarboi.org

সমাধানের জন্য 'সেলফ রুল' এবং আজকের 'রোডম্যাপ' কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। পিএলও যখন ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিল, তখন সেলফ রুলের ভাঁওতাবাজিতে না গিয়ে যদি তখনই ১৯৬৭ সালে অধিকৃত ফিলিস্তিনী অঞ্চল ইসরাইল ফেরত দিত, তাহলে অশান্তির বড় কারণ দূর হয়ে যেত। হামাসেরও সৃষ্টি হতো না। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপন সহজ হয়ে যেত। কিন্তু ইসরাইল শান্তি চায় না, চায় আধিপত্য, যার সুন্দর নাম হলো 'অধীনতামূলক মিত্রতা'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত ইসরাইলী এই নীতিকেই এনডোর্স করছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির পথে এই মানসিকতাই সবচেয়ে বড় বাধা। আমি এবারের সফরকালে শান্তির জন্যে ইসরাইল বিনা শর্তে ১৯৬৭ সালের অধিকৃত এলাকা ছাড়তে পারে কিনা এই প্রশ্ন তুলেছিলাম। স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও ন্যাশনাল সিক্যুরিটি কাউন্সিলের দু'জন দায়িত্বশীল ব্যক্তি একই জবাব দিয়েছেন ঃ সমস্যাটা এত সরল নয়, সমাধান এত সহজ নয়। ইহুদী একটি গ্রুপের সাথে আমাদের আলোচনা ছিল। সেখানেও এই প্রশ্ন আমি করেছিলাম। বিস্ময়করভাবে জবাব একই রকমের ছিল- সমস্যাটা এত সহজ নয়। তবে সেলফ রুল ফর্মুলাও সমস্যাকে সহজ করেনি। রোডম্যাপ সমস্যাটা সহজ করে দেয় কিনা তা এখন দেখার বিষয়।

নাইন-ইলেভেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় নীতিকেই প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাব তার অভ্যন্তরীণ নীতিতে যেমন কিছু নেতিবাচক প্রভাব এনেছে, তেমনি তার বৈদেশিক নীতির ইতিবাচক পরিবর্তনে বাধার সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনদিনই আর তেমন হবে না, যেমনটা ছিল নাইন-ইলেভেনের পূর্বে।" এর সাথে আমি একমত নই। আমি সিনেটর বায়ার্ডের সাথে একমত যে, মার্কিন জনগণের দ্বারাই অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয়। তবে এর জন্যে অপেক্ষাটা অনেক সময় কষ্টকর হয়ে ওঠে।

---

* ২০০৩ সালের ১৩ অক্টোবর থেকে প্রায় ২৪ দিন ব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে। প্রবন্ধটি সেই সফরের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

www.amarboi.org

থার্ড মিলিনিয়াম, উন্নয়ন ও বিশ্বাস

একটা বই হাতে এসেছে। নাম "Threshold 2000", আসন্ন 'গ্লোবাল এজ'-এ যে 'ক্রিটিক্যাল ইস্যুগুলো আসবে এবং 'স্পিরিচুয়াল ভ্যালু' এর ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দেবে, সে বিষয়েই বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মিলিনিয়াম ইনস্টিটিউট'।

দু'হাজার সাল শুরু হবার সাথে সাথে তৃতীয় 'মিলিনিয়াম'-এর যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে। এই সাথে বিগত দুই মিলিনিয়ামের ইতিহাস এবং তার সাফল্য-ব্যর্থতার চিত্র সামনে রেখে তৃতীয় 'মিলিনিয়াম' এর ছবি আঁকার কাজ সাড়ম্বরে শুরু হয়েছে সেই সাথে 'থ্রেশোল্ড ২০০০' এ ধরনেরই একটা কাজ।

প্রথমে বইটিতে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৃতীয় মিলিনিয়ামের সম্ভাব্য ছবির ওপর চোখ বুলানো হয়েছে। তারপর উত্তরাধিকারমূলক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহের ওপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আসছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে মানবজাতির অগ্রাধিকার কি হবে তার ওপর এসেছে একটি অধ্যায়। পরবর্তী অধ্যায়টি ঐতিহ্যবাহী ধর্মসমূহের ভূমিকার ওপর। উপসংহারমূলক আরও দুটি অধ্যায় এরপর রয়েছে।

রাজনীতি আসলে 'শাসন দণ্ড'-এর বাইরে আর কিছু নয়। শাসনের যা উপজীব্য, যার জন্যে শাসন, সেটাই প্রকৃতপক্ষে মূল বিষয়। এ মূল বিষয়কে আমরা 'অর্থনীতি', 'বিশ্বাস' বা 'আদর্শ' ইত্যাদি নামে ডাকতে পারি। 'থ্রেশোল্ড ২০০০' গ্রন্থের লেখকদের ধন্যবাদ যে, তারা এটা বুঝেছেন। তাদের গ্রন্থে এ দুটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

ক্রিটিক্যাল ইস্যুসমূহের ওপর আলোচনার শুরুতেই তাঁরা স্বীকার করেছেন, চলমান বিশ্ব অর্থনীতি ব্যর্থতা বরণ করেছে। ষাটের দশকের শুরুতে বিশ্বের জন্যে যে 'উন্নয়ন কৌশল' গ্রহণ করা হয়েছিল তা কার্যত আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাঁরা লিখেছেন, When the United Nations Launched the First Development Decade in the 1960s, there was high hope that the nations of the world would move forward in joint efforts to create international system and structure that address the urgent needs of the emerging nations of Asia, Africa and Latin America while assuming the continued growth of the market oriented industrialised economies---. Now, four development decade later, there is still evidence that the numerous

www.amarboi.org

development plans and strategies embraced over the years have done nothing to improve significantly the situation of the poor of the world or to enhance the prospects of the whole community life on the Earth. On the contrary as we look around today, the struggle for life seems all the more perilous.

অর্থাৎ জাতিসংঘ ষাটের দশকে যে উন্নয়ন অভিযানের যাত্রা শুরু করেছিল তা নিয়ে বড় আশা ছিল যে, পৃথিবীর জাতিগুলো যৌথ উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জরুরি প্রয়োজন পূরণ করে সামনে এগিয়ে যাবে এবং সেই সাথে ধরে রাখবে শিল্পোন্নত অর্থনীতির অব্যাহত প্রবৃদ্ধি। কিন্তু আজ চার দশকের উন্নয়ন যাত্রার পর দেখা যাচ্ছে, এই দীর্ঘ সময়ে বাস্তবায়িত অসংখ্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশল পৃথিবীর দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন অথবা বৃহত্তর সমাজের জীবনমান উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টিতে উল্লেখের মত কোন অবদান রাখেনি। বরং চারপাশে তাকালে দেখা যাচ্ছে, জীবন সংগ্রামকে আরও বিপজ্জনক করে তোলা হয়েছে।

মূল্যবান এ স্বীকৃতি খুবই মূল্যবান লোকদের কলম থেকে এসেছে। 'গ্রেশোল্ড ২০০০' গ্রন্থের লেখক 'জেরাল্ড ও বার্নি' মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্যে তৈরি 'Global 2000 Report' প্রকল্পের পরিচালক এবং 'মিলিনিয়াম ইনস্টিটিউট'-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক। তার দু'জনসহ লেখক জেন ব্লেওয়েট এবং ক্রিস্টেন আর, বার্নি যথাক্রমে 'earth community center'- ও 'মিলিনিয়াম ইনস্টিটিউট'-এর নির্বাহী পরিচালক ও রিসার্চ এসোসিয়েট।

জাতিসংঘ পরিকল্পিত চলমান বিশ্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে হতাশা তুলে ধরার পর তাঁরা বলছেন, সবগুলো সমস্যাই একটা অন্যটার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সব সমস্যাকে এক সমস্যা হিসেবে দেখে এর সমাধান বের করতে হবে। তারা, লিখেছেন "What we really have is a poverty-hunger-habitat- energy-trade-population- atmospheric- waste- resource- problem." তাদের মতে এ এমন এক সমন্বিত সমস্যার নাম ১৯৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত যার পরিচয়ই জানা ছিল না। ১৯৭০ সালে ড. আরলিও পিসি প্রথমবারের মত এই সমন্বিত সমস্যাকে 'Global Problematique' নামে চিহ্নিত করলেন। অর্থাৎ সমস্যা যেমন 'সমন্বিত', তেমনি তা 'গ্লোবালও' হয়ে দাঁড়াল। এর অর্থ সব সমস্যার সমাধান সমন্বিত ভিত্তিতে করতে হবে এবং তা করতে হবে বিশ্বভিত্তিতে। যেখানে জাতীয়ভিত্তিক পৃথক কোন বিবেচনার স্থান নেই। জাতীয় বিবেচনার এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ বিষয়ে এখন কোন আলোচনা নয়।

www.amarboi.org

সমন্বিত সমস্যার বিশ্বভিত্তিক সমাধানের জন্য লেখকগণ তাদের 'থ্রেশোল্ড ২০০০' গ্রন্থে সার্বিক বিবেচনায় পরিকল্পিত 'sustainable development' স্ট্রাটেজী গ্রহণের কথা বলেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গেই তারা একেও পূর্ণাঙ্গ মনে করেননি। তাদের মতে 'সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট'-এর সাথে 'sustainable faith'-এর ভূমিকাও যুক্ত থাকতে হবে। জেরাল্ড বার্নির ভাষায় "আমরা মানুষরা 'সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট'-এর কথা বলছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এককভাবে এটা খুব বেশিদূর যেতে পারবে না (it does not go deep enough)। আমাদেরকে অবশ্যই 'সাসটেনেবল ফেইথ'-এর বিষয়ে ভাবতে হবে।" 'সাসটেনেবল ফেইথ' তারা তাকেই বলেছেন, যে 'ফেইথ' বা ধর্ম পৃথিবীর মানুষের, পৃথিবীর প্রাণীকুলের, পৃথিবীর পরিবেশের জীবন পদ্ধতি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

'থ্রেশোল্ড ২০০০' গ্রন্থের লেখকগণ এমন ধর্ম খুঁজে পায়নি। লেখক জেরাল্ড বার্নি লিখেছেন, "Is there a faith in existence today that is practising a way of life that provides "Progress" for the whole community of life, not just the human species? Is there a faith tradition such that if everyone on Earth suddenly adopted it, the human future on Earth would be assured? I do not know enough about the faith tradition of the world to provide a well considered answer to this questions, but on the basis of my limited personal experience, I doubt that there is a faith tradition on Earth today that can provide the moral foundation needed for the 21st Century." অর্থাৎ, শুধু মানব প্রজাতি নয়, সমগ্র জগৎজীবনের উন্নয়ন উপযোগী জীবন পদ্ধতি দেয় এমন ধর্মের অস্তিত্ব কি আছে? এমন ধর্ম কি আজ দুনিয়াতে আছে যা আজ দুনিয়ার মানুষ হঠাৎ যদি গ্রহণ করেই বসে তাহলে এই দুনিয়ায় তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে? এই প্রশ্নগুলোর যথার্থ জবাব দিতে সমর্থ এমন ধর্ম সম্বন্ধে খুব বেশি জানা নেই, তবে আমি আমার সীমিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, একুশ শতকের জন্যে প্রয়োজন যে নৈতিকভিত্তির তা পৃথিবীর কোন ধর্মের নেই বলে আমার সন্দেহ।

লেখকের এই সন্দেহই আমার আজকের আলোচনার মূল বিষয়।

এই সন্দেহকে সত্য ধরেই লেখকরা আধুনিক বিশ্বের জন্যে নতুন 'ওহী'র সন্ধান করেছেন। নতুন 'ওহী'র সন্ধান তারা পেয়েছেনও। 'পুরাতন' 'অচল' হয়ে পড়া ধর্মগুলো, তার মতে, মানুষের সম্পর্ক, সহযোগিতা, সহমর্মীতার ক্ষেত্রে ধ্বংসকরী ভূমিকা পালন করছে। তার মতে আজকের দুনিয়ার ৫০টিরও বেশি আঞ্চলিক সংঘাতের অধিকাংশই বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে। দুনিয়ার সামরিক শিল্প অধিকাংশই এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের সংঘাতের সুযোগেই টিকে আছে।

www.amarboi.org

লেখকের মতে দ্বিতীয় 'ওহী'র প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, ধর্মগুলো নারী পুরুষদের মধ্যে বৈষম্যের ব্যবস্থা দিয়েছে যা বস্তুনিষ্ঠতার দিক থেকে অন্যায় এবং সামাজিকভাবে ধ্বংসকর। তৃতীয় 'ওহী' হলো মানুষের 'বিজ্ঞান'। এই বিজ্ঞান শুধু মানুষকে নয়, গোটা জগৎ জীবনকে চিনতে, বুঝতে এবং সকলের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার চেতনা দিয়েছে এবং চতুর্থ 'ওহী' হলো, স্বর্গীয় শক্তির মত মানুষও তার 'সহস্রষ্টা'। সহস্রষ্টা হিসেবে মানুষ শুধু তার নয়, গোটা জগৎ জীবনের ভবিষ্যৎ জীবনপদ্ধতি রচনা করবে।

লেখকদের কথিত এই চারটি 'ওহী'র প্রথম নেগেটিভ যা অতীতের সমালোচনা এবং শেষ দুটি পজিটিভ। যাকে তারা ভবিষ্যতের জীবন-দর্শন বলে মনে করছেন। কিন্তু একে তারা অবশ্য 'নতুন ধর্ম' (যেমন 'কম্যুনিজম'কে বলা হয়ে থাকে) বলেননি, কিংবা স্পষ্ট করে বলেননি যে, এগুলোই একুশ শতকের মানুষের নৈতিক বুনিয়াদ হতে পারে। বলতে পারেননি সম্ভবত এই কারণে যে, মানুষের বিজ্ঞান কখনই শেষ কথা বলতে পারে না এবং মানুষ 'সহ-স্রষ্টা' বটে, কিন্তু এই সহ-স্রষ্টা মানুষ পৃথিবী গড়ারও যেমন নায়ক, তেমনি সকল ধ্বংস-বিপর্যয়-হানাহানিরও নায়ক।

লেখকরা ধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন অবশ্যই তা ঠিক নয়। লেখকদের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি হলো তারা ধর্ম ও তার অনুসারিদেরকে এক করে দেখেছেন। এটা কোন দিক দিয়েই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। ধর্ম অনুসারে মানুষ যা করে, সেটাই তার ধর্ম। ধর্মীয় শিক্ষার বিপরীতে যা তারা করে সেটা তার অধর্ম ও অন্যায় এবং ধর্মের শিক্ষা বা নির্দেশের বাইরে সে যা কিছু করে, সেটা তার ব্যক্তিগত। আজকের বিশ্বে ৫০টিরও বেশি যে সংঘাত চলছে, যা লেখকরা বলেছেন, তার অধিকাংশই ধর্মানুসারীদের ব্যক্তিগত বা অধর্মজাত। কাশ্মীর সমস্যার কথাই বলি। কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষের রায় এবং ভারতের আধিপত্যবাদী অভিলাষের সংঘাত থেকেই কাশ্মীর সমস্যার জন্ম। ভারতীয় আধিপত্যের বিরোধিতাকারী কাশ্মীরী মানুষ মুসলমান বলেই এ সমস্যার মূল হিসাবে ইসলামকে টানা হবে তা ঠিক নয়। ভারতের সাথে সংঘাতরত কাশ্মীরীদের যদি ইসলামের পক্ষ ধরা হয়, তাহলে ভারতের পক্ষের শেখ আব্দুল্লাহ, ফারুক আব্দুল্লাহ এবং তাদের সাথী হাজার মুসলমানকে ইসলামের বিপক্ষ শক্তি ধরা হবে? না, তা ধরা যাবে না। সুতরাং কাশ্মীর সংঘাতে ইসলাম কোন পক্ষ নয়। অধিকাংশ সংঘাতের ক্ষেত্রে এই একই কথা। আরও একটা কথা, গত ৫৫০০ বছরে মোট যুদ্ধ হয়েছে ১৪৫০০টি। লোক মরেছে প্রায় ৪০০ কোটি। এর ১০ শতাংশ লোকও ধর্মযুদ্ধের কারণে মরেনি। দুনিয়াতে বৃহৎ যুদ্ধের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ৪২টি। এর মধ্যে মাত্র গোটা দুই তিনেক যুদ্ধ ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছে (যেমন ক্রুসেড)।

অনুরূপভাবে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের ৯০ ভাগ ব্যবস্থা ও ঘটনার জন্যে মানুষের অধর্মজাত ও ব্যক্তিগত আচরণ দায়ী। ইসলামের উত্তরাধিকার আইনসহ ইসলামের নারী সংক্রান্ত বিধি-বিধান নারীদের প্রতি বৈষম্য নয়, অবিচার নয়, বরং সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারী ও সামাজিক ভারসাম্য বিধানকারী একটি বাস্তব ব্যবস্থা। তবে এই আলোচনায় আমি যাচ্ছি না।

www.amarboi.org

লেখক জেরাল্ড বার্নি ও তার সহ-লেখকদের দোষ দেবার কিছু দেখি না। কারণ জেরাল্ড বার্নি নিজেই স্বীকার করেছেন পৃথিবীর ধর্ম-ব্যবস্থা সম্পর্কে তার তেমন কিছু জানা নেই। তার আলোচনা থেকেও এটাই প্রমাণ হয়। খ্রিস্টধর্ম কেন আধুনিক জগৎ-জীবনের জীবন পদ্ধতি হতে পারে না, এ প্রসঙ্গেই শুধু তিনি আলোচনা করতে পেরেছেন। এর অর্থ অন্যান্য ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। অথচ ইসলাম পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম শুধু নয়, একমাত্র ইসলামই পৃথিবীর বিশ্বজনীন, সার্বজনীন, ইতিহাস- আলোকিত এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

জেরাল্ড বার্নি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করলে দেখতে পেতেন, মানুষ এবং জগৎ-জীবনের দিক-নির্দেশক ও অভিভাবক হিসেবে যে ধর্মের আজ প্রয়োজন এবং যে ধর্ম একবিংশ শতকের Moral foundation হতে পারে, সে ধর্মই হলো ইসলাম। এ জন্যেই ইসলামে মানুষকে এই পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই খলিফার দায়িত্ব মানুষকে রক্ষা এবং মানুষের জন্যে সৃষ্ট যে পরিবেশ ও প্রাণিজগৎ তাকেও রক্ষা করা। আর নবী মোহাম্মদ (স) কে 'রাহমাতুললিল আলামিন' বলা হয়েছে। তিনি রহমত শুধু মানুষের জন্যে নয়, প্রাণী, পরিবেশ সকলের জন্যেই তিনি রহমত। এ বিষয় বিরাট আলোচনার দাবি রাখে, কিন্তু সে সুযোগ এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নেই।

সবমিলিয়ে একবিংশ শতকে মানুষ ও বিশ্ব চরাচরের জন্যে যে 'Way of life' দরকার, সে way of life'ই হলো ইসলাম। ইসলাম যেমন Sustainable faith. তেমনি এতেই আছে Sustainable development। জাতিসংঘের নেতৃত্বে চার দশকের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এবার দেখা হোক না ইসলামকে। জেরাল্ড বার্নির কথার রেশ ধরে বলা যেতে পারে, 'If everyone on Earth suddenly adopted' ইসলাম, তাহলে কি ঘটে একবার দেখাই যাক না। কম্যুনিজম ব্যর্থ হবার পর, পশ্চিমী ব্যবস্থা ব্যর্থ হবার পর এ দাবি উঠতেই পারে। বিশেষ করে সবকিছু দেখার পর যখন 'Sustainable development' কে সফল করার জন্যে Sustainable faith- এর সন্ধান করা হচ্ছে, তখন এ দাবি ওঠা আরও স্বাভাবিক।

www.amarboi.org

বাংলাদেশ সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের স্বরূপ সন্ধানের আগে সংস্কৃতি বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ে বিতর্ক অনেক আছে, কিন্তু আমাদের দেশে এটা বড় কোন সমস্যা নয়। সংস্কৃতির মৌল প্রকৃতি নিয়ে বলা যায় আমাদের মাঝে দর্শনীয় ঐক্যই বর্তমান। ড. এনামুল হক ও শিব প্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' -এ সংস্কৃতির অর্থ বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে "সংস্কার", 'শুদ্ধিকরণ', 'অনুশীলন দ্বারা অর্জিত জ্ঞান' এবং 'বুদ্ধির উৎকর্ষ'। কোলকাতার কাজী আব্দুল ওদুদের 'ব্যবহারিক শব্দ কোষ' -এ সংস্কৃতি শব্দের অর্থ বলা হয়েছে 'সংস্কার,' 'বিশুদ্ধিকরণ', 'চর্চা করিয়া বা সভ্যতার ফলে লব্ধ উৎকর্ষ' ইত্যাদি। অভিধান দ্বয়ের সংজ্ঞার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ওপর সুকান্ত একাডেমীর তত্ত্বাবধানে বাম বা বাঁকা বুদ্ধিজীবীদের একটা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ পাঠক নরেন বিশ্বাসও সংস্কৃতির অনুরূপ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সংস্কৃতির আভিধানিক অর্থ শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ বা কৃষ্টি। সম + কৃ + ক্তি-এ ব্যুৎপত্তির মধ্যেই নিহিত থাকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত, পরিশ্রুত, নির্মলীকৃত, শোধিত এ ধরনের অনুভবসমূহ। ফলে উৎকর্ষময় বা পরিশ্রুত জীবন চেতনাই সংস্কৃতির সারাৎসার। এমন কি ধর্ম ও নৈতিকতার ধার ধারেন না এমন বুদ্ধিজীবী আহমদ শরীফ পর্যন্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতি মানুষের যে প্রবণতা মানুষ সচেতন চেষ্টার দ্বারা যে সৌন্দর্যচেতনা, কল্যাণ-বুদ্ধি ও শোভন জগৎ দৃষ্টি অর্জন করতে চায়, তাকে হয়তো তার সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়। সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশ্রুত জীবন চেতনা। জীবিকা সম্পৃক্ত ও পরিবেষ্টনী প্রসূত হলেও প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি চিত্তেই এর উদ্ভব এবং বিকাশ, ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজ এবং সমাজ থেকে বিশ্বে তা হয় পরিব্যাপ্ত। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।" আর আবুল মনসুর আহমদ সংস্কৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "কালচার বা সংস্কৃতি মানুষের মন বিকাশের বিশেষ স্তরবোধক। তার মানে, কোন সমাজ বা জাতির মনে কোন এক ব্যাপারে একটা স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার বিধি মোটামুটি সর্বজনীন চরিত্র বা ক্যারেক্টার, আচরণ বা আখলাকের রূপ ধারণ করলেই সেটাকে ঐ ব্যাপারে ঐ মানব গোষ্ঠীর কালচার বলা হয়ে থাকে।" একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, জনাব আবুল মনসুর আহমদ সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা এখানে দিলেন তা পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিগুলো থেকে দৃষ্টিভংগীগত দিক থেকে অনেকখানি আলাদা। নরেন বিশ্বাস ও আহমদ শরিফের উদ্ধৃতির মধ্যে সংস্কৃতির পরিশীলিত, পরিমার্জিত, পরিশ্রুত একটা চিন্তা ও কর্মরূপ আমরা পাই, কিন্তু সেখানে তা নির্দিষ্ট কোন মূল্যমান বা স্ট্যান্ডার্ড

www.amarboi.org

নিয়ন্ত্রিত নয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই স্টান্ডার্ডের বিষয়টা অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ। এই স্ট্যান্ডার্ডই সংস্কৃতির বহিরাঙ্গ বা সীমানা নির্ধারণ করে এবং জাতিতে জাতিতে যে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা, ভিন্ন যে স্বকীয়তা তারও মূল কারণ এই স্ট্যান্ডার্ড। সংস্কৃতির এই সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে আরেকটি জিনিসও এখানে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। সেটা হলো, সংস্কৃতির এই যে স্টান্ডার্ড তারও কিছু নিয়ামক আছে যা সংস্কৃতির প্রাণবস্তু বা মৌলিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রকৃতই মৌলিক উপাদান সমন্বিত প্রাণবস্তু ছাড়া সংস্কৃতির অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। কায়াহীন কাজ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি পরিশীলন, পরিমার্জন ও পরিশ্রুতির ব্যাপারটা বর্ণ পরিচয়হীন হতে পারে না। এগুলো নির্দিষ্ট চরিত্র অনুসরণ করেই চলে। বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কারণ এখানেই। কিছু পরিচিত ভিত্তির উদাহরণ আমরা এখানে তুলে ধরতে পারি। বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বিকতা কম্যুনিস্ট সংস্কৃতির ভিত্তি। বস্তুবাদ ও খ্রিস্টান বিশ্বাস পুঁজিবাদী পশ্চিমী সংস্কৃতির ভিত্তি। বেদ ও উপনিষদীয় দর্শন ভারতের আর্য সংস্কৃতির ভিত্তি। কিন্তু এ সবই স্থূল অর্থে। সংস্কৃতির মৌল উপাদানগুলো এ সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। যে বস্তুটিকে সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয় তা গঠিত হয় পাঁচটি মৌল নীতি বা দৃষ্টিভংগী দ্বারা। এই পাঁচটি মৌল নীতির প্রথম হলো, দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে ধারণা, দ্বিতীয়, জীবনের চরম লক্ষ্য, তৃতীয়, বুনিয়াদি আকিদা ও চিন্তাধারা, চতুর্থ, ব্যক্তি প্রশিক্ষণ এবং পঞ্চম হলো সমাজব্যবস্থা। এই বিষয়গুলো সম্মিলিতভাবে একটা জাতীয় মূল্যমান বা স্ট্যান্ডার্ডের জন্ম দেয় যা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বা সৃষ্টি করে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড।

সংস্কৃতি বিষয়টার সাথে এই অন্তরঙ্গতার পর যেদিকে আমাদের নজর দিতে হয় সেটা হলো শিরোনামের বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রভূমির নাম। এর জন্ম ১৯৭১ সালে। খুব বেশি এগুলে ব্রিটিশ যুগে কিংবা তারও আগে মোগল বা সুলতানি যুগে বাংলা নামের সন্ধান খুব ভালোভাবেই পাই। কিন্তু সেই 'বাংলা' এবং আমাদের আজকের বাংলাদেশের চেহারা এক নয়। ইতিহাসে কোন সময়ই আমাদের বাংলাদেশ 'বাংলাদেশ' ছিলনা। খ্রিস্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতক থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক সত্তার ভাঙা-গড়া শুরু। ভারতের গুপ্ত শাসনের সমসাময়িক বাংলাদেশের নায়করা কারা তাদের সকলের নাম ইতিহাস বলতে অক্ষম, তবে এক বিষয়ে ইতিহাস একমত। তখনকার টুকরো টুকরো সেই বাংলাদেশে কোন সময়ই একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমন কি বাংলায় প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু শাসক শশাংকের পক্ষে দক্ষিণ ও পূর্ববংগে পা রাখা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ তখন অঙ্গ, বঙ্গ, সূক্ষ্ম, পুন্ড্র, রাঢ়, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি শতনামে শত খণ্ডে বিভক্ত ছিল। গোটা পাল শাসন আমলে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ দেববংশ, হরিকেল রাজবংশ, চন্দ্র বংশ, বর্মন বংশ প্রভৃতি অনেক রাজবংশ দ্বারা ভিন্ন ভিন্নভাবে শাসিত হয়েছে। বাংলার মুসলিম শাসনামলে অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটলেও বাংলায় কোন সংঘাতমুক্ত একক রাজনৈতিক সত্তা গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ আমলেই এর প্রথম প্রকাশ ঘটে।

www.amarboi.org

বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক সত্তার মত তার সাংস্কৃতিক সত্তাও বিভেদ ও সংঘাতপূর্ণ বিবর্তনে জর্জরিত হয়েছে। এই সংঘাতের শুরু বাংলাদেশের জানা ইতিহাসের শুরু থেকেই। শুরুর এই স্বরূপটাকে আমরা ভারত ব্যাপি দ্রাবিড়, আর্য এবং আদিবাসি আর্য সংঘাতের প্রলম্বিত রূপ হিসেবে অভিহিত করতে পারি।

আর্যদের আগ্রাসি আধিপত্যবাদ দ্রাবিড় ও আদিবাসিদের দেশছাড়া করে ঠেলে দিয়েছিল দক্ষিণ দিকে লংকা পর্যন্ত। আর পূর্বদিকে গভীর বন ও নদী জড়াজড়ি করে থাকা বাংলার দুর্গম প্রান্তর পর্যন্ত। পালিয়ে এসেও তারা কিন্তু বাঁচেনি। বাংলার জংগলঘেরা শান্ত নদীর তীরে নতুন নীড় গড়ে বাংলার এ দরিদ্র মানুষেরা ভেবেছিল আর কিছু না হোক তারা তাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি নিয়ে শান্তিতে বাস করতে পারবে। কিন্তু রাজনৈতিক আধিপত্যের কাঁধে ভর করে আর্য সংস্কৃতির নিষ্ঠুর সয়লাব এসে গ্রাস করে তাদেরকে। ভারতে বৌদ্ধ মৌর্য যুগের পতনের পর ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত যুগের সূচনা ঘটে। পরবর্তী ৪২০ বছর তাদের এক চরম দুর্ভাগ্যের কাল। অহিংস ও শান্তিবাদী বৌদ্ধ ধর্ম এবং নিরীহ দ্রাবিড়ীয় জীবন চর্চা যে শান্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে তা আর্যদের কর্মবাদী ও নিপীড়নমূলক সংস্কৃতির আগ্রাসনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিশেষ করে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় হিন্দু রাজ শশাংকের শাসনকালে বৌদ্ধ সমাজ সংস্কৃতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। বৃষ্টিস্নাত সুজলা সুফলা নদী বিধৌত পলিমাটির বাংলাদেশের শান্ত ও কোমল হৃদয়ের মানুষগুলো শুরু থেকেই অধ্যাত্মবাদী ও মানবিক দর্শন ও সংস্কৃতির অনুসারী যার সাথে কর্মবাদী আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘাত অত্যন্ত মৌলিক। এই সংঘাতে নিষ্পিষ্ট ও জর্জরিত হয় বাংলার মানুষ।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় বৌদ্ধ পাল বংশের শাসন শুরু হবার পর বাংলার মানুষ কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচে। বৌদ্ধ শাসনের অধীনে বাংলার বৌদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতি আবার মাথা তুলে নবজীবন লাভ করে। কিন্তু এরপরও বাংলায় সাংস্কৃতিক সংঘাতের তিনটি ধারা বাংলার সাধারণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেই চলে। ৩২৫ বছরের পাল শাসনে সমাজের বৌদ্ধ আভিজাতরা ভালই ছিল। কিন্তু কর্মবাদী নিপীড়ন থেকে তারা বাংলার সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনি। হিন্দু সামন্তরা তখনও ছিল প্রভাবশীল। তাদের সহায়তায় দিবয়ার কৈবর্ত বিদ্রোহের মাধ্যমে উত্তর বঙ্গে হিন্দু শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা একবার হয়। বর্ণবাদী ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতিভূ সামন্ত শ্রেণীর শোষণে বাংলার সাধারণ মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হয়। সেই সময়ের এক কবির কথায় ঃ "নিরানন্দে তার দেহ সমুন্নত ও শীর্ষ, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র। ক্ষুধায় চোখ ও পেট বসে গিয়েছে শিশুদের, তারা ব্যাকুল হয়ে খাবার চাইছে। দীন-দরিদ্র গৃহিণী চোখের জলে গাল ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে যেন এক মান ও তন্ডুলে একশ দিন চলে।" এই নিপীড়ন ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যজাত। গোবিন্দ চন্দ্রের ময়নামতি প্লেটে স্বামীহারা ম্লেচ্ছ নারীদের বিলাপের এক ধর্মস্পর্শী চিত্র পাওয়া যায়। উক্ত প্লেটের সপ্তম শ্লোকের মূল কথা এই ঃ 'কল্যাণ চন্দ্রের হাতে এত ম্লেচ্ছ পুরুষ মারা গিয়েছিল যে, স্বামীহারা ম্লেচ্ছ নারীদের চোখের পানিতে লোহিতারা (ব্রহ্মপুত্র) নদীর পানি চার গুণ বেড়ে

www.amarboi.org

গিয়েছিল"। গণ পর্যায়ের এই নীপিড়ন নির্যাতন বৌদ্ধ পাল রাজাদের শাসনে অবসান না ঘটলেও এ সময় বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির মানে বাংলার ভাষা সাহিত্যের নতুন বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু একটি দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো আর্য আধিপত্যের ৪২০ বছরে বাংলা ভাষা যে অবহেলার শিকার হয়, তার ফলে বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটলেও বাংলা ভাষা ধ্বংস হয়ে যায়নি সত্য, কিন্তু শাসক বা অভিজাত সমাজের চত্বর থেকে বাংলা ভাষা বিতাড়িত হয়েছিল। পাল আমলের তিনশ বছরেও বাংলা ভাষা এ অধিকার ফিরে পায়নি। পাল আমলের চর্যাপদ, বৌদ্ধগান ও দোহার মত গীতিকবিতার অনেকগুলোতে আমরা সুস্পষ্ট বাংলার দেখা পাই, কিন্তু পাল আমলের বিখ্যাত কবিগণ যেমন হরিচরিত রচয়িতা চতুর্ভুজ, রামচরিত প্রণেতা মন্দাকার নন্দী এবং বীরদের সকলই সংস্কৃত ভাষায় কাব্য চর্চ্চা করেছেন। অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ভীষণ বিপ্লবের আকার নিয়ে বৌদ্ধ এবং স্বদেশীয় পাল শাসনের পত্তন হলেও পাল রাজারা বর্ণবাদী আর্য সাংস্কৃতির নিপীড়ন থেকে সাধারণ জনগণকে মুক্ত করতে পারেন নি, তেমনি রাজসভা ও সাহিত্যেও বাংলাভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বলা যায়, পাল রাজারা তাদের ৩২৫ বছরের শাসনে সমাজের উচ্চ স্তরে বৌদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতির উজ্জীবন ঘটাতে পারলেও সেখান থেকে আর্য ভাষার মূলোচ্ছেদ ঘটাতে পারেননি, আর সাধারণভাবে জনগণের পর্যায়ে আর্য সংস্কৃতির আধিপত্যের কাছে পরাজয়ই বরণ করেছে।

সুতরাং ১০৯৭ সালে যখন বৌদ্ধ পাল রাজাদের অবক্ষয়ের পটভূমিতে ভারতের কর্ণাট থেকে আসা হিন্দু সেন রাজাদের উত্থান ঘটল বাংলার শাসন মঞ্চে, তখন বাংলার বৌদ্ধ ও ভক্তিবাদী দ্রাবীড়ীয় জনগণের সাহিত্য সংস্কৃতির ওপর আপতিত অন্ধকার দ্রুত ঘনীভূত হয়ে উঠল, সৃষ্টি করল প্রবল এক অমানিশা। আগেই বলেছি, এই অমানিশার শুরু ভারতের কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ রাজশক্তির পতন এবং তৃতীয় শতকে হিন্দু গুপ্ত রাজশক্তির উত্থানের কাল থেকে। এরপর বাংলার বৌদ্ধ পাল শাসন পর্যন্ত দীর্ঘ ৪২০ বছরে বর্ণবাদী আর্য সংস্কৃতির হৃদয়হীন আধিপত্যে বাংলার বৌদ্ধ ও দ্রাবীড়ীয় জীবন সংস্কৃতি নিষ্পিষ্ট হয়। আশা ছিল বৌদ্ধ পাল রাজাদের আমলে এর অবসান ঘটবে, কিন্তু ঘটেনি। এর কারণ হিসেবে ইতিহাস বলে, ধর্মপাল গৌড়ের রাজা নির্বাচিত হবার পূর্বে উড়িষ্যার ও বংগদেশে পাঁচটি পৃথক রাজ্য ছিল যার রাজা ছিলেন আর্য সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। বৌদ্ধরাজ ধর্ম পাল এদের সকলের উপর সমগ্র দেশের রাজা হয়ে বসলেও এদের আর্য সমাজ বন্ধন, আচার ও সংস্কৃতিকে অবহেলা করে বৌদ্ধ সংস্কৃতি সার্বিকভাবে পুনর্জ্জীবিত করার সামর্থ তার ছিল না। কারণ প্রদেশগুলোর শাসন তখনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রাজাদের হাতেই। এদের গায়ে হাত দেয়া যে বিপজ্জনক ছিল মহিপালের আমলের দিবয়ার কৈবর্ত বিদ্রোহ তার একটা প্রমাণ। বৌদ্ধ পাল রাজাদের এই সাংস্কৃতিক ব্যর্থতার আরেকটা বড় কারণ ছিল দীর্ঘ ৪২০ বছরের আর্য শাসনে বৌদ্ধদের জীবন সংস্কৃতিও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের প্রাচীন

www.amarboi.org

সংস্কৃতি ছেড়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুকরণে নিজেদের গড়ে নেবার চেষ্টা করছিল। বৌদ্ধ জীবন সংস্কৃতিতে সহবাস পন্থার আবির্ভাব বৌদ্ধ জীবন সংস্কৃতিতে মহাবান পন্থার আবির্ভাব বৌদ্ধ ধর্মকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কাছাকাছি নিয়ে যায়। বৌদ্ধ ধর্মে দেবতা না থাকলেও স্বয়ং বুদ্ধ দেবতার আসন পেয়ে যায় এবং বৌদ্ধ সমাজেও শুরু হয়ে যায় পূজা অর্চনা। ব্রাহ্মণ ধর্মের সাথে তাদের পার্থক্য রইল শুধু দেবতা নির্বাচন ও পূজার পদ্ধতিতে। বৌদ্ধ সমাজের এই সাংস্কৃতিক পরাজয় ও পতন বাংলার অসহায় দ্রাবীড় মংগোলীয় জনসমাজে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। একদিকে তাদের ছিল বর্ণবাদী আর্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অদম্য প্রতিরোধ স্পৃহা, অন্যদিকে আর্য দেবতাদের মোকাবিলায় নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র সহায় খোঁজার স্বাভাবিক মানসিকতা। এর ফলেই সৃষ্টি হয় মনসাদেবী, বরুণ দেব, শীতলা দেবী প্রভৃতি অনেক দেব-দেবীর যারা আর্য দেবতা দেবী থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন। ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণ নিপীড়নে নিস্পিষ্ট বাংলার অসহায় জনশ্রেণী শক্তি, সাহস, মুক্তি ও মদ্দদের জন্যে এদের কাছেই আশ্রয় খুঁজত। ইতিহাস বলে, ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রভাবে বাংলার দুর্জয় দ্রাবিড় ও মাদল জনশ্রেণীর এমনি পরিণতি ঘটায়ে এমনি প্রাকৃতিক প্রতিকুলতা দমন করার উপায়ও তারা চিন্তা করতে পারেনি। বুদ্ধির জড়তার জন্যে তারা দেবতা, উপদেবতা ও রাক্ষসের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ ছাড়া প্রকৃতিতে আর কিছুই দেখেনি। তারা প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানা শক্তি, জীব ও বস্তুকে পূজা করে তাদের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করছে। কিন্তু কখনই আত্মশক্তিতে প্রকৃতিকে জয় করে প্রকৃতির ওপর মানুষের বিজয় পতাকা উড্ডীন করার কথা কল্পনায়ও আনতে পারেনি।

বাংলার মানুষের এই সাংস্কৃতিক বন্দীদশা হিন্দু সেন রাজাদের ১২৬ বছরের শাসনে আরও মর্মান্তিক আকার ধারণ করে। সেন রাজাদের আমলে বাংলার জনসমাজের আক্ষয়মুখী পরিবর্তন আরও প্রকট রূপ নেয়। এ সময়ে বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্য অভিজাত শ্রেণীর প্রতিপত্তি পরাক্রম আরও বৃদ্ধি পায়। একজন সাংস্কৃতিক ইতিহাস সন্ধানী এ সময়ের ভয়াবহ চিত্র আঁকতে গিয়ে বলেছেন, "এমন এক পরাক্রান্ত ও দুর্নীতিপূর্ণ সামন্ততন্ত্র জন্মলাভ করে, যার ফলে পূর্বতন সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং সমাজে দুর্নীতি, ব্যভিচার ও শোষণ নির্যাতন তীব্রতা লাভ করে। 'কেলি-কলা কুতূহল'ই তখনকার সংস্কৃতির মূল উপাদানে পর্যবসিত হয়। এই পর্বের ধর্মে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, সংগীতে, কাব্যে তাই কোন মহৎ ও বৃহতের আকাঙ্ক্ষা নেই, আছে এক গভীর অবক্ষয়। সমস্ত শ্রেণী এ পর্বে জনগণ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এবং সামন্ত সংস্কৃতিও তখন প্রাণহীন।" সমান্ত শক্তি ও সংস্কৃতি তখন প্রাণহীন ছিল বলেই বাংলার সেন রাজা লক্ষ্মণ সেন মুসলিম সৈন্যের আগমনের কথা শুনে একে দেবতা নির্ধারিত ভাগ্যলিপি মনে করে বিনা প্রতিরোধে খিড়কির দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

বাংলার এই ঘোর দুর্দিনে ঘোর অমানিশায় মুক্তির সূর্য হিসেবে ১২০৩ সালে মুসলিম বিজয়ের আকারে বাংলায় ইসলামি সংস্কৃতির আগমন ঘটে। নতুন মুসলিম বাংলায় বাংলা

www.amarboi.org

সাহিত্যের নবজন্ম সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "ব্রাহ্মণগণ প্রথমত ভাষাগ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইহারা 'সর্বনেশে' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্যে ইহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়েশ্বরগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীর-এর ন্যায় পদাবলি প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। এই সমৃদ্ধ সভাগ্রন্থে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ করিল? আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

কিন্তু এই সৌভাগ্য শুধু বংঙ্গভাষারই নয়, ইসলামের সমাজ সংস্কৃতি গোটা বঙ্গবাসীর জন্যে ও বয়ে এনেছিল মহা সৌভাগ্য। গুপ্ত যুগের সেই ৩৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সেন যুগের শেষ কাল ১২২৩ খ্রিস্টাব্দ এক দীর্ঘ ৮৯৩ বছরের ভয়াল অন্ধকার যুগধরে বাংলার নির্যাতিত, নিপীড়িত অসহায় জনগোষ্ঠী যেন আকুলভাবে এই মহাসৌভাগ্যেরই সন্ধান করে এসেছে। সেই সন্ধান যখন তারা পেলো, তখন যেন পাগলের মতই তাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরল। ইসলাম প্রবেশ করল বাংলার হৃদয়ের অন্তস্থলে, ছড়িয়ে পড়ল বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর সর্বত্র। স্যার উইলিয়াম হান্টার তার The Indian Musalmans গ্রন্থে লিখেছেন, "অহংকারী আর্যদের দ্বারা নিগৃহীত, পদদলিত বাংলার আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের মানুষ দু'হাত বাড়িয়ে ইসলাম প্রচারকদের বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। এই দরিদ্র লোকদের কাছে ইসলাম যেন ছিল এক পরম স্বর্গীয় সওগাত।" উইলিয়াম হান্টার এই বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত করে তার The Indian Musalmans গ্রন্থে এইভাবে বলেছেন, "এই অঞ্চলের (বাংলাদেশের) জলাভূমি ও নদীবহুল জেলাগুলোর আদি বাসিন্দাদেরকে কখনো ভদ্র সমাজে স্থান দেয়া হয়নি। তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তারা এতদূর অদ্ভুত যে, উচ্চ কোন ব্রাহ্মণ সে অঞ্চলে গিয়ে তাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাস করতে পারেন না। মুসলমানদের এসব বর্ণ বৈষম্যের বালাই ছিল না। মুসলমানরা যেখানেই গেছে ধর্ম প্রচার করেছে। কতকটা তলোয়ারের জোরে, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষেরই হৃদয়ের কোমলতম দু'টো তন্ত্রীতে সজোরে আঘাত করে। হিন্দুরা এই বদ্বীপের বাসিন্দাদেরকে কখনো তাদের সমাজে স্থান দেয়নি। মুসলমানরা ব্রাহ্মণ ও নিম্নজাতি নির্বিশেষে ইসলামের পূর্ণ অধিকার সবাইকে সমানভাবে দান করেছিল। তাদের উৎসাহী ধর্মপ্রচারকরা এই শিক্ষা দিয়েছিল "তোমরা সকলেই তোমাদের আল্লাহর কাছে নতজানু। তার দৃষ্টিতে সবাই সমান, সব সৃষ্টি জীব ধরার ধুলার মতই। এক আল্লাহ ছাড়া আর প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর রসূল।"

এভাবেই ইসলাম ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির নিপীড়ন নিগড়ে বন্দী বাংলার মানুষকে মুক্ত করল। ৫৬২ বছর পর্যন্ত বাংলার মুসলিম শাসনামলে মুসলিম শাসকগণ ইসলামি সমাজ সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি এ কথা সত্য, কিন্তু এর পরেও এই সময়েই মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বাংলার মন ও মাটির সাথে এক হয়ে যায়, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি

www.amarboi.org

শোষণ শাসন বন্ধ হয়ে যায়। এমন কি ইসলামি ধর্ম সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কৃতিকেও বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। হিন্দু ধর্মকে জাত-পাত থেকে মুক্ত করে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা অনেকেই করেন। মুসলিম যুগে শ্রীচৈতন্যের প্রচেষ্টা এবং রাম মোহন রায়দের প্রয়াস এরই দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে ইসলামের আগমন বাংলার মানুষকে যেমন, তেমনি বাংলা ভাষা সাহিত্যকেও যে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচায় তা ড. দীনেশচন্দ্র সেনের স্বীকারোক্তি থেকে আগেই আমরা জেনেছি। বাংলায় মুসলিম জীবন ও সংস্কৃতি চর্চা বাংলা ভাষাকে নতুন জীবন ও নতুন ধারা দান করে। নয়শ' বছরের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শাসনে রাষ্ট্র ও অভিজাত পর্যায়ে সংস্কৃতের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু গণ পর্যায়ে তার কোন প্রভাব ছিল না। সেখানে বাংলা ভাষারই চর্চা হতো। পাল ও সেন যুগের গ্রাম্য গীতিকাগুলোই তার প্রমাণ। কিন্তু মুসলিম আমলে ইসলামি সংস্কৃতির ধারক হয়ে আসা আরবি ফারসি ভাষার শব্দমালা বাংলায় রূপান্তর লাভ করে মানুষের মুখের ভাষা হয়ে যায় যা বাংলা ভাষাকে নতুন বলে বলিয়ান করে জোর সৃষ্টি করে বাংলাদেশে এক সমৃদ্ধ গণসাহিত্য। বাংলার এই গণসাহিত্যই আমাদের পুঁথি সাহিত্য যার সংখ্যা ৮ হাজারেরও বেশি। বাংলার এই সময়ের নগর সাহিত্য সংখ্যার দিক দিয়ে এত সমৃদ্ধ নয়। এর থেকে প্রমাণ হয় ইসলামি জীবন ও সংস্কৃতি বাংলার গ্রামাঞ্চলে আদৃত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। এ উল্টোটা ঘটেছিল বাংলার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ৯শ' বছরের শাসন ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি শহর পেরিয়ে গ্রামবাংলার জনমনে প্রবেশ করতে পারেনি।

ব্রিটিশ শাসনামলের গোটা ১৯০ বছরই বৃটিশ শাসন ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুসলমানদের অবিরাম লড়াইয়ের কাল। এই সুযোগে হিন্দুরা তাদের নতুন প্রভু ব্রিটিশের মিত্র বনে যায় এবং নতুন প্রভুর সহায়তায় ব্রাহ্মণ্য জাতীয়তা ও সংস্কৃতি নতুনভাবে বিন্যস্ত ও বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করে। মোগল আমলে শিবজী হিন্দুদের জাতীয় জাগরণের যে সূত্রপাত ঘটায়, ব্রিটিশ আমলে তা বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পালদের বিভিন্ন সংজ্ঞা সংগঠন ও হিন্দু কংগ্রেসের মাধ্যমে দূরন্ত গতি লাভ করে। তাদের মধ্যে আবার ফিরে আসে গুপ্ত, পাল ও সেন যুগীয় সেই সর্বগ্রাসী চরিত্র। তারা যেমন করে বৌদ্ধসহ সব সংস্কৃতিকেই গ্রাস করেছিল, তেমনি করে চাইল ইসলামি সংস্কৃতিকেও গ্রাস করতে। তারা বলল, ভারত শুধু ভারতীয় জাতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির জন্যেই। সুতরাং মুসলমানদেরকে ভারতীয় সংস্কৃতি অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতির আচরণই রপ্ত করতে হবে যদি তারা ভারতে থাকতে চায়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ভারতীয় হিন্দুরা এক ভারত রাষ্ট্র গঠনের তীব্র লড়াইয়ে রত হলো।

এ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্যে ভারতীয় মুসলমানদেরকে একই সাথে দুই শত্রু, ব্রিটিশ ও ভারতীয় হিন্দু, এর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হলো। তাদেরকে প্রমাণ করতে হলো, তারা শিক্ষা, বিশ্বাস, আদর্শ, আচরণ, ঐতিহ্য, সভ্যতা, ইতিহাস অর্থাৎ সার্বিক সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক জাতি। এ সাংস্কৃতিক লড়াইকে এগিয়ে নেবার জন্যে তৈরি হলো রাজনৈতিক প্লাটফরম মুসলিম লীগ। লড়াইয়ে

www.amarboi.org

অবশেষে জয় হলো। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো মুসলিম জাতি-সংস্কৃতির পৃথক আবাসভূমি হিসেবে পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান, আর হিন্দু জাতি সংস্কৃতির আবাসভূমি হিসেবে হিন্দুস্থান। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানেরই পূর্বাঞ্চল আলাদা হওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে আজকের বাংলাদেশ।

ব্রিটিশ আমলের সাংস্কৃতিক লড়াই এবং তার ফলে মুসলিম সাংস্কৃতিক আবাসভূমি হিসেবে পৃথক রাষ্ট্র এই বাংলাদেশের সৃষ্টি বাংলার সংস্কৃতিক সংঘাত ও বিবর্তনের ইতিহাসে এক মহা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অতীতে সাংস্কৃতিক বিবর্তন পরিবর্তন অনেক এনেছে, কিন্তু তা এসেছে রাজনৈতিক রাজ্য স্থাপনের পথ ধরে। নিরেট ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কারণে দেশে বিভাগ বা দেশ গঠন ইতিহাসে এই প্রথম। এর সুফল এই হয়েছে যে, আমাদের ইসলামি সংস্কৃতি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃতিগুলো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

এর আরও একটা বড় সুফল এই যে, আমাদের আত্ম পরিচয় এর আগে এমন সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে আসেনি। কিন্তু এর দু'টো প্রতিক্রিয়া আছে। এর একটি হলো আন্তঃসংস্কৃতি সংঘাত। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃতির সংঘাত দুই রাষ্ট্র গঠন করে শেষ হয়ে যায়নি, বরং একে অপরকে কাবু করার জন্যে নতুন সক্রিয়তা লাভ করেছে। ভারতে এবং আমাদের দেশে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংস্কৃতি আগ্রাসী রূপ নিয়ে মাথা তুলছে। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হলো, ব্রিটিশ আমলে সাংস্কৃতিক সংঘাত যে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে, সেই সাংস্কৃতিক সচেতনতায় একটা ক্লান্তি বা সব পাওয়াজনিত একটি অবসাদ বা অবসন্নতা। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটা আমাদের অনেকের মধ্যেই এসেছে। এমনকি অনেকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত ভূমিকা অস্বীকার করে আজ চরম সেকুলার সাজতে চাচ্ছেন। এটা মারাত্মক ধরনের ভ্রান্তি ও বিপথগামিতা। বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃতির আগ্রাসী উত্থানের মুখে একে এক উৎকট উদ্বেগের বিষয়ই বলতে হবে। এই সাংস্কৃতিক বিপথগামিতা চলতে দিলে, বাড়তে দিলে ব্রিটিশ যুগে যে বিজয় আমরা লাভ করেছি, সামনের সাংস্কৃতিক সংঘাতে তা পরাজয়ে পরিণত হবে। বাংলার সাংস্কৃতিক সংঘাত ও বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আরেকটি নতুন সংঘাত আসন্ন যার মঞ্চ ইতিমধ্যেই আমরা তৈরি দেখছি। বিবর্তনের এই পর্যায়ে নতুন সাংস্কৃতিক সংঘাত ইসলামি সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাথে সেক্যুলার সংস্কৃতিও যোগ হতে যাচ্ছে। তবে আমাদের দেশে সেক্যুলার সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে সহায়তা দান করারই একটা প্লাটফরম। অতএব অতীতের মত মূল পক্ষ এখনো দু'টোই।

www.amarboi.org

মানবাধিকারের স্বর্ণযুগ

বাংলা ভাষায় 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ' বলে একটা প্রবাদ আছে। হঠাৎ মায়ের চেয়ে মাসী যখন বেশি দরদি হয়ে যান, তখন তার পেছনে একটা মতলব থাকে, একথা বলাই এ প্রবাদের লক্ষ্য। প্রবাদের এ বক্তব্যের সাথে পাশ্চাত্যের ওরিয়েন্টালিস্টদের আচরণের একটা মিল আছে। ওরা এখন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সাংঘাতিক প্রবক্তা সেজেছে। আর ইসলামকে মানবতাবিরোধী ও মধ্যযুগীয় এবং চরমপন্থী ও অসহিষ্ণু বলা হচ্ছে। অথচ এই সেদিন মাত্র ১৯৪৮ সালে ওরা জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে মানবাধিকার আইন পাস করায়। অন্যদিকে সেই ৬১০ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের মহানবী (স) ঘোষণা করেছেন যে, বংশ, বর্ণ জাতি নির্বিশেষে সব মানুষ সমান। শুধু ঘোষণা করা নয়, তাঁর এবং খিলাফতে রাশেদার আমল এ ঘোষণা বাস্তবায়নের স্বর্ণযুগ ছিল। অহঙ্কারে-অন্ধ ওরিয়েন্টালিস্টরা যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সম্পর্কে বিশ শতকের মাঝামাঝি আইন বিধিবদ্ধ করে, অথচ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের মহানবী (স) বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বিধিনিয়ম নির্ধারণ করেন যে, বিজয়ী সৈনিকরা না খেয়েও যুদ্ধবন্দীদের খাওয়াবেন। মাত্র ১৮৬৩ সালে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথা বন্ধ হয়। এ বন্ধ করার আইন পাস করতে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে সোয়া ৬ লাখ মানুষ নিহত হয়। অথচ সাড়ে তেরশ বছর আগে ইসলামের নবী (স) দাস প্রথা বিলুপ্তির সূচনা করেন এবং দাসরা মুক্ত হতে থাকে। ইসলাম এও বিধান করে যে, একজন দাস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার খাওয়া, পড়া, ইত্যাদি সংক্রান্ত অধিকার তার মালিকের সম পর্যায়ে হবে। ১৮৩৫ সালে মার্কিন মেয়েরা তাদের জন্যে প্রথম স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। অন্যদিকে ইসলাম ১৪ শ' বছর আগেই মেয়েদের জন্যে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে। ১৮৪৮ সালে মার্কিন মেয়েরা সম্পত্তি ভোগের অধিকার লাভ করে। আর ইসলাম তার শুরুতেই পিতা, স্বামী, প্রমুখ আত্মীয়ের সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সুনির্দিষ্ট করে দেয়। ভোটাধিকারও মার্কিন মেয়েরা পায় মাত্র ১৯২০ সালে। আর মুসলিম মেয়েরা এ রাজনৈতিক অধিকার পেয়েছে পুরুষদের সাথে সাথেই। এ হতচ্ছাড়া অবস্থা যে পাশ্চাত্যের, সেই পাশ্চাত্য আজ ইসলামকে মানবাধিকার শেখাতে চায়। পাশ্চাত্যের এ অজ্ঞতার কারণ পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের সত্য গোপন। ওদের আন্তর্জাতিক আইন রচনার ইতিহাস শুরু হয় গ্রিসের নগর রাষ্ট্র দিয়ে। তারপর রোমান সভ্যতার বর্ণনা দিয়ে তারা লাফ দিয়ে চলে আসে আধুনিক যুগে। মাঝখানের ইসলামি সভ্যতার অবদানের কথা তারা ভুলে যান অথবা সেদিক থেকে তারা চোখ ফিরিয়ে রাখেন। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, গ্রিক এবং রোমান সভ্যতায় ইসলামের মতো আন্তর্জাতিক আইনের গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

www.amarboi.org

ছিল না। পাশ্চাত্যের এ অন্ধত্বতাড়িত প্রপাগান্ডার কারণেই এবং মুসলিম দেশসমূহে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলন না থাকার ফলেই ইসলামের মানবাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে বার বার আমাদেরকে নতুন করে কথা বলার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা করতে হয় মানুষের জন্যে স্রষ্টার মনোনীত শেষ জীবন বিধান ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে। অন্যান্য সব দিকের মতো মানবাধিকার প্রশ্নেও ইসলাম মানুষকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছে। খিলাফতে রাশেদার যুগ ছিল মানুষের এ অধিকার বাস্তবায়নের সোনালি যুগ।

খিলাফতে রাশেদা মহানবী (স) এর প্রতিষ্ঠিত শাসননীতি ও শাসন কার্যক্রমেরই একনিষ্ঠ উত্তরাধিকার। নববী শাসনে মানুষের ইহজাগতিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যাভসারী জীবন নীতি ও শাসন ব্যবস্থার যে কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, খিলাফতে রাশেদার শাসনে সে ফুলই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। শাসন কার্যক্রমের একটা মূল বিষয় হলো অধিকার, যেমন নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের অধিকার, রাষ্ট্রের উপরে নাগরিকদের অধিকার। রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক থাকে, বিদ্রোহীও থাকতে পারে। রাষ্ট্রের উপর তাদের কি অধিকার থাকবে এবং তাদের উপর রাষ্ট্রের কি অধিকার থাকবে, এসবও শাসন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তিকালীন পারস্পরিক কি অধিকার থাকবে তাও রাষ্ট্রের শাসন নীতির একটা অংশ। এসব অধিকারের ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করে থাকে। কিন্তু ইসলামে এ অধিকারসমূহ ও আইনের উৎস শাসক বা সরকার নয়। আল্লাহর ওহী আল কোরআন এবং মহানবী (স) এর সুন্নাহ হলো এসব অধিকার নির্ধারণ ও আইনগত মূলনীতির উৎস। খিলাফতে রাশেদার শাসননীতি ও শাসন কার্যক্রমের মূল উৎস ছিল এ আল-কোরআন ও সুন্নাহ। আইন বড় কথা নয়। আইনের অনুসরণ ও বাস্তবায়নের উপর অধিকারসমূহের সংরক্ষণ নির্ভর করে থাকে। আর আইনের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন নির্ভর করে জবাবদিহিতার উপর। এ ক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্র ও মুসলমানরা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার সদা জাগরূক অনুভূতি এবং পরকালে পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভয় মুসলমানদেরকে আইনের অনুসরণ ও বাস্তবায়নে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ধর্মহীন, ধর্মনিরপেক্ষ এবং নামমাত্র ধর্মানুসারীদের এ সুযোগ নেই বলে আইনের প্রণয়ণ, অনুসরণ ও বাস্তবায়নে তারা চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকে। ইসলামি রাষ্ট্র কল্যাণধর্মী হওয়া এবং অনৈসলামিক রাষ্ট্র নিপীড়নমুখী হওয়ার এটাই মূল কারণ। খিলাফতে রাশেদা ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ, তাই নাগরিক-অনাগরিক, মুসলমান-অমুসলমান, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে মানবাধিকার বাস্তবায়নেরও স্বর্ণযুগ ছিল খিলাফতে রাশেদা।

মহান রাব্বুল আলামীনের গোটা সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। সৃষ্টির সব আয়োজন মানুষকে কেন্দ্র করেই। আকাশ-বাতাস, তৃণ-লতা, পশু-পাখি. রোদ-বৃষ্টি, গাছ-পালা

www.amarboi.org

সব মানুষেরই প্রয়োজনে। এ কারণেই মানুষ আল্লাহর খলিফা, আল্লাহর প্রতিনিধি, আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি জগতের শাসক। খিলাফতের এ দায়িত্ব কোন বিশেষ মানুষের নয়, কোন বিশেষ গ্রুপের নয়, প্রতিটি মানুষের উপরে খিলাফতের এ দায়িত্ব ন্যস্ত। খলিফা হিসেবে প্রত্যেকে একে অপরের সমান। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এবং যোগ্যতা ও সুযোগের অসমতার কারণে মানুষের মধ্যে কেউ শাসক, কেউ শাসিত, কেউ ধনী, কেউ গরিব হতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসেবে তার মৌলিক অধিকারগুলো পাওয়া এবং সকল ব্যাপারে সুবিচার লাভ করা তার অলঙ্ঘনীয় অধিকার। ইসলামি ব্যবস্থাতেই মাত্র মানুষের এ অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। এ নিশ্চয়তার স্বর্ণযুগ খিলাফতে রাশেদার শাসনকাল।

মানুষের জন্ম ও পরিচয়ের দিকটি আবহমানকাল ধরে মানুষের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে আসছে। আজও পাশ্চাত্যে বর্ণ, ভাষা, দেশভিত্তিক কৌলীন্য কাউকে বড় করছে, আবার কাউকে ছোট করছে। কাগজে কলমে আজ পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে বর্ণবাদের উৎখাত ঘটলেও মন থেকে এর উৎখাত ঘটেনি। কিন্তু ইসলাম শুরু থেকেই এ বর্ণ ও ভাষাবাদী পার্থক্যের অবসান ঘটায়। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের অধীনে প্রথম সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেন একজন কৃতদাসপুত্র, যাঁর অধীনে হযরত ওমর (রা) একজন সামান্য সৈনিক ছিলেন। ইসলাম শুধুমাত্র বিলোপ করেনি বংশীয় পরিচয়। তার কারণ ইসলাম মানুষের সামাজিক কাঠামোতে আত্মীয়তা ও পরিবারের বন্ধনকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছে।

মানুষে মানুষে পার্থক্যের একটা বুনিয়াদ হলো জাতিগত কৌলীন্যবোধ। এ জাতিগত অহমিকা সহাবস্থানের অন্তরায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার অহমিকা থেকে। আজও বুশ ব্লেয়ারের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ সন্ত্রাস দমনের জন্য নয়, বরং পাশ্চাত্যকে বিশেষত মার্কিনীদের সুপার পাওয়ার হওয়ায় জাতিগত অহমিকাকে বিশ্বে প্রভুর আসনে বসাবার জন্যে। এ অহমিকার জন্ম পাশ্চাত্য সমাজে তাদের ইতিহাসের শুরু থেকে। গ্রিক সভ্যতার ঘোষণা হলো, 'যারা গ্রিক নয় তারা গ্রিকদের ক্রীতদাস হবে এটাই প্রকৃতির ইচ্ছা' আর পৃথিবীর তিরিশ ভাগের উপরও অধিকার বর্তায়নি সেই রোমকরাও বিশ্বাস করতো- তারাই পৃথিবীর মালিক, পৃথিবীর সব সম্পদ তাদের জন্যেই। তারা নিজেদের পরিচয় দিত পৃথিবীর সব মানুষের প্রভু বলে। আর আজকের পাশ্চাত্যের পরম বন্ধু ইহুদীদের ঘোষণা হলো ঃ 'যখন তোমার পূজনীয় প্রভু কোন নগরকে তোমার অধীন করবেন, তখন নগরের প্রতিটি পুরুষকে তলোয়ারের তীক্ষ্ণতায় হনন করো। তোমার শত্রুর সবকিছু তুমি ভোগ করবে।' অন্যদিকে মুসলমানরা কল্যাণের প্রবক্তা হিসেবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি এবং তাদের কল্যাণ ও মুক্তির আদর্শ ইসলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আদর্শ একথা ঠিক, কিন্তু ইসলাম অন্য

www.amarboi.org

জাতির ন্যায্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সহাবস্থানকে স্বাভাবিক হিসেবে ঘোষণা করেছে। শত্রু হলেও শত্রু যেহেতু মানুষ তাই তাদের মৌলিক ও ন্যায্য অধিকারের সংরক্ষণ করেছে ইসলাম। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শত্রু দেশে পাঠাবার সময় তাদের নির্দেশ দিতেন, "অর্থ অপহরণ করোনা, তসরূপ করোনা, প্রতারণা করোনা। শিশুকে কিংবা বয়বৃদ্ধকে কিংবা স্ত্রীলোককে হত্যা করোনা। খেজুর গাছ কাটবেনা বা দগ্ধ করবেনা। কোন ফলের গাছ কাটবেনা। গীর্জা ধ্বংস করোনা, ফসল দগ্ধ করোনা।" আর হযরত ওমর (রা) এর নির্দেশ হলো, "যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করোনা। তোমার শক্তি থাকলেও কারো অঙ্গচ্ছেদ করোনা। বিজয়ী হলে বাড়াবাড়ি করোনা। বৃদ্ধ ও নাবালককে হত্যা করোনা, বরং দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের সময় তাদের এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।"

ইসলামে এ মানবিকতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাশ্চাত্যের পৈশাচিকতার দৃষ্টান্ত ইতিহাস বহুবার প্রত্যক্ষ করেছে। ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন জেরুজালেম দখল করে, তখন একজন খ্রিস্টান ইহুদীর গায়ে হাত দেয়া হয়নি। কিন্তু পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান বাহিনী যখন জেরুজালেম দখল করে তখন নগরীর ৭০ হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুকে তারা হত্যা করে। বিনা প্রমাণে, বিনা বিচারে মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে যে গণহত্যা চালালো তা তাদের ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা। আর মুসলমানদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা হলো সহনশীলতা ও সহাবস্থানের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস। গ্রিক ও রোমান সভ্যতা যেখানে বলেছে অন্যসব মানুষকে দাস বানাবার জন্যে, সেখানে হযরত ওমরের শাসনাকালে সিরিয়ার একজন ধর্মযাজক ইউরোপের একজন বন্ধুকে লিখেছিলেন, "এই সব আরব যাঁদেরকে আল্লাহ এ যুগে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তাঁরা আমাদেরও প্রভু হয়েছেন। কিংবা তারা খ্রিস্ট ধর্মের সাথে আদৌ কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়না, বরং তাঁরা আমাদের ধর্ম রক্ষা করে, আমাদের ধর্মযাজক ও সাধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আমাদের গীর্জা ও মঠে চাঁদা প্রদান করে।" ইতিহাসে এমন কাহিনীর শেষ নেই। হযরত ওমর (রা) এর শাসনকালে একটি বিজিত দেশে হযরত ওমর (রা) একটা মসজিদ ভেঙে ফেলেছিলেন। কারণ মসজিদের স্থানটি একজন অমুসলিমের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল। হযরত ওমর মসজিদটি ভেঙে ফেলার পর ঐ জায়গা সেই অমুসলিম লোককে ফেরত দিয়েছিলেন।

গ্রিক ও রোমান সভ্যতা এবং আজকের পাশ্চাত্য কোন দেশ দখল করলে সেখানকার মানুষকে দাসে পরিণত করেছে এবং তাদের সবকিছুকে ভোগের বস্তু ধরে নিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও এর প্রমাণ দুনিয়ার মানুষ দেখেছে। অন্যদিকে ইসলাম বিজিত দেশের মানুষকে দেখেছে মানুষ হিসেবে। তাদের মৌলিক অধিকারকে পবিত্র জ্ঞান করেছে। খিলাফতে রাশেদার যুগে কোন নতুন ভূখণ্ড মুসলমানদের দখলে এলে সেখানকার মানুষকে আর শত্রুর দৃষ্টিতে দেখা হতোনা। মুক্ত মানুষ হিসেবে

www.amarboi.org

তাদের এ অধিকার দেয়া হতো যে, তারা একবছর সময়কালের মধ্যে যেন সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা তাদের পছন্দ মতো অন্য কোন দেশে চলে যাবে, না মুসলিম দেশের নাগরিক হিসেবে বসবাস করবে। মুসলিম দেশের নাগরিক হিসেবে থাকলে অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যোগ্যতার ভিত্তিতে খিলাফতে রাশেদার অধীনে রাষ্ট্রের বড় বড় পদে তাদের নিয়োজিত করা হতো। যিযিয়ার প্রশ্নে পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মতে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। পশ্চিমাদের এ অভিযোগ মিথ্যা। যিযিয়া কোন নিপীড়নমূলক বা বৈষম্যমূলক ট্যাক্স নয়। অমুসলিমরা যুদ্ধে না যাওয়ার বিনিময়ে এ নিরাপত্তা ট্যাক্স দিয়ে থাকেন। মুসলিম নাগরিকরা যুদ্ধে গিয়ে জীবন ও সম্পদের যে ঝুঁকি নেয়, সেই তুলনায় অমুসলিম নাগরিকদের এ নিরাপত্তা কর খুবই কম। বিজিত দেশের অমুসলমানদের সম্পদে হাত দেয়া হয় না, তাদের উপর যে যিযিয়া ধার্য করা হয়, সেটাও তাদের সাধ্য অনুসারে এবং নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থের উপর কোন যিযিয়া আরোপ করা হয় না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যদি অমুসলিমদের নিরাপত্তা দিতে ইসলামি সরকার অসমর্থ হতেন, তাহলে যিযিয়া হিসেবে আদায়কৃত অর্থ অমুসলিমদের ফেরত দেয়া হতো। হযরত ওমর (রা)-এর যুগে মুসলমানরা হেমস দখল করেছিল। পরবর্তীকালে সামরিক প্রয়োজনে যখন হেমস থেকে মুসলমানদের সরে আসতে হলো, তখন মুসলিম সেনাপতি অমুসলিমদেরকে তাদের যিযিয়া করের টাকা ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, "আমরা তোমাদের হেফাজত করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। যেহেতু আমরা তা পারছিনা, তাই তোমাদের অর্থের উপর আমাদের অধিকার নেই"। অধীন বা বিজিত দেশের নাগরিকদের অধিকারের প্রতি মর্যাদা দেয়ার, নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা ফেরত দেয়ার এমন দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যের গোটা ইতিহাস খুঁজলে একটিও পাওয়া যাবেনা। বরং পাশ্চাত্যের তো এটাই ঐতিহ্য যে, তাদের সেনাদল যখন কোন দেশ থেকে পশ্চাতাসরণে বাধ্য হয়, তখন তারা পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে এবং লুণ্ঠন ও ধ্বংসের মাধ্যমে সে ভূখণ্ডের মানুষকে সর্বস্বান্ত করে। রাশিয়ার পোড়ামাটি নীতির কাছেই জার্মান বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল। আফগানিস্তানে রুশ বাহিনী যে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করেছে এবং আজ পাশ্চাত্য বাহিনী আফগানিস্তানে সে পোড়ামাটি নীতিই অনুসরণ করছে, তার সাক্ষী আজ গোটা পৃথিবীর মানুষ। অদৃষ্টের পরিহাস, এ পাশ্চাত্যই আজ মুসলমানদেরকে মানবাধিকার শেখাতে চাচ্ছে।

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আল্লাহর নবী (স) এবং খিলাফতে রাশেদার যুগে মানবিকতার এক চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। কোন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা মুসলিম আইনে নিষিদ্ধ করা হয়। বলা হয়, বন্দীদের পর্যাপ্ত সুখাদ্য দিতে হবে। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। বন্দীদের উত্তাপ ও শৈত্য থেকে রক্ষা করতে হবে। তারা কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করলে, দ্রুত তা দূরীভূত করতে হবে। বন্দীদের মধ্যে কোন মাতাকে তার সন্তান থেকে, কোন আত্মীয়কে অন্য আত্মীয় থেকে আলাদা করা যাবে না। বন্দীদের

www.amarboi.org

ব্যক্তিগত মান-মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। বন্দীদের কাছ থেকে জবরদস্তি কোন কাজ নেয়া যাবে না। যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত এ নীতিমালা মুসলমানরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। মুসলমানরা নিজে না খেয়ে বন্দীদের খাইয়েছে। নিজেরা শীতে কষ্ট করে বন্দীদের আরামদায়ক পোশাক পরিয়েছে। যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত মুসলিম নীতিমালার মতো এত বিস্তারিত নীতিমালা পাশ্চাত্যে নেই। বিশ শতকের মাঝামাঝি জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে প্রণীত যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি মুসলিম আইনের মতো এত মানবিক নয়। তবু যেটুকু আইন পাশ্চাত্য অবশেষে করেছে সেটুকুও তারা পালন করছেনা। এ সেদিন আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী আফগান বন্দীদের পশুর মতো হত্যা করেছে। কালা-ই-জাহাঙ্গীর দুর্গের নিরাপরাধ কয়েক সহস্র বন্দীর রক্তের দাগ মানুষের মন থেকে কোন দিনই মুছে যাবার নয়। পণ্যবাহী কনটেইনারে তুলে শত শত বন্দীকে যেভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, তা শুধু ইউরোপের রোমানদের মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পাশ্চাত্যরা শিক্ষিত হয়েছে বটে! কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। তারা মনের দিক দিয়ে এখনও সেই মধ্যযুগে অবস্থান করছে, যখন বন্দীদেরকে হিংস্র ক্ষুধার্ত পশুর মুখে তুলে দেয়া হতো। তথাকথিত আল কায়েদা ও তালেবান বন্দীদের ক্যারিবিয়ান সাগরের 'গুয়ানতানামো' তে যেভাবে, যে পরিবেশে রাখা হয়েছে সেভাবে পশুকেও তার খোয়াড়ে রাখা হয়না। এ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী নিপীড়ক স্ট্যালিনকেও হার মানিয়েছেন গণতন্ত্রী বুশ। সোভিয়েত বন্দী শিবিরগুলোর অবস্থা আমেরিকার 'গুয়ানতানামো' থেকে অনেক ভালো ছিল। এ বুশরাই আবার মানবাধিকারের শ্লোগান দেন। বুশও নিঃসন্দেহে একজন শাসক। খিলাফতে রাশেদার কাছে শিখুন মানবাধিকার কাকে বলে। তারপর তাদের মুখে মানবাধিকারের শ্লোগান মানাবে।

শত্রুতারও যে কিছু নীতিমালা আছে, শত্রুদেরও যে কিছু অধিকার আছে, তা ইসলামই মানুষকে উপহার দিয়েছে। রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত হয় ১৮৬৪ সালে। যার ফলে যুদ্ধকালীন সময়ে পক্ষ নির্বিশেষে নিরপেক্ষ চিকিৎসা ও সেবার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ রেডক্রস প্রতিষ্ঠার সাড়ে ১২ শ' বছর পূর্বে ইসলাম ঘোষণা করে, চিকিৎসা পুরোপুরি মানবীয় সেবা। চিকিৎসক ও সেবাদানকারীদের কোন অনিষ্ট করা যাবেনা। মহানবী (স) এবং খিলাফতে রাশেদার সময়ে সেনাবাহিনীতে চিকিৎসক থাকতো যাঁরা প্রয়োজনে অমুসলিম শত্রুদেরও চিকিৎসা করেছেন।

চরম শত্রুর ধন-সম্পদকেও ইসলাম পবিত্র আমানত মনে করে। বিনা বিচার এবং সঙ্গত কারণ ছাড়া শত্রু বা তার সম্পদের কোন ক্ষতি করাকে ইসলাম অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। বৈধ অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রীয় কোন কর্মচারী, এমনকি সর্বোচ্চ কর্মচারীও যদি শত্রু দেশ বা শত্রুপক্ষের সম্পদের ক্ষতি করে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ ইসলামি রাষ্ট্রের

www.amarboi.org

জন্যে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সিরাতে ইবনে হিশামে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। বৈধ অনুমতি ছাড়া বনু জাযিমার প্রাণ ও সম্পদের কিছু ক্ষতি করা হয়েছিল। এ বিষয়টি ইসলামি সরকার জ্ঞাত হবার পর বনু জাযিমার প্রত্যেকটি জীবনের বিনিময়ে যুদ্ধপণ দেয়া হয়েছিল। এমনকি নিহত কুকুরের জন্যেও ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। মানবাধিকারের শ্লোগানে মুখর পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এ ধরনের কোন মহৎ মানবিক দৃষ্টান্ত নেই। আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী জীবন ও সম্পদের এমন কিছু ব্যাপক ক্ষতি করেছে যা নাকি ভুল করে সংঘটিত হয়েছে বলে তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে। কিন্তু এর জন্যে মার্কিন সরকার উপযুক্ত কোন ক্ষতিপূরণ দেয়নি। ইসলামি বিধান মতে যুদ্ধকালীন অবস্থাতেও শত্রুর ঋণ ও আমানত নষ্ট হয়না এবং তা তাদের পরিশোধ করতে হয়। ইসলামি সোনালি যুগে এর বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। পাশ্চাত্যের আধুনিক মানবাধিকার আইনে এটা কোন বড় বিষয় নয়। এ কারণেই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলো শক্তির জোরে সুযোগ পেলেই অন্যের অর্থ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিবাদকালীন অবস্থায় ইরান ও ইরাকের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং সম্প্রতি সৌদি সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের হুমকি দেয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের অনেক রাষ্ট্র তাদের শক্তির জোরে এই সুযোগকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। অথচ ইসলামের সোনালী যুগে শক্তিশালি ইসলামি সরকার শত্রু ও পরাজিত শত্রুর পাওনার প্রতিটি পয়সা পরিশোধ করেছে।

বিদ্রোহীদের ব্যাপারেও মানবিক নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম এবং কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছে। বলা হয়েছে, আত্মরক্ষা ব্যতীত অনাবশ্যকভাবে মারাত্মক অস্ত্রসমূহ বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করা উচিত। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-এর নির্দেশ হলো, "তোমরা যখন তাদের পরাজিত করো, তাদের মধ্যে আহতদের হত্যা করোনা, বন্দীদের শিরোচ্ছেদ করোনা, যারা দলত্যাগ ও ফিরে আসে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করোনা, তাদের স্ত্রীদের দাসীতে পরিণত করোনা। তাদের মৃতদের অঙ্গচ্ছেদ করোনা, যা আবৃত রাখা দরকার তা অনাবৃত করোনা।" আমাদের খিলাফতে রাশেদার এ মানবাধিকার নীতিমালার আলোকে বিশ্বের শীর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ এবং মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আচরণের দিকে একবার দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। সম্প্রতি আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন সব বিধ্বংসী ও প্রাণঘাতি গ্যাস-অস্ত্র ব্যবহার করেছে যা যুদ্ধে ব্যবহার নিষিদ্ধ। এসব বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারের ফলে বহু জনপদে মানুষের জীবন্ত সমাধি হয়েছে এবং প্রাণঘাতি গ্যাস-অস্ত্রে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। প্রায় নিরস্ত্র আফগানদের বিরুদ্ধে এসব অমানবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে গিয়ে মার্কিন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের গায়ে একটুও আঁচড় লাগেনি। কারণ তাদের মানবাধিকার শুধু তাদেরই অধিকার দেখতে পায়, আর কারোর নয়।

www.amarboi.org

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় মানবাধিকার অনন্য বৈশিষ্ট্যের আসনে সমাসীন হয়েছে। এখানে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হয়নি। শাসন বিভাগ যাতে বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করতে না পারে সেজন্যে শুরু থেকে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ আলাদা করা হয়েছে। অসামরিক বিচারপতিদের দিয়ে বিচার কাজ সম্পন্ন করা হতো। খলিফা বিচারপতিদের নিয়োগ করতেন, কিন্তু তাঁরা বিচার কাজে খলিফা বা শাসন কর্তাদের অধীন হতেন না। খলিফা কিংবা শাসন কর্তারা অভিযুক্ত হলে সাধারণ আসামীদের মতই তাঁদের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারের সম্মুখীন হতে হতো। এমন বিচারের দৃষ্টান্তে ইসলামের ইতিহাস ভরপুর। অনেক মামলায় নিরপেক্ষ সাক্ষীর অভাবে খলিফারা হেরেছেন এবং এ হেরে যাওয়াকে তাঁরা মাথা পেতে নিয়েছেন। শীর্ষ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার চর্চার দেশ হবার দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর পদে থাকা অবস্থায় তাদের বিচার হয়না। গণতন্ত্রের অধীনে জনপ্রতিনিধি হয়েও জনগণের চেয়ে তাদের অধিকার বেশি। কিন্তু ইসলামের মানবাধিকার আইনে সাধারণ মানুষ ও একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে পার্থক্য নেই। ইসলামের এ শ্রেষ্ঠত্ব যা খিলাফতে রাশেদার যুগ স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছিল, তা দুনিয়ার মানব রচিত সব সমাজ ব্যবস্থার শীর্ষে সমাসীন থাকবে চিরদিন।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো, বাদী-বিবাদী ও বিচারক একই ব্যক্তি হতে পারবেনা। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানও এ দায়িত্ব পাওয়ার অধিকারী নন। কারণ এ ধরনের ব্যবস্থায় কোন ন্যায় বিচার নিশ্চিত হতে পারেনা। বাদী ও আসামীর অধিকার নিশ্চিত করতে বিচারক ও তাঁর তদন্ত কাজকে বাদী ও আসামীর সকল প্রকার প্রভাব থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। ন্যায় বিচারের অতি সাধারণ এ কথা মানবাধিকারের আজকের শীর্ষ প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকরা জানলেও মানেন না। তাই দেখা যায় বিচারের অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে তারা বাদী ও বিচারক দুই দায়িত্বই কুক্ষিগত করেন। আফগানিস্তানের আল-কায়েদা ও তালেবানদের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ছিলেন বাদী, তদন্তকারী, বিচারক ও বিচারের রায় বাস্তবায়নকারী। এভাবে মানুষের অধিকারকে পদদলিত করতে তাদের বিবেকে একটুও বাধেনি। অথচ খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার এভাবে হয়না। এর অর্থ মার্কিনীরা মনে করে তাদের ক্ষেত্রে যে সুবিচার প্রযোজ্য, অন্যদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। বিচার ও আইনের ক্ষেত্রে পশ্চিমা এ ডবল স্ট্যান্ডার্ডই বিশ্বের আজকের অনেক অশান্তি ও মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্যে দায়ী।

ইসলাম মানুষের যে অধিকার নিশ্চিত করেছে, খিলাফাতে রাশেদার যুগে যা স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছিল, তার আলোচনা এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে পারে। কিন্তু

www.amarboi.org

আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি এখানেই শেষ করতে চাই। তবে শেষ করার আগে ইসলামের সরকার পরিচালনা ব্যবস্থায় সব পরিবেশের, সব যুগের সব মানুষের অধিকার কিভাবে নিশ্চিত হয়েছে সে সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতে চাই।

আজকের পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অধীন তাদের সরকার পরিচালনা ব্যবস্থাকে সবার জন্যে সমান প্রযোজ্য বলে মনে করছে। এর অন্যথাকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের খেলাফ বলে মনে করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে এশিয়ান দেশগুলোর প্রতিনিধিরা তাদের ব্যাংকক বৈঠকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিল, "গণতন্ত্রের মৌলিক ব্যবস্থার অধীনে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা কেমন হবে তা নির্ণয়ের অধিকার প্রত্যেকটি দেশের রয়েছে।" কিন্তু পশ্চিমারা এ ঘোষণাকে আমল দেয়নি। তাদের নকশা সকলকে গ্রহণ করতে হবে, এ তাদের অভিমত। কিন্তু ইসলাম এ ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটিকে গ্রহণ করেছে। চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলাম রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাকে 'পরামর্শভিত্তিক' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর স্থাপন করেছে, যার সার্বভৌমত্ব স্রষ্টার আয়ত্তে অর্পিত থাকে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে সরকার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হওয়ার পর সরকার কাঠামো বা গঠনপ্রণালি দেশের পার্থক্যে, মানব ও সমাজ পরিবেশের পার্থক্যে এবং সময়ের পার্থক্যে আলাদা হতে পারে–মানুষের এ অধিকারকে বাস্তবতা হিসাবে ইসলাম স্বীকার করেছে। মহানবী (স) এবং ইসলামের চার খলিফার সরকার গঠনমূলক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা থেকে এ সত্য ও শিক্ষাই প্রতিভাত হয়। সবশেষে এ অধিকারের কথা আমি এজন্যে তুললাম যে, আজকের আত্মমুখী পাশ্চাত্য সভ্যতা তার বিশ্বজয়ের হাতিয়ার হিসেবে শেকড়হীন এক গণতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রণহীন এক মুক্ত অর্থনীতি বিশ্বের সবার উপর চাপিয়ে দিতে চায়। তারা একটুও চিন্তা করেনা, পাশ্চাত্য তিনশ' বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে গণতন্ত্র ও অর্থ ব্যবস্থার যে পর্যায়ে পৌছেছে, এশিয়া-আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলো পরাধীনতার ক্লেদ তাদের শরীর থেকে না মুছতেই, শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নের মাধ্যমে জাতিগঠনের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম না করতেই এবং অর্থনীতি তার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই কি করে তারা পাশ্চাত্যের সেই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে। প্রকৃতপক্ষে এশিয়া-আফ্রিকার ঔপনিবেশ পীড়িত মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার খর্ব করারই এ আর এক প্রয়াস। হতে পারে এ এক নব্য উপনিবেশবাদ। খিলাফতে রাশেদার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ এ বিশ্বায়নের খেলাফ। খিলাফতে রাশেদা মানুষের রাজনীতি ও অর্থনীতির পদ্ধতিগত স্থান-কাল-পাত্র ভিত্তিক যে সর্বজনীন অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে, সেদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার এ অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি।

www.amarboi.org

আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন বলতে সাধারণভাবে বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনকেই আমরা বুঝি। কিন্তু বায়ান্নর আন্দোলন ভাষা আন্দোলনের পরিণতি পর্ব, এর শুরু কিন্তু অনেক আগে। প্রকৃতপক্ষে দেশ বিভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টির ধারণার মতই পুরানো রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটা। দেশ বিভাগকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান প্রস্তাবের আলোকে লিখিত মুজিবুর রহমান খাঁর 'পাকিস্তান', হাবিবুল্লা বাহারের 'পাকিস্তান', তালেবুর রহমানের 'পাকিস্তানের ক্রমবিকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলীয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার কথা আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে ঢাকা ও কোলকাতার 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' দেশ বিভাগের অনেক আগে থেকেই তাদের সভা সমাবেশে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে আলোচনা করত।

কিন্তু রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি বাদানুবাদে রূপ নেয় তখন, যখন হিন্দু প্রভাবিত কংগ্রেস সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'হিন্দী'র কথা বলে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'হিন্দীর' কথা ওঠার সাথে সাথে পাল্টা প্রস্তাব হিসেবে উর্দুর কথা উঠল। সেই সময় ১৯৩৭ সালের ২৩ এপ্রিল দৈনিক আজাদ রাষ্ট্রভাষার ওপর একটা দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখে। সম্পাদকীয়টিতে উর্দু-হিন্দী ঝগড়ার প্রেক্ষিতে বাংলাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিয়ে বলা হয়, "সাহিত্যের দিক দিয়া বাঙ্গালা ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দের সংখ্যাও বেশি। অতএব বাঙ্গালা সবদিক দিয়াই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবি করিতে পারে।"

১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবের পর এবং দেশ বিভাগের আগে রাষ্ট্রভাষার বিতর্ক যখন আরও তীব্র হয়ে ওঠে তখন বাংলাদেশের কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোর দাবি উত্থাপন করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে মাসিক মোহাম্মদীর কার্তিক সংখ্যায় 'পূর্ব পাকিস্তানের জবান' শীর্ষক নিবন্ধে আবুল মনসুর আহমদ বলেন, "উর্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাংলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করি, তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসলিম বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়নে হাত দিতে পারব।" ১৯৪৪ সালে মাসিক সওগাতের আশ্বিন সংখ্যায় 'পাকিস্তান ঃ রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি ফররুখ আহমদ লিখেন, "পাকিস্তানের অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে একথা সর্বাদিসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানেরই কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা ভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করেছেন যা নিতান্তই লজ্জাজনক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত

www.amarboi.org

করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে এই তাদের অভিমত। কি কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পিছনে কাজ করছে একথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি।" ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই দৈনিক আজাদে প্রকাশিত "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা" শীর্ষক একটি নিবন্ধে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয় তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই (কারণ উর্দু ভাষা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোন অঞ্চলের ভাষা নয়। এই অর্থে উর্দু বিদেশী ভাষা) যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিতে হয় 'তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।'

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার মাস তিনেক আগে হায়দরাবাদের উর্দু সম্মেলনে পাকিস্তানের একজন প্রথম সারির নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান ঘোষণা করেন, "উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে।" এই বক্তব্য দেশের রাষ্ট্রভাষা বিতর্ককে আরও উত্তপ্ত করে তুলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম এবং অন্যান্য কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রের উদ্যোগে 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠিত হয়। সংস্থা হিসেবে এই তমদ্দুন মজলিসই পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বলতে গেলে একক ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থা ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। ভাষা আন্দোলনের এটাই প্রথম পুস্তিকা। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে এতে প্রবন্ধ লিখেন অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, 'ইত্তেহাদ' সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ এবং অধ্যাপক আবুল কাশেম।

তমদ্দুন মজলিসের তৎপরতা এবং উপরোল্লিখিত পুস্তিকার ভূমিকা ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সময় তমদ্দুন মসলিস তার দ্বিতীয় উদ্যোগ হিসেবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা ও খ্যাতনামা লোকদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি মেমোরেন্ডাম সরকারের কাছে পেশ করে এবং তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১২ নভেম্বর রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থক মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে একটি সাহিত্য সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম, কাজী মোতাহার হোসেন এবং কবি জসিম উদ্দীন, প্রমুখ। এই সাহিত্য সভার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর নুরুল হক ভূঁইয়াকে আহবায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ তার কাজ শুরু করে। ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ব্যাপক প্রচার কাজ শুরু হয়। এই সময় চকবাজার এলাকায় প্রচার কাজ চালাতে গিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম এবং অন্যান্যরা বিরোধী পক্ষের দ্বারা ঘেরাও হন। ১৯৪৭ সালের ৬

www.amarboi.org

ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রথম ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ভিপি (মৌলভী) ফরিদ আহমদ, মুনির চৌধুরী, এ. কে. এম. আহসান, (বিচারপতি) আবদুর রহমান চৌধুরী, প্রমুখ। সভা শেষে ছাত্ররা মিছিল করে সেক্রেটারিয়েটে যায়।

ভাষা আন্দোলন ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করে গঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। এই সংগ্রাম পরিষদ ৭ মার্চ ঢাকায় এবং ১১ মার্চ গোটা দেশে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান করে। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১১ মার্চ এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে এই দিনই প্রথম সংঘটিত গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল, ছাত্রদের পিকেটিং এবং পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে ঢাকা শহর বিক্ষোভের নগরীতে পরিণত হয়। সেক্রেটারিয়েট এলাকায় পিকেটিং করতে গিয়ে কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, অলি আহাদ, খালেক নেওয়াজ, বায়তুল্লাহ, প্রমুখ পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে পড়েন এবং কাজী গোলাম মাহবুব ও শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। টিএন্ডটি এলাকায় পিকেটিং করতে গিয়ে সে সময়ের ডাকসুর জিএস গোলাম আযম এবং অন্যান্য ১২ জন ছাত্র গ্রেফতার হন। ছাত্র জনতার ওপর নির্যাতন চললেও সরকার আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করেন। পূর্ব পাকিস্তানের চীফ মিনিস্টার ছাত্রদের সাথে একটা চুক্তিতে আসেন। উল্লেখ্য, ১১ মার্চ ও ১৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যে ঐতিহাসিক ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী। ১৫ মার্চ স্বাক্ষরিত ৭ দফা চুক্তির প্রথম দফাতেই বলা হয়, পূর্ববঙ্গ পরিষদের চলতি অধিবেশনে বাংলাকে পূর্ব বঙ্গের সরকারি ভাষা এবং সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাব পাস করতে হবে। দ্বিতীয় দফায় বলা হয়, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত প্রাদেশিক পরিষদের গৃহীত একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হবে। এই চুক্তিতে সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন চীপ মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দীন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কামরুদ্দীন আহমদ। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এই চুক্তি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। এ চুক্তিকে স্বাগত জানাতে গিয়ে 'ইত্তেহাদ' তার সম্পাদকীয়তে বলে ঃ "বিরাট শক্তি ও দুর্জয় বিরোধিতার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া বাংলা ভাষা আন্দোলনকারীগণ যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা ইতিহাসে সোনার হরফে লিখিত থাকিবে।"

সত্যই তাই। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিই ছিল এই চুক্তি। সরকার কর্তৃক এই চুক্তির লংঘন করার প্রতিবাদেই ৫২-এর ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। চুক্তি হয়েছিল বলেই পরবর্তীকালে চুক্তি লংঘনের প্রশ্ন উঠেছিল এবং ভাষা আন্দোলন সামনে এগিয়ে চলার একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছিল।

১১ মার্চের পর আরও দুটো ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একটি কায়েদে আযমের ঢাকা রেসকোর্স ও কার্জন হলে ভাষণ। ২১ মার্চের রেসকোর্স এবং ২৪ মার্চের কার্জন হল

www.amarboi.org

ভাষণে তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন। দ্বিতীয়টি হল ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা। এই সমাবেশে ছাত্রদের তরফ থেকে তাঁর কাছে একটি মেমোরেন্ডাম পেশ করা হয়। ইংরেজি ভাষার এ মেমোরেন্ডামটি তৈরি করেছিলেন ছাত্রনেতা (বিচারপতি) আবদুর রহমান চৌধুরী। আর সমাবেশে তা পাঠ করেছিলেন তদানীন্তন ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক গোলাম আযম।

উল্লেখ্য, এই মেমোরেন্ডামে শুধু ভাষার দাবিই ছিল না, এতে এ অঞ্চলের গরিব ও পশ্চাৎপদ জনগণের বিভিন্নমুখী সমস্যাসহ তাদের প্রাণের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। মেমোরেন্ডামটি এ দেশের মানুষের স্বাধিকার সংগ্রামের একটি ঐতিহাসিক দলিল।

'৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুরু হয় খাজা নাজিমুদ্দিনের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। তিনি ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পল্টনের এক জনসভায় 'উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে,' একথা বলেন। তার এ ঘোষণা ছিল ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চের 'রাষ্ট্রভাষা' চুক্তির খেলাপ। এই চুক্তি খেলাপের প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এ তারিখেই ছাত্র নেতা আবদুল মতিনের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়ে গঠন করা হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ। আহবায়ক নির্বাচন করা হয় কাজী গোলাম মাহবুবকে। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের উদ্যোগে ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এবং বিকেলে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় ছাত্রনেতাদের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আবুল কাশেম এবং মওলানা ভাসানীও বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় চুক্তি ভংগের জন্যে সরকারকে অভিযুক্ত করা হয়। এ সভা থেকেই ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রস্তুতিমূলক কর্ম তৎপরতার মধ্য দিয়ে অবশেষে আসে ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারি। ঢাকা শহরের সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভংগ না করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে সামনে এগিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা না ভাঙ্গা ছাত্রদের স্বাধীন সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। আসে ২১ ফেব্রুয়ারি। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্রদের রাস্তায় বেরিয়ে আসার চেষ্টা আর পুলিশের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা এক জংগী পরিবেশের সৃষ্টি করে। ছাত্রদের ওপর নেমে আসে কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ, অবশেষে গুলি। গুলিবর্ষণে শহীদ হয়, সালাম বরকত, শফিক, রফিক, জব্বার এবং আরও অনেকে। সৃষ্টি হয় ভাষার জন্য জীবন দেয়ার নতুন এবং অন্যান্য এক ইতিহাস।

ভাষা আন্দোলনের এই ইতিহাস নিয়ে অনেক নষ্টাচার হয়েছে এবং হচ্ছে। ভাষা আন্দোলনে যাদের টিকিও দেখা যায়নি, তারা আজ ভাষা আন্দোলনের জনক সেজে বসতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করছে না। ভাষা আন্দোলন ছিল স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম

www.amarboi.org

প্রেমিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিমুক্ত ছাত্রদের একটা আন্তরিক আন্দোলন। বামপন্থী ও কম্যুনিস্টরা এবং বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী এই আন্দোলনকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে। কিন্তু সচেতন ছাত্ররা তা হতে দেয়নি। কিন্তু মতলবীরা তখন যা পারেনি, পরবর্তীকালে তারা আন্দোলনের ইতিহাসকে হাইজ্যাক করে, বিবৃত করে তাদের স্বার্থের কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। এর জন্য দায়ী যারা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারাও। এদের মধ্যে অধ্যক্ষ আবুল কাশেমের কিছু চেষ্টা ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আমরা তেমন কিছুই পাইনি যা থেকে আমরা ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারি। এমনকি ১৯৭৮ সালে ঢাকা ডাইজেস্ট সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের দিনের আলোতে না আনলে তাদের সবার নামও আমরা জানতে পারতাম না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সত্যিকার সৈনিকদের এই দুর্ভাগ্য দেখে ক্ষোভ হয়। কিন্তু সেই সাথে এই ভেবে তৃপ্তি পাওয়া যায় যে, তারা সত্যিকার অর্থেই মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন, নাম কেনা বা অন্য কোন স্বার্থে নয়।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা দিয়েছে, স্বাধিকার চেতনা অবশেষে দিয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীন হওয়ার পরেও আজ স্বকীয়তা আমাদের আহত, বিকলাংগ। বিকলাংগ বিকৃত দশা রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রসংগে এখানে কিছু বলব না।'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যে বাংলা ভাষার জন্যে, সে বাংলা ভাষাও আজ আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের শিকার। রাষ্ট্রভাষা হলেও রাষ্ট্রভাষার স্থান সে পায়নি। অবশেষে জাতীয় সংসদে আইনের চাবুকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। আজ কোলকাতার 'ভাষা সংস্কৃতি' আমাদের স্বকীয়তা গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। তাদের শব্দ সংস্কৃতি এসে আমাদের শব্দ ও ভাষা সংস্কৃতিকে মুছে দিচ্ছে। তাদের সাহিত্য এসে আমাদের বিকাশমান সাহিত্যের গলাটিপে ধরছে। দু'শ তেত্রিশজন বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দিয়েছেন অনেক দেরীতে। সম্ভবত সেই বায়াত্তর সালে মরহুম কবি জসীমউদ্‌দীন কোলকাতার সাহিত্যের এক তরফা প্রবেশের সমালোচনা করে সম-বিনিময়ের কথা বলেছিলেন। সেকথা বলে তিনি সেদিন হয়েছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু সেদিনের 'প্রগতিশীলরা' আজ প্রতিক্রিয়াশীল সাজতে বাধ্য হচ্ছেন নিছক নিজেরা সাহিত্যের বাজারে টিকে থাকার জন্যে। জাতির স্বার্থকে সেদিন তারা তোয়াক্কা করেন নি, কিন্তু আজ পেটের স্বার্থ তাদের বাধ্য করেছে জাতির কথা ভাবতে। এই ভাবনা আমাদের সকলের জন্যে সার্বিক হোক এবং তা আমাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাষা-সংস্কৃতিকে ষড়যন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করুক এই কামনা করে আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি।

www.amarboi.org

একুশ শতকের এজেন্ডা

অস্তায়মান বিশ শতকের উপসংহার থেকেই গড়ে উঠবে একুশ শতকের যাত্রাপথ। তাই এই উপসংহারের স্বরূপ সন্ধান খুবই জরুরি। আমেরিকান এক লেখক তার এক শতাব্দী-সিরিজ গ্রন্থে শতাব্দীর 'Mega Trend' গুলোকে তার মত করে চিহ্নিত করেছেন। এই 'Mega Trend' গুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

(ক) বিশ্ব অর্থনীতি

(খ) বিশ্ব রাজনীতি

(গ) বিশ্ব সংস্কৃতি

এই 'Mega Trend' গুলো বিশ শতাব্দীর অনন্য কারিগরি, বৈষয়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি এবং এই উন্নয়নের স্রোতে বহমান জাতিসংঘের অনন্য ভূমিকার দ্বারা প্রতিপালিত ও পরিচালিত হয়ে আগামী শতাব্দীর সিংহদ্বারে এক বিশেষ রূপ নিয়ে হাজির হচ্ছে। এই রূপের নির্ণয়ই একবিংশ শতাব্দীর প্রকৃতিকে পরিষ্কার করে দিতে পারে।

প্রথমে বিশ্ব অর্থনীতির শতাব্দী শেষের গতি-প্রকৃতির প্রশ্ন আসে। আশির দশকের শুরু পর্যন্ত বিশ্ব দুই অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমের সংঘাতে সংক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু তারপর মুক্তবাজার অর্থনীতির অপ্রতিরুদ্ধ গ্রাসে সমাজবাদী অর্থনীতির পতন শুরু হলো। আশির দশকের সমাপ্তিতে এসে তা সমাপ্ত হয়ে গেল। আজ মুক্তবাজার অর্থনীতির গ্রাসে গোটা পৃথিবী। মুক্তবাজার অর্থনীতির মূল কথা হলো ঃ শক্তিমান অর্থনীতি বিজয় লাভ করবে, পরাজিত হবে দুর্বল অর্থনীতি। এই পরাজয়ের ভয় দুর্বল অর্থনীতিকে সবল করে তুলবে এবং সেও উন্নীত হবে বিজয়ীর আসনে। তাই সবাইকেই মুক্তবাজার অর্থনীতির স্রোতে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই তত্ত্ব কথায় উল্লিখিত 'আইডিয়াল সিচুয়েশন' হয়তো কোনদিন আসবে কিংবা আসবেই না। তবে তার আগেই শক্তিমান অর্থনীতি করাল গ্রাসে আত্মরক্ষার অধিকারহীন দুর্বল অর্থনীতির পরাধীন হয়ে মরার মত বেঁচে থাকার পর্যায়ে চলে যাবে। যেমন আমাদের বাংলাদেশ মুক্তবাজার অর্থনীতি গলাধঃকরণ করে ইতিমধ্যেই বিদেশী পণ্য বিশেষ করে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় বাজার না পাবার আশংকায় বিদেশী বিনিয়োগ এখানে আসবে না, বরং তা যাবে বাজার দখলকারি দেশের পুঁজিপতিদের কাছে। যাওয়া শুরু হয়েছে। যে বিদেশি বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসার কথা ছিল তা গিয়ে বিনিয়োগ হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গে। এর অন্যথা না ঘটলে অব্যাহত এই প্রবণতা বাংলাদেশকে শিল্পপণ্যের ক্রেতা এবং কৃষিপণ্যের বিক্রেতায় রূপান্তরিত করবে।

www.amarboi.org

বলা হচ্ছে, এই বিনাশ থেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (W. T. O.) কিন্তু জাতিসংঘের মত এই সংস্থাও শক্তিমানদের দ্বারা পরিচালিত এবং শক্তিমান অর্থনীতিরই স্বার্থ পুরা করবে। শুধু তাই নয়, এই সংস্থা মুক্তবাজার বাণিজ্যের বিশ্বনিয়ন্ত্রক হিসেবে আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ দুর্বল অর্থনীতির বেয়াড়াপনাকে শায়েস্তা করার জন্যে বাণিজ্য অবরোধ আরোপ করতে পারবে হয়তো 'মহান' মুক্তবাজার অর্থনীতির মূল্যবান স্বার্থেই।

মুক্তবাজার অর্থনীতির এই বিশ্বরূপ বিশ্বে একক এক অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্যেই। যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে আজকের শক্তিমান অর্থনীতিগুলো, আর শোষিত হবে অনুন্নত ও উন্নয়নমুখী অর্থনীতির দেশসমূহ। আজকের বিশ্ব অর্থনীতির শতাব্দী শেষের এটাই প্রবণতা।

এই প্রবণতা তার লক্ষ্যে পৌছতে পারলে, একক এক বিশ্ব অর্থনীতি গড়া এবং তাকে এককেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়াস সফল হলে বিশ্বের মানুষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তার অশুভ প্রভাব নেমে আসবে।

অনুন্নত ও উন্নয়নমুখী মুসলিম অর্থনীতিগুলোর জন্যে এটা একবিংশ শতাব্দীর প্রথম চ্যালেঞ্জ।

বিশ শতকের দ্বিতীয় 'Mega Trend' হিসেবে আসে বিশ্ব রাজনীতির কথা।

ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ান একটা বিশ্ব রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যার নেতৃত্ব দেবে ইহুদিরা এবং যার রাজধানী হবে জেরুজালেম। তাঁর স্বপ্নের ভবিষ্যৎ আমি জানি না, তবে এক বিশ্ব অর্থনীতির মতই এক বিশ্ব রাষ্ট্র গড়ার ধীর ও ছদ্মবেশী প্রয়াস চলছে। এই প্রয়াসে ছাতা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে জাতিসংঘ এবং অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে গণতন্ত্র। গণতন্ত্র জয় করেছে যেমন কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্য, তেমনি জয় করবে গোটা বিশ্ব। বিশেষ সংজ্ঞায়িত এ গণতন্ত্রের আদর্শের কাছে জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় অধিকারকে বলি দিতে বলা হচ্ছে। বলি না দিলে শক্তি প্রয়োগেরও ব্যবস্থা রয়েছে। 'গণতন্ত্রের স্বার্থ' রক্ষার জন্যেই হাইতিতে আন্তর্জাতিক বাহিনী নামানো হয়েছে জাতিসংঘের নেতৃত্বে। এমন হাইতি ভবিষ্যতে আরও অনেক হতে পারে।

গণতন্ত্র কিন্তু সমস্যা নয়, সমস্যা হলো গণতন্ত্রের অর্থ ও অধিকারের সংজ্ঞা নিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত মোড়ল গণতান্ত্রিক দেশগুলো যে রক্তস্রোতের ওপর তাদের বর্তমান রাষ্ট্রসংহতি গড়ে তুলেছে, সে রক্তস্রোত প্রবাহিত না হলে এবং সে সময় গণতন্ত্রের নীতি অনুসৃত হলে তাদের এই রাষ্ট্রসংহতি গড়ে উঠতো না। এমনকি রেড ইন্ডিয়ানদেরও একাধিক রাষ্ট্র সৃষ্টি হতো। এই ইতিহাস তারা ভুলে গেছে। যেমন আমাদের প্রতি এখন তাদের নসিহত, বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর গায়ে আমাদের হাত দেয়া যাবে না। তথাকথিত 'আদিবাসি' বলে তাদের মাটিতে আমাদের পা দেয়া যাবে না। দেশের ভেতরে কোন গ্রুপ বা ব্যক্তি যদি বিদেশী টাকার পুতুল সেজে জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে গলা টিপে মারতে চায়, তাহলেও গণতন্ত্রের আদর্শের স্বার্থে তাদের জামাই আদর দিয়ে যেতে হবে।

www.amarboi.org

গণতন্ত্রের দায়িত্বহীন এই আদর্শ অনুন্নত ও উন্নয়নমুখী এবং সমস্যা পীড়িত দেশ ও জাতিকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত এমনকি খণ্ড-বিখণ্ড করতে পারে। অন্তত আর কিছু নাহোক বহু মত ও পথে বিভক্ত এবং দুর্বল তো করবেই। এ ধরনের দেশ ও জাতিকে তাদের স্বকীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে অনায়াসেই সরিয়ে আনা যায় এবং তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ওপর বিদেশী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে এনজিও প্রভাব। এরা নামে নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন হলেও এদের সরকারি ভূমিকা ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছে। এখনি এরা সরকারি বাজেটের একটা অংশ পাচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতে এরা সরকারের গোটা সার্ভিস ও উন্নয়ন সেক্টর পরিচালনার অধিকার পেয়ে যাচ্ছে। তখন আইন-শৃংখলা ও দেশরক্ষা ছাড়া সরকারের হাতে কিছুই থাকবে না। জাতিসংঘের অনুসৃত নীতি রাষ্ট্রসমূহের দেশ রক্ষা ব্যবস্থাকে সংকুচিত অথবা বিলোপ করে দিতে পারে। জাতিসংঘ শান্তি রক্ষার কাজ অনেক আগেই শুরু করেছে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজেও হাত দিয়েছে। অতএব জাতিসংঘ নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে সঙ্গত কারণেই রাষ্ট্রসমূহকে দেশ রক্ষা বাহিনী খাতে খরচ বন্ধ করতে বলতে পারে। সুতরাং সরকারের কাজ তখন হয়ে দাঁড়াবে শুধু শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সরকারের এই কাজও নিয়ন্ত্রিত হবে এনজিওদের দ্বারা। কারণ এনজিওরা গোটা সার্ভিস ও উন্নয়ন সেক্টরের মালিক হওয়ার ফলে দেশের রাজনীতি তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে। আর এনজিওরা, সবাই জানেন, আর্থিক ও আদর্শগত দিক থেকে মূলত জাতিসংঘ অথবা জাতিসংঘের পরিচালক শক্তিসমূহের আজ্ঞাবহ। এ অবস্থায় রাষ্ট্রসমূহ কার্যতই জাতিসংঘ নামের এককেন্দ্রিক এক শক্তির অধীনে চলে যাবে।

রাষ্ট্রের অন্যতম নিয়ামক হলো জাতীয়তাবোধ। এই জাতীয়তাবোধ বিলোপ অথবা দুর্বল করারও একটা প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী চলছে। জাতিসংঘ তার উন্নয়ন, সেবা ও শান্তি প্রতিষ্ঠামূলক এজেন্সিসমূহের মাধ্যমে একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলছে এবং পারস্পরিক নির্ভরতার এক অপরিহার্য অবস্থা সৃষ্টি করছে। এ অবস্থা জাতীয় চিন্তাকে ধীরে ধীরে পেছনে ঠেলে দেবে এবং আন্তর্জাতিক বিবেচনাকে বড় করে তুলবে। জাতিসংঘের পেছনে 'নাটের গুরু' যারা, তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এই 'শূন্য জাতীয় বোধ'-অবস্থা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

এভাবেই পৃথিবীর আজকের শক্তিমানরা জাতিসংঘের ছায়ায় দাঁড়িয়ে জাতিসংঘকে নতুন এক বিশ্বরূপ দিতে চাচ্ছে। জাতিসংঘের জননন্দিত সেক্রেটারি জেনারেল দাগ হ্যামার শোল্ড বলেছিলেন, জাতিসংঘকে হতে হবে 'বিশ্ব সংস্থা', 'বিশ্ব সরকার' নয়। সে হবে উন্নয়ন ও শান্তির 'সহায়তাকারী' কোনক্রমেই জাতিসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কোন সিস্টেমের ডিক্টেশনকারী নয়। কিন্তু জাতিসংঘকে আজ রাষ্ট্রসমূহকে দুর্বল ও নিরস্ত্রিত্ব করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্বের দুর্বল জাতিসমূহের মত মুসলমানদেরকেও একবিংশ শতকের এই জটিল রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

www.amarboi.org

বিশ্বে এক অর্থনীতি ও এক রাজনীতির মত গোটা বিশ্বকে এক সংস্কৃতির অধীনে আনারও দুর্দান্ত প্রয়াস চলছে। এই লক্ষ্যে দুনিয়ার মানুষের জন্যে একক এক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কাজ করছে। তারা চাচ্ছে গোটা দুনিয়ার জন্যে মূল্যবোধের একক একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করতে। এই মানদণ্ডের নাম দেয়া হয়েছে 'সেক্যুলার হিউম্যানিজম'। জাতিসংঘের এ সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজে এই তত্ত্ব দাঁড় করানো হচ্ছে যে, মানবাধিকার সকলের উর্ধ্বে। জাতীয় ধর্ম, জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় ঐতিহ্য, ইত্যাদি অধিকার সবই এর অধীন। এই অধিকারগুলো ততটুকুই ভোগ করা যাবে, যতটুকু 'মানবাধিকার' অনুমতি দেয়। জাতিসংঘের এক দলিলে এভাবে বলা হয়েছে, সাংস্কৃতিক জীবন ও পরিচয়ের বিকাশসহ সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই স্বীকৃত। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক অধিকারকে সীমাহীন করা যাবে না। যখনই তা মানুষের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে, তখনই সাংস্কৃতিক অধিকার অচল হয়ে পড়ে।' এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, সাংস্কৃতিক অধিকারকে মানুষের মৌল স্বাধীনতা ও অধিকার খর্ব করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না (United Nation Background note-by Diana Ayten Shenker)। এই দৃষ্টিভঙ্গিই জাতিসংঘের নাইরোবি সম্মেলন, কায়রোর জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন, কোপেনহেগেনের সামাজিক শীর্ষ সম্মেলন, বেজিং-এর বিশ্ব নারী সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে এবং আরও হবে। উদ্বেগের বিষয়, এসব সম্মেলনে সুকৌশলে প্রণীত 'ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ' (Secular Humanism) প্রতিষ্ঠার দলিলে অধিকাংশ মুসলিম দেশও দস্তখত করেছে। অথচ জাতিসংঘ প্রচারিত 'ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ'-এর তত্ত্ব মেনে নিলে ইসলামকে কেটে ছোট বিকলাঙ্গ করে মসজিদে পুরে রাখতে হবে। তাদের বলা উচিত ছিল, 'তথাকথিত সার্বজনীন মানবাধিকার আইন নিশ্চিতভাবেই মানবজীবন, তার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার ঐতিহ্যিক সংরক্ষণকে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন করে তুলতে পারে। ইসলামের আদর্শ ও সংস্কৃতির মাধ্যমে কার্যকরভাবে মানব মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হয়, 'সেটাই হয় সত্যিকারের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা।' কিন্তু এই কথা কেউ আমরা বলিনি।

এভাবে অন্য কেউও বলছে না, অন্য জাতি, অন্য ধর্মও নয়। তার ফলে 'ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ'-ই বিশ্ব সংস্কৃতির একমাত্র মানদণ্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্য কথায় এটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিশ্ব সংস্কৃতি।

এর ফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা আমাদের ধর্ম পালন করতে পারবো না। উত্তরাধিকার আইনকে বলা হবে মানবাধিকার বিরোধী, শাস্তি আইন অভিহিত হবে বর্বর বলে, পর্দাকে বলা হবে মানবাধিকারের খেলাপ, কুরবানীকে বলা হবে অপচয় ইত্যাদি। এমনকি ইসলামের দাওয়াতকে নিষিদ্ধ করা হবে মানবাধিকারের পরিপন্থী বলে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, কোথাও জাতীয় আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হলে তাকে অভিহিত করা হবে মানবাধিকার বিরোধী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে।

www.amarboi.org

'সেক্যুলার হিউম্যানিজম' প্রকৃতপক্ষে সুদূরপ্রসারী একটা ষড়যন্ত্র। এর লক্ষ্য মানুষকে তার অলক্ষ্যে তার ধর্ম থেকে সরিয়ে নেয়া। মানুষের ধর্ম না থাকলে তার জাতীয়তা ধসে পড়বে। জাতীয়তা ধসে পড়লে তার রাষ্ট্রও ধসে যাবে। এটাই চাচ্ছে আজকের ছদ্মবেশ নিয়ে দাঁড়ানো বিশ্ব নিয়ন্ত্রকরা।

বিশ্বে ধর্মসমূহকে বিশেষ করে ইসলামকে ধর্ম ও সংস্কৃতি বিরোধী এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে একবিংশ শতকে।

বিশেষ করে ইসলামকেই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। কারণ, অন্য ধর্মগুলোর কোনটিই মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকরী নয়। সুতরাং তারা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে না, করতে চাইলেও তারা পারবে না। কিন্তু ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। শুধু ইসলামই তাদের চ্যালেঞ্জ করে টিকে থাকতে পারে। ইসলামের শত্রুরাও এ কথা বলছে। 'The End History'-এর লেখক ফ্রান্সিস ফকুয়ামা কম্যুনিজমের ধ্বংস স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিজয় প্রমাণ করছে যে, পশ্চিমা উদারনৈতিক মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সব ব্যবস্থাই আজ খতম হয়ে গেছে।' কিন্তু তিনিই আবার বলেছেন, 'তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটা হবে ধর্মের সাথে আসছে একবিংশ শতাব্দীতে' এবং তাঁর মতে সে ধর্ম ইসলাম।

সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীতে মানবতার সামনে, তার মোকাবিলা ইসলামকেই করতে হবে।

আর এ দায়িত্ব বিশ্বের মুসলমানদের। আনন্দের বিষয়, এ দায়িত্ব পালনের জন্যে জাতীয় জীবনে যে রেনেসাঁ প্রয়োজন, সে রেনেসাঁ আজ সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম বিশ্বে। রেনেসাঁর নিশান বরদার সংগঠনেরও সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম দেশে দেশে। ক্রমবর্ধমান হারে তরুণদের সম্পৃক্তিতে এ সংগঠনগুলো বিকশিত হয়ে উঠছে। ত্যাগ ও কুরবানীর ক্ষেত্রেও রেনেসাঁ-কাফেলার নিশানবরদাররা পিছিয়ে নেই। আজ গোটা দুনিয়ায় আদর্শের জন্যে ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবন দিচ্ছে একমাত্র মুসলমানরাই।

তবে প্রয়োজনের তুলনায় এবং চ্যালেঞ্জের নিরিখে এটুকুই যথেষ্ট নয়। এসব কাজকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করার জন্যে মৌল কিছু বিষয়ে মুসলিম তরুণদের নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। মৌল এই বিষয়কে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) নিজেদের জীবনব্যবস্থা ও তার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন। কুরআন, হাদিস এবং মহানবীর জীবন সম্পর্কে তো অবশ্যই, ইসলামের আইন ও ঐতিহ্য সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

www.amarboi.org

(খ) ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রতিটি মুসলিম তরুণকে তার চারপাশে যা আছে, যা ঘটছে তার প্রতি তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণী দৃষ্টি রাখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব বিষয়েই। এই নিরিক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের মনে রাখতে হবে, দৃষ্টি-মনোহারীতা নয় সত্যই আসল কথা। আজ আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন প্রচারণার জোরে খুব সহজেই মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। এ অবস্থায় গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিবোধ সামনে রেখে অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

(গ) তীব্র সাংস্কৃতিক সংঘাতের এ যুগে মুসলিম তরুণদেরকে নিজেদের সাংস্কৃতিক নীতিবোধ ও পরিচয়কে ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আর্ট, আরকিটেকচার থেকে শুরু করে জীবনচর্চার সকল ক্ষেত্রে ইসলামের চিন্তা ও দর্শনকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে এবং বুঝতে হবে ইসলামের সাথে অন্য সংস্কৃতিগুলোর মৌল পার্থক্যসমূহ। এই পর্যালোচনার জ্ঞান তাদেরকে নিজেদের এবং অন্যদের অবস্থানকে বুঝতে সাহায্য করবে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমর্থ করে তুলবে।

(ঘ) মুসলমানদের বিজ্ঞানের যে পতাকা ৯শ' বছর আগে অবনমিত হয়েছিল এবং সাড়ে ৬শ' বছর আগে ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছে, সেই পতাকার গর্বিত শির আবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যে মুসলিম তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে।

(ঙ) ইসলাম সকল যুগের সর্বাধুনিক মতবাদ। এই মতবাদকে যুগ–পূর্ব অচল ভাষা বা কৌশলে নয়, যুগশ্রেষ্ঠ ভাষায় যুগ–উত্তর লক্ষ্য সামনে রেখে উপস্থাপন করতে হবে। শুধু তাহলেই এই আদর্শ যুগ-চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সকল মানুষের ঘরে গিয়ে পৌছতে পারবে।

এই করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারলে মুসলিম তরুণরা যে জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক শক্তিতে সজ্জিত হবে, তা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে অবশ্যই প্রয়োজন।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মূলতই সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক। এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে অবশ্যই অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমরশক্তির মত দিকগুলো আছে। তবে এগুলোর অর্জন, অধিকার, ব্যবহার, কার্যকারিতা-সবকিছুই বুদ্ধির শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কম্যুনিজম রক্ষার সব অস্ত্র, সব অর্থ সোভিয়েত ভাণ্ডারে থাকার পরেও বৈরী জ্ঞান ও সংস্কৃতির সয়লাবে যেমন তা শেষ হয়ে গেছে, তেমনি 'সেক্যুলার হিউম্যানিজম' এবং আগ্রাসী পুঁজি ও আধিপত্য রক্ষার 'গণতন্ত্র' তার ভাণ্ডারে সব অস্ত্র, সব অর্থ রেখেই শেষ হয়ে যেতে পারে। প্রয়োজন শুধু ইসলামের মহান মানবতাবাদী জ্ঞান ও সংস্কৃতির আধুনিকতম মানের প্রচণ্ড এক সয়লাব।

www.amarboi.org

ঊনবিংশ শতকের অনন্য জাতীয় উত্থান

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ ভারতে বিস্ময়কর এক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে ভারতের পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুসলমানের চেতনাকে উদ্বেল করে তুলল এই আন্দোলন। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ঘরবাড়ি ছাড়া, হিজরতের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, শাহাদাতের অভিলাষে সদা উন্মুখ লাখো যুবক-বৃদ্ধের চোখে-চেহারায় ইসলামের সোনালী যুগ যেন আর একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল। এই আন্দোলনের কদর্য করার জন্য ইংরেজরা এর নাম দিল ওহাবী আন্দোলন। কেউ একে বলল সংস্কার আন্দোলন, কেউ একে নাম দিল জেহাদী আন্দোলন, কারও চোখে এটাই ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের প্রথম আযাদী আন্দোলন। আসলে এটা ছিল ভারতে প্রথম সুসংবদ্ধ ইসলামি আন্দোলন। ব্রিটিশ এবং আন্দোলনের আরও যারা বিরোধী তারা এ কথাটা সত্যিই বুঝেছিল, কিন্তু এদিক থেকে সকলের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার জন্যই এর একটি ভয়ংকর রূপ ব্রিটিশ এবং হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা সবার সামনে তুলে ধরল। তবু তাদের গালাগালি ও কুৎসা রটনার ফাঁক গলিয়ে সত্য তার আসল রূপ নিয়ে বেরিয়ে এল বার বার। ১৮৭০ সালের ২ আগস্ট "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" পত্রিকা লিখল ঃ

"ওহাবীরা তো ছড়িয়ে আছে সারা ভারতময়, আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও হায়দরাবাদের মতো শক্তিশালী ও সদা উত্তপ্ত মুসলমান রাজ্যেও তাদের সংখ্যা খুবই বেশি। .... ওহাবীরা খুব বিপজ্জনক সম্প্রদায় এবং সারা ইসলামিস্তানে (ভারতের উত্তর–পশ্চিম সীমান্তে) বিস্তৃত।......... ওহাবী আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল ইসলামের মূল উৎস আরব দেশে এবং বর্তমানে সমগ্র মুসলিম জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। ওহাবী প্রচারকরা খ্রিস্টান মিশনারীর মতোই অসংখ্য ও তেমনই স্বধর্মনিষ্ঠ। বিরুদ্ধবাদী হলেও ওহাবীরা গোঁড়া মতবাদীদের চোখে কঠোর সংযমশীলতার জন্যে শ্রদ্ধার পাত্র। .... জেসুস্টদের মতোই ওহাবীদের নিজস্ব সংগঠন আছে, তাদের প্রচারকদিগকেও রীতিমতো টাকা-পয়সা দেয়া হয় এবং এসব টাকা-পয়সা আসে সংসারী লোকদের নিকট থেকে আদায়কৃত তহবিল থেকে। ওহাবী সম্প্রদায়ের লোকেরাও একটি সুনির্দিষ্ট পথ ঠিক করে নিয়ে সাধারণ জনগণের সঙ্গে মিশে নীরবে কাজ করে যায়, কেউ দৈনন্দিন বেচাকেনার কাজ করে, কেউ বা কখন কাফেরদের আদালতে কেরানিগিরির কাজও করে। কিন্তু কখনও তারা নিজেদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য কিংবা রাজনৈতিক লক্ষ্য ভুলে না। তারা অলক্ষ্যে আরও সুচারুভাবে এসব উদ্দেশ্যে কাজ করে যায়, টাকা পয়সার সাহায্য দিয়ে নতুন মতাবলম্বী সংগ্রহ করে এবং দূরের ও নিকটের সহকর্মীদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রেখে ভারতে কিংবা আরবেই হোক জেহাদ পরিচালনা করে। এই আন্দোলনটা নিঃসন্দেহে

www.amarboi.org

সবদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীতে ইসলামের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা, আর এ উদ্দেশ্যে ইসলামের অনুসারীদের সত্যিকারভাবে ইসলামে ফিরিয়ে এনে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন ঘটানো।"

উইলিয়াম হান্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে ওহাবীদের সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন উক্তি করেন। ওহাবীদের সমালোচনার ফাঁকে ফাঁকে অনেক সত্য বের হয়ে এসেছে তাঁর কলম থেকে। তিনি লিখেন ঃ

"তারা (ওহাবীরা) ইসলামের একেশ্বরবাদী, একনিষ্ঠ ও বাস্তবনৈতিকতাই হচ্ছে তাদের শক্তির প্রধান উৎস। তারা প্রাণপণে চেষ্টা করে আদিম ইসলামের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে, রীতিনীতিতে সেই সহজ সরলতা, জীবনধারায় সেই রকম পবিত্রতা এবং ইসলাম প্রচারে সেই রকম দৃঢ়তা অবলম্বন করতে। তাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে দুটি–আল্লাহ্‌র একত্ব ও আত্মোৎসর্গ। .... আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর যে অকুণ্ঠ নির্ভরতা হযরত মুহম্মদের (স)-এর সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল, সেটাই তারা প্রত্যেক মুসলমানের কাছে দাবি করতো। .... ওহাবীরা কোনো একটি অর্থবান ও শক্তিশালী শ্রেণী বিশেষের দয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। আমি আগেই বলেছি এবং এখনো আনন্দের সঙ্গে বলছি যে, তাদের মধ্যে এমন হাজার হাজার খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি আছেন, যারা আত্মনিগ্রহকে জীবনের প্রথম কর্তব্য হিসেবে জ্ঞান করেন। এই দিকটাই তাদের সমগ্র সংগঠনের ওপর কল্যাণ করেছে এবং বিষয় বাসনাদগ্ধ সরকারি লোকদের চোখে সম্ভ্রম, এমন কি ধর্মীয় পবিত্রতা এনে দিয়েছে। ওহাবীদের মনে নিজের জন্য ভয় নেই, অন্যের জন্য দুঃখ নেই। তার জীবনের পথ ঋজু ও পরিষ্কার এবং কোনো সাবধান বাণী বা শাসন বানী তাকে ডাইনে বা বাঁয়ে নোয়াতে পারে না।"

ওহাবী আন্দোলন তথা ইসলামী আন্দোলনের চরম বিদ্বেষী "হিন্দুপ্যাট্রিয়ট" এবং এ আন্দোলনের কঠোর সমালোচক ব্রিটিশ-রাজ্যের প্রতিনিধি উইলিয়াম হান্টার সাহেবের উপরের উদ্ধৃতিগুলোতে ঐ আন্দোলন ও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের যে চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করলাম তার মধ্য দিয়েই ইসলামী আন্দোলনের চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত প্রকৃতই এটা ছিল এক নির্ভেজাল আদর্শবাদী এক গণ-আন্দোলন। এ আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী। ১৮৩১ সালের ৬ মে উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বালাকোট উপত্যকায় এক ভয়ংকর অসম যুদ্ধে তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন।

বালাকোটে শহীদানের লাশের মিছিলে ওহাবী আন্দোলন তথা ইসলামী আন্দোলন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল এটাই ইতিহাসের স্বাক্ষ্য। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা সৈয়দ আহমদ শহীদ ভারতে ইসলামী আন্দোলনের যেমন প্রথম নন, শেষও নন। ভারতে এ ইসলামী আন্দোলন গড়ে ওঠার ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি এর শেষ হওয়ার ইতিহাসেরও আজ শেষ হয়নি। সেই ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। ভারতের ঊনবিংশ শতকের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে মনোযোগ দেবার আগে

www.amarboi.org

আঠার শতকের আরব ভূমিতে একবার ফিরে যাওয়া দরকার। আগেই বলেছি ভারতের এ ইসলামী আন্দোলনকে 'ওহাবী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করেছিল বৃষ্টিশরা এবং উপরে হিন্দু "প্যোট্রিয়ট" পত্রিকার উদ্ধৃতিতে দেখেছি, ওহাবী আন্দোলন ইসলামের মূল উৎস আরব ভূমিতে জন্ম নিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে আরবে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, যে আন্দোলন উনবিংশ শতকেভারতীয় ইসলামী আন্দোলনকে প্রেরণা দিয়েছিল, সে আন্দোলনের নায়ক ছিলেন মুহম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী, তাঁর আন্দোলন ছিল ইসলামী আন্দোলন। বৃটিশরা মুহম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর আন্দোলনকে স্বতন্ত্র এক মাযহাব হিসাবে চিহ্নিত করতেও অগ্রপয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু আবদুল ওহাব কোন মাযহাব সৃষ্টি করেননি। বিশ্বনবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামের যে রূপ ছিল সেই নিষ্কলুষ ও নির্ভেজাল ইসলামের প্রত্যাবর্তনই ছিল তার লক্ষ্য। তিনি বলতেন, "ধর্ম কোন শ্রেণীবিশেষের একাধিকার নয় কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়াও কোন ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের একাধিকার নয়। কোন যুগ বিশেষের মধ্যেও সীমিত নয় প্রত্যেক 'আলিম' বা শিক্ষিত ব্যক্তির অধিকার আছে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা দেয়ার।" যে সব জিনিস বিদআত, শিরক ও কুফরের প্রশ্রয় দেয় এবং 'ইলহাদ' বা ধর্মবিরুদ্ধ, সে সবের উৎখাত করতে তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। আল্লাহর তাওহীদ-জ্ঞানে এতোটুকু অন্য ভাব অনুভূতির প্রশ্রয় দেয়া তার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তার মৌল শিক্ষাই ছিল লা-শরীক আল্লাহ্‌র একান্ত ও অকুণ্ঠ নির্ভরতা এবং স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে যাবতীয় মধ্যস্থতার অস্তিত্ব বা চিন্তার বিলোপ সাধন, ওলি ও পীরদের প্রতি মুসলমানদের পূজা, এমন কি হযরত মুহাম্মদেরও আধা ঐশ্বরিক রূপ কল্পনার বিলোপ সাধন। কবরে সৌধ নির্মাণ তার মতে পৌত্তলিকতারই শেষ চিহ্নমাত্র। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বা নির্দেশের প্রত্যক্ষ বিপরীত হলে, যুগ ও পরিবেশের কারণোদ্ভূত সমস্যার সমাধান ইজতেহাদের মাধ্যমে হওয়া উচিৎ, এ প্রত্যয়ে তিনি দৃঢ় ছিলেন। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী এভাবে তৌহিদের শিক্ষারই পুনরুজ্জীবন দান করেছিলেন। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদ ও ইসলামের পুনরুজ্জীবন-আতংকে ভীত ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ একেই অভিহিত করেছিলেন ওহাবী আন্দোলন বলে।

মুসলিম জাতীয় জীবনের এক ঘোর দুর্দিনে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব আরবে এ ইসলামী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। স্যার উইলিয়ম হান্টার তাঁর দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস গ্রন্থে এই চিত্রটা এঁকেছেন এইভাবে। ১৮১৭ সালে তিনি লিখেছেন ঃ

"প্রায় দেড়শো বছর আগে এক তরুণ আরবে হজ্ব করতে এসেছিলেন। তাঁর নাম "আবদুল ওহাব"। তিনি ছিলেন নজদের এক ক্ষুদ্র সরদারের পুত্র। সহযাত্রী হজ্বযাত্রীদের লাম্পট্য ও ভাঁড়ামি শহরটিকে কলুষিত করে ফেলেছে দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি দামিশকবাসী মুসলমানদের দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্র সম্পর্কে গভীর চিন্তা করেন এবং শেষে প্রকাশ্যে এসবের নিন্দা করতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রকাশ্যে তুর্কি আলেমদের এইভাবে নিন্দা করতে থাকেন যে, তাঁরা নিজেদের আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা

www.amarboi.org

আল্লাহর লিখিত বাণীকে অকেজো করে ফেলেছেন এবং অবর্ণনীয় পাপাচারের ফলেই তুর্কী জাতটা আজ কাফেরদের চেয়েও ঘৃণ্য হয়ে উঠেছে।"

বস্তুত অন্যায়, অবিচার ও সত্য-বিকৃতির বিরুদ্ধে আপাসহীন বিদ্রোহ এবং ইসলামকে তার স্বরূপ প্রতিষ্ঠার আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্মজীবনে যাত্রা শুরু করেছিলেন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আন্দোলনকে যদি আধুনিক ইসলামী আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় ধরা যায়, তাহলে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর আন্দোলন ছিল ইসলামি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। বস্তুত আরব ভূমির নজদ প্রদেশের উমাইনা অঞ্চলে তামিম গোত্রের বনু সিনাম বংশে ১৭০৩ সালে জন্মগ্রহণ করা শিশু মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ দশকে ৪শ বছর আগে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ফেলে যাওয়া ইসলামী আন্দোলনের পতাকা আবার সমুন্নত করে তুলে ধরেছিলেন। জেলে মৃত্যুবরণ করেছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর জীবনও সুখের ছিল না। মুজাহিদের বিপ্লবী কণ্ঠকে কেউ বরদাশত করতে চায়নি। শহর থেকে শহরে বিতাড়িত হয়ে ফিরেছেন তিনি। অবশেষে তিনি আশ্রয় পেলেন মরহুম শাহ ফয়সালের পূর্বপুরুষ আমির মুহাম্মদ ইবনে সউদের দরবারে। মুহাম্মদ ইবনে সউদ তখন মরুপল্লী দরিয়ার আমির। আমির সউদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে শুধু সাদরে গ্রহণই করলেন না, তার আন্দোলনেও শরীক হলেন। এইভাবে আবদুল ওহাব নজদীর যাযাবর আন্দোলন আরব ভূমিতে শিকড় গেড়ে বসার সুযোগ পেল। তারপর ছড়িয়ে পড়তে থাকল চারদিকে। এরই সমান্তরালে দিল্লীর শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, তার ছেলে শাহ আবদুল আজিজ এবং আমির সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ইসলামি আন্দোলনের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করলেন ভারতে। আশ্চর্যের বিষয় ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ইসলামী আন্দোলনের পুরোধা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর জন্মকাল একই বছর। উভয়ের জন্ম ১৭০৩ সালে (মতান্তরে আবদুল ওহাব নজদী এক বছরের ছোট)। আর উভয়ের কাজ ও আন্দোলনের পটভূমি ছিল একই রকমের। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী যখন তার আন্দোলনের বুনিয়াদ গাড়ছিলেন, ভারত উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয় জীবনে তখন এক ঘনায়মান দুর্যোগ। দরবেশ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর মাত্র চার বছর আগে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং বড় হয়ে তিনি যখন জ্ঞান চক্ষু উন্মিলন করলেন. দিল্লীর সিংহাসন তখনও টিকে ছিল, নামমাত্র এটা শাসনও ছিল, কিন্তু মোগল রাজদণ্ডের শক্তি ও শৌর্য তখন অস্তমিত। টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে মোগল সাম্রাজ্য। মুসলিম রাজশক্তির এই দুর্বলতার সুযোগেই উদীয়মান হিন্দু রাজশক্তি মারাঠা ও রাজপুতরা ঐক্যবদ্ধভাবে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলছে তখন দিল্লীকে। শুধু দিল্লী দখল নয়, ৮শ বছরের মুসলিম শাসনের সকল চিহ্ন মুছে ফেলতে তারা বদ্ধপরিকর। অন্তর্বিরোধে

www.amarboi.org

জর্জরিত ও গৃহ বিবাদে লিপ্ত উত্তর ভারতের মুসলিম শাসকরা এ ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে উদাসীন। মারাঠা, জাঠ ও রাজপুতদের সম্মিলিত বিশাল শক্তিকে মোকাবিলার শক্তি যেমন তাদের নেই, তেমনি মোকাবিলার কোন উদ্যোগও কোথাও ছিল না। দিল্লীর রহীমিয়া মাদ্রাসায় বসে নীরব দৃষ্টিতে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী। তিনি দেখতে পেলেন, দিল্লীর দ্বারপ্রান্তে আছড়ে পড়া মারাঠা-জাঠ-রাজপুতদের উত্তপ্ত তরঙ্গের অগ্রগতি যদি রোধ করা না যায়, তাহলে ভারতের ইতিহাস পাল্টে যাবে। ভারতব্যাপী আবার নেমে আসবে দাহিরী শাসন--নিশ্চিহ্ন হবে মুসলমানরা। প্রাণ কেঁদে উঠল শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর। হাতে সময় নেই, সিন্ধিয়া, হোলকার ও বিশ্বাস রাওয়ের নেতৃত্বে তিন লাখ সৈন্যর বিশাল বাহিনী ছুটে আসছে দিল্লীর দিকে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী জরুরি সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন কাবুলে আফগানরাজ আহম্মদ শাহ আবদালীর কাছে। লিখলেন তিনি, 'কোন রাজন্যের সাহায্য নয়, ভারতে মুসলমানদেরকে ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার ঈমানী তাকিদেই তার এগিয়ে আসা প্রয়োজন।' এই একই আবেদন জানালেন তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং রহিলাখণ্ডের তরুণ নায়ক নজীবুদ্দৌলার কাছে। আর কিছু নয়, ভারতের মুসলমানদের রক্ষার জন্য সব ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুরোধ জানালেন তিনি। উদ্যোগ বৃথা গেল না। ১২ হাজার ঘোড় সওয়ার নিয়ে পথে কোন প্রকার কালক্ষেপণ না করে ঝড়ের বেগে কাবুল থেকে ছুটে এলেন আহমদ শাহ আবদালী। সুজাউদ্দৌলাহ, নজীবুদ্দৌলাহ এবং দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমও তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। যুদ্ধ হল পানিপথে। এই ঐতিহাসিক তৃতীয় পানি পথ যুদ্ধে হিন্দু ক্ষাত্রশক্তির আকাশস্পর্শী অহংকার আহমদ শাহ আবদালীর নেতৃত্বাধীন অনেক ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর হাতে পানিপথের মাটিতে মাটি হয়ে গেল। আসন্ন ধ্বংসের প্রলয়ংকরী সয়লাব থেকে রক্ষা পেল ভারতের মুসলমানরা। যুদ্ধ শেষে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী ফিরে এলেন তার মাদ্রাসায়। তিনি বুঝলেন, মুসলমানরা আপাতত রক্ষা পেল। কিন্তু এটা তাদের শেষ রক্ষা নয়। ভারতে বিধ্বস্ত মুসলিম রাজশক্তির পটভূমিকে সামনে রেখে মুসলমানদের জন্য ভবিষ্যতে বহু বিপদের ঘনঘটা তিনি দেখতে পেলেন। পলাশীতে সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর শক্তিশালী এক বিপদ সামনে এগিয়ে আসছে তাও তিনি বুঝলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এসব বিপদ থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে হলে তাদেরকে সকল প্রকার অধঃপতন ও পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করে ইসলামের অজেয় শক্তিতে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। একমাত্র ইসলামের শক্তিই মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে ও বিজয়ী রাখতে পারে। পবিত্র হেরেম শরীফে শুয়ে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, সে কথাও মনে পড়ল তার। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, বিধর্মীরা মুসলিম ভারতের নগরীসমূহ দখল করে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে। আজমীরের মত শহরেও ইসলামী

www.amarboi.org

বিধান জারি থাকতে পারেনি, বিধর্মী নিয়ম-কানুন সেখানে জারি হয়ে গেছে। মুসলমানরা তার নিকট জমায়েত হয়ে উপদেশ ও কর্মপন্থা প্রার্থনা করছে। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করছে, কি করে তারা আল্লাহ্‌র বেহেশতে যেতে পারে। তিনি তার উত্তরে বলছেন, ক্ষয়িষ্ণু, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করতে হবে। লোকেরা তার হুকুম মেনে তার অনুসরণ করতে লাগল।'

এই স্বপ্নের নির্দেশ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তিনি বুঝলেন, অধঃপতিত মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার ছাড়া তাদের মধ্যে ইসলামের অজেয় শক্তির সঞ্চার করা যাবে না। অতঃপর এ লক্ষ্যেই কাজ শুরু করলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী। একদিকে সার্বিক সংস্কারের লক্ষ্যে শক্তিশালী লেখনি ধারণ করলেন, অন্যদিকে শিক্ষকের আসন থেকে বিপ্লবী কর্মীবাহিনী গড়ার কাজে মনোযোগ দিলেন। ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে পরিকল্পনার ছক আকলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী। দুর্দিন যদি সত্যিই মুসলমানদের জীবনে আসে, তাহলে দুই প্রকারে তারা অসহ্য নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে পারে ঃ (১) বিদ্রোহ করা (২) পশুর মত ইতর জীবন যাপন করা। পশুর মত ইতর জীবন যাপন করে কোন মুসলমানই মুসলমান থাকতে পারে না। তাই বিরূপ পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা ও নীতি-নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই মুসলমানদের ঈমানের দাবি। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী তাঁর ছাত্রদের ইসলামের এ বিপ্লবী শিক্ষাতেই গড়ে তুলতে লাগলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর এ বিপ্লবী শিক্ষারই ফসল তাঁর মাদ্রাসার ছাত্র ঊনবিংশতকের ইসলামী আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক বালাকোটের শহীদ সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভী এবং শাহ ইসমাইল শহীদ। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর এ মাদ্রাসা থেকেই ব্রিটিশ ভারতকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করা হয়েছিল। শাহ ওয়ালীউল্লাহর ছাত্র ও পুত্র শাহ আবদুল আজীজের কণ্ঠেই এই বিপ্লবের বাণী ও বিদ্রোহের ঘোষণা সর্ব প্রথম ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। পরে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর পৌত্র এবং শাহ আবদুল আজীজের ভাইপো শাহ আবদুল হাই রহিমিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকের আসন থেকে এই বিপ্লবের বাণী ভারতীয় মুসলমানদের সামনে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন ঃ "কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত খ্রিস্টানদের সাম্রাজ্য এবং হিন্দুস্থানের অতি পাশাপাশি অবস্থিত দেশগুলো (অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রদেশসমূহ) সবই শত্রুর দেশ বা 'দারুল হরব'। কারণ সর্বত্রই পৌত্তলিকতা (কুফর ও শিরক) বলবৎ হয়ে গেছে এবং আমাদের শরীয়ত আইন আর প্রতিপালিত হয় না।"

পূর্বেই বলা হয়েছে, শত্রু অধিকৃত মুসলিম দেশ বা 'দারুল হরবে' বসবাসকারি মুসলমানদের সামনে দুটি পথ অবশিষ্ট থাকে ঃ এক বিদ্রোহ করা এবং ইসলামের রাজনৈতিক আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, দুই বিধর্মীর শাসন মেনে নিয়ে পশুর মত ইতর জীবনযাপনে রাজি হওয়া। দ্বিতীয় পথটি মুসলমানদের জন্য নয়। কারণ ইসলামের বিপরীত বা বৈরী শাসন সানন্দে ও বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া এবং মুসলমান

www.amarboi.org

থাকা–এ দুটি কাজ এক সংগে কিছুতেই চলে না। তাই সে সময় সেদিনের ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের স্বাধীনতা তথা ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লার অনুগত সব বান্দা তথা সচেতন মুসলমানদের জন্য মুসলিম জনতার ওপর নিপীড়নকারী সকল শক্তি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করা অপরিহার্য হয়ে দাড়িয়েছিল। এই জিহাদের ঝাণ্ডাই হাতে তুলে নিয়েছিলেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহর কর্মসূচীর তৈরি শাহ ইসমাইল শহীদের মত শাহ সাহেবের আত্মীয়স্বজন এবং অগণিত ছাত্রবৃন্দ।

১৭৮৬ সাল। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী রায় বেরেলীর এক সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। লোকসেবা, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ ও খেলাধুলায় মশগুল থাকা ছিল বালক সৈয়দ আহমদের সবচেয়ে প্রিয় হবি। এভাবেই কেটে গেল তার জীবনের সতেরটি বছর। এক সংবেদনশীল ও ব্যক্তিত্বশালী তরুণ হিসাবে গড়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু কেতাবী শিক্ষালাভ তাঁর কিছুই হলো না। তার বড় ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক দিল্লীর রহিমিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। বড় ভাই এর পথ ধরে ১৮০৪ সালের এক শুভ দিনে সৈয়দ আহমদ শহীদ দিল্লীর রহিমিয়া মাদ্রাসায় এসে হাজির হলেন। প্রথম দিনের প্রথম সম্ভাষণেই শায়খুল হিন্দ শাহ আবদুল আজিজ তরুণ সৈয়দ আহমদকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং সহজেই উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর নতুন শিষ্য পালিশহীন হিরার টুকরা।

দিল্লীর রহিমিয়া মাদ্রাসায় মাত্র দু'বছরের শিক্ষা সাধনার পর সৈয়দ আহমদ সত্যই এক হীরার টুকরা হয়ে বেরিয়ে এলেন। শাহ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, "সৈয়দ আহমদের কেতাবী শিক্ষার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাঁকে এতখানি পরম জ্ঞান দান করেছেন যে, কেতাবী শিক্ষা তাঁর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার"। আর স্বয়ং শায়খুল হিন্দ শাহ আবদুল আজিজ মত প্রকাশ করলেন, "আল্লাহ সৈয়দ আহমদকে 'বিলায়েত-ই অম্বিয়ার' মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।"

এবার সৈয়দ আহমদ শহীদ কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি ৫ বছর পর দিল্লী থেকে চলে গেলেন টংকে। টংকের নওয়াব আমির মুহাম্মদ খানের সৈন্যদলে ছয় বছর কৃতিত্বের সাথে কাজ করলেন। অতঃপর আবার তিনি ফিরে এলেন দিল্লীতে। ফিরে আসার পর এবার শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী ও শাহ আবদুল আজিজের শিক্ষা ও স্বপ্নকে কার্যে পরিণত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল। দিল্লীতে মোগল রাজশক্তির কাঠামো তখনও টিকে ছিল। কিন্তু তাতে কোন প্রাণরস ছিল না। পাঞ্জাব থেকে পশ্চিমে সমগ্র পশ্চিম ভারতে তখন নিষ্ঠুর শিখ রাজত্ব চলছে। চারদিকে হতাশা এসে গ্রাস করছে মুসলমানদের। পশ্চিম ভারতে মুসলমানদের ওপর শিখ নির্যাতনের অসংখ্য মর্মন্তুদ কাহিনী ছুটে আসতে লাগল দিল্লীতে। হত্যা-লুণ্ঠনে ভরে গেল সে দেশ। মসজিদগুলোতে তখন তালা পড়েছে। গরু জবাই বন্ধ হয়ে গেছে। একদিন এক জলাশয়ের পাশ দিয়ে পথ চলার সময় শাহ ইসমাইল শহীদ কান্নায় ভেঙ্গে

www.amarboi.org

পড়া এক মুসলিম মহিলার স্বগত কণ্ঠের এই আর্ত ফরিয়াদ শুনলেন, 'কোথাও কি আল্লাহর এমন বান্দা একজনও নেই যে আমাকে শিখের ঘর থেকে উদ্ধার করতে পারে?'

স্বগত কণ্ঠের এই ফরিয়াদ শুনে শাহ ইসমাইল শহীদও তাঁর চোখের পানি রোধ করতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, ঐ আর্তনাদ যেন ঐ মহিলার নয়, গোটা দেশেরই যেন এক মৌন আর্তনাদ এটা। দিল্লীতে তখন সকলেই এটা অনুভব করছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লার বিধান অনুযায়ী জিহাদ ঘোষণা বা মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আর কোন পথই থাকল না। অতএব, জেহাদের সেনাদল সংগঠনের কাজ শুরু হয়ে গেল। দিল্লীর মাওলানা ইউসুফ, মাওলানা আবদুল হাই, শাহ ইসমাইল শহীদ, শাহ মুহাম্মদ ইসহাক, শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব প্রমুখ দেশবরেণ্য আলেম সৈয়দ আহমদ শহীদের হাতে বায়াত হলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর পরিবারের লোকেরা নেতা হিসেবে সৈয়দ আহমদের হাতে বায়াত হয়েছেন শুনে দেশের চারদিক থেকে সৈয়দ আহমদ শহীদের দাওয়াত আসতে লাগল। শাহ আবদুল আজিজের নির্দেশে সৈয়দ আহমদ শহীদ ভারত ভ্রমণে বের হলেন।

এ ভ্রমণ তাঁর জেহাদী সেনাদল সংগঠনের ভ্রমণ ছিল। ১৮১৮ সাল থেকে ১৮২৬ সাল এই ৮ বছর তিনি গোটা ভারতময় ঘুরে বেড়ালেন। মানুষের প্রাণে তিনি আবেগের জোয়ার আনলেন। যেখানেই তিনি গেলেন, জনতার ঢল নামল সেখানে। মুসলিম জনতার তিনি যেন মুকুটহীন সম্রাট। তিনি যখন কোলকাতায় এলেন, কলকাতার মুসলমানদের অধিকাংশই তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন। বাংলাদেশের ২৪ পরগনা থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তরবংগ, সিলেট, চট্টগ্রাম, যশোর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা থেকে অসংখ্য লোক কলকাতা গিয়ে সৈয়দ আহমদের কাছে বায়াত হলেন। সারা বাংলাদেশ থেকে তিনি দাওয়াত পেলেন, কিন্তু এমন ব্যাপক সফরের সময় তাঁর ছিল না।

বস্তুত এইভাবে গোটা ভারতব্যাপী মাকড়সার জালের মত জেহাদী সংগঠন ছড়িয়ে পড়ল। স্যার উইলিয়াম হান্টারের মতে সারা ভারত ব্যাপী ওহাবী বিপ্লবের এই শাখা-প্রশাখার বিস্তৃত বিবরণ দান করতে গেলে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতে হবে। আর তাঁর ভাষায় "সারা ভারতটা সৈয়দ আহমদের খলিফাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় এবং ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের প্রতিকুলে একটা সরকারও বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। প্রচ্ছন্ন ও পাল্টা এই সরকারের খবর ৪০ বছর ধরে ব্রটিশ সরকার জানতেই পারেনি।"

দেশব্যাপী জেহাদী গঠন গড়ে তোলার পর জেহাদ পরিচালনা ক্ষেত্র হিসেবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলকে বেছে নিলেন সৈয়দ আহমদ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুজাহিদরা ঐ পার্বত্য ভূমিতে জমায়েত হতে থাকবে এবং ঐখান থেকেই শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা হবে।

www.amarboi.org

অবশেষে ১৮২৬ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রায় দু'হাজার মুজাহিদের একটি দল নিয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দিকে যাত্রা করলেন। শাহ ইসমাইল শহীদ, মাওলানা আবদুল হাই প্রমুখ বিপুল সংখ্যক আলেম তাঁর সাথী হলেন। এই বাহিনী রায়বেরেলী থেকে বের হয়ে টংক, আজমীর, হায়দরাবাদ, পেশোয়ার, কোয়েটা, প্রভৃতি স্থান ঘুরে সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করল।

সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী সীমান্ত প্রদেশের দিকে যাত্রার পরেই সুবে বাংলা তথা বাংলা ও বিহার অঞ্চলের খলিফারা অর্থ ও মুজাহিদ প্রেরণের জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন। পাটনায় মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা আহমদুল্লা প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল। মাওলানা এনায়েত আলী ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী মালদহ ও বগুড়া অঞ্চল বার বার সফর করলেন। মাওলানা বেলায়েত আলী কিছুদিন বাংলাদেশ সফর করার পর হায়দরাবাদ ও বোম্বাই অঞ্চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি আবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

বাংলা থেকে ঠিক এ সময়েই ৮ হাজার মুজাহিদ জিহাদে যোগদান করতে যায়। এঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পদব্রজে কয়েক হাজার মাইলের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সীমান্তে [illegible]। মালদহ, পাবনা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোর, চবিবশ পরগণা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কেন্দ্র ছিল। এ সব কেন্দ্র থেকে অর্থ ও মুজাহিদ সংগ্রহ করে পাটনায় প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের পর সীমান্তে পাঠানো হতো। ভারত বিশেষ করে বাংলা ও বিহার থেকে প্রায় ১২ হাজার মুজাহিদ উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পৌছার পর সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার আগে সৈয়দ আহমদকে স্থানীয় কিছু গোত্র সরদারের ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হলো। সীমান্তের পাঠান জনসাধারণ সৈয়দ আহমদকে অত্যন্ত উৎসাহ আবেশ ও আনন্দের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে। সৈয়দ আহমদ তাদের কাছে ছিলেন সৈয়দ বাদশাহ। তাঁর আদেশ নিষেধের অন্যথা তাদের কাছে অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। প্রভাবশালী কবিলা সরদার সৈয়দ আহমদের আনুগত্যে গর্ববোধ করতেন। এ অবস্থায় বিশাল সীমান্ত এলাকা নিয়ে সৈয়দ আহমদ একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলেন। তিনি গ্রহণ করলেন আমিরুল মুমেনিন উপাধি। সর্বত্র শরিয়তের বিধান চালু করলেন, কিন্তু এ শান্তির পরিবেশ বেশিদিন চলতে পারলো না। পেশোয়ারের সুলতান ইয়ার মুহাম্মদ খান ও শিখদের কূটনীতি, কিছু কিছু গোত্র প্রধানের অস্থিরতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতার ফলে অভ্যন্তরীণভাবেই অনেক প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে হলো সৈয়দ আহমদকে। দু'বার তাঁকে মূল ঘাঁটির পরিবর্তন করতে হলো। একবার হুন্দ থেকে পঞ্জতরে দ্বিতীয়বার তাকে সরতে হলো পঞ্জতর থেকে।

www.amarboi.org

১৮২৮ সাল থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে শিখদের সাথে ছোট বড় অনেকগুলো সংঘর্ষ ও যুদ্ধ সংঘটিত হল। অধিকাংশ যুদ্ধেই শিখরা মারাত্মকভাবে পর্যদুস্ত হয়। কিন্তু পেশোয়ারের সুলতান ইয়ার মুহাম্মদ খান ও হুন্দের খাদিখানের বিশ্বাসঘাতকতা ও উপজাতি সৈনিকদের অস্থিরতা বেশ কিছু বিজয়কে পরাজয়ে পরিণত করে। সৈয়দ আহমদ হুন্দের খাদিখান ও পেশোয়ারের ইয়ার মুহাম্মদ খান উভয়কেই শায়েস্তা করেছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের পথ তিনি রোধ করতে পারেননি। ১৮৩০ সালে পরাজিত যে মুহাম্মদ খানকে তিনি দয়া করে পেশোয়ারের শাসন ভার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই মুহাম্মদ খানই পরে পেশোয়ারে বেশ কিছু বিশিষ্ট নেতাসহ বিপুল সংখ্যক মুজাহিদকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৮৩১ সালের শুরুর দিক কাগান ও কাশ্মীরের কয়েকজন সরদারের কাছ থেকে ডাক আসে শিখদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তাদের সাহায্য করার জন্য। কাশ্মীরের মুজাফফরাবাদ যাবার সোজা পথ ছিল আম্বের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শিখ ও ইংরেজদের কূটনীতিতে আম্বের সরদার পায়েন্দা খান তখন বিক্রি হয়ে গেছেন। তাই সৈয়দ আহমদ আম্বের মধ্য দিয়ে যাবার অনুমতি পেলেন না, ফলে এক দুর্গম পথ ধরে যাত্রা করতে হলো তাকে কাশ্মীরের দিকে।

সে সময়টা ছিল ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি। কঠোর শীতের মধ্য দিয়ে বহু হিমবাহ অতিক্রম করে আঁকা বাঁকা বন্ধুর গিরিপথ ঘরে সাচ্চুন হয়ে কাগান উপত্যকার প্রবেশ মুখ বালাকোটে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি বহু ভারবাহী পশু পথে মারা গড়ল। বহু আসবাবপত্র পথে নষ্ট হল। শ্রান্ত ক্লান্ত মুজাহিদরা এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে বালাকোটে এসে পৌঁছলেন। সুন্দর কাগান উপত্যকার প্রবেশ মুখ পর্বত ঘেরা ঊষর বালাকোটেই শিবির গাড়লেন সৈয়দ আহমদ শহীদ। তাদের গন্তব্য স্থান ছিল কিন্তু মুজাফফরাবাদ।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। অন্যভাবে বিভোর তিনি। তাঁর নিয়তিই যেন ছিল বালাকোটের ময়দানে শহিদী সম্মান লাভ। এ সময় জেনারেল শের সিংহ এক বিরাট শিখ বাহিনী নিয়ে খোরীর সরদার নজফ খানের প্রদর্শিত গুপ্ত পথে বালাকোটে এসে উপস্থিত হলেন ও মুজাহিদ বাহিনীকে ঘেরাও করে ফেললেন। নজফ খান অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সরদারেরই বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদের মৃত্যু চাননি কিংবা তার বাহিনীকেও ফাঁদে ফেলতে চাননি তিনি। অবস্থা সঙ্গীন দেখে তিনি সৈয়দ আহমদকে বাঁচাতে চাইলেন এবং অবস্থার গুরুত্ব মুজাহিদদের বুঝিয়ে দিয়ে একটি গুপ্ত পথেরও সন্ধান দিলেন মুজাহিদদের সরিয়ে নেবার। শেষ পর্যন্ত কাগান উপত্যকার দিকে পালিয়ে যাওয়ার একটি নিরাপদ পথও খোলা ছিল। মুজাহিদদেরই তখন এ মনোবৃত্তি জাগেনি। তাঁরা সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, ধর্মের জন্য হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসেছেন প্রয়োজন হলে জান কুরবানী দিতে। আর বালাকোটের শহিদী দরগাহে যখন সে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, তখন কোন মুজাহিদ সে সুযোগ অবহেলা করতে পারেন?

www.amarboi.org

১৮৩১ সাল, ৬ মে। শহিদী রক্তস্নাত ইতিহাসের এক অমর দিন। হিমেল হাওয়া প্লাবিত বালাকোটের উষর প্রান্তর। একদিকে দাঁড়ানো জেনারেল শের সিং-এর ২০ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য। আর অন্য পক্ষে পথ শ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতার প্রায় নয়শ' মুজাহিদ। শুরু হল যুদ্ধ। সেতো যুদ্ধ নয় যেন মৃত্যু অভিসারীদের বহ্নিবন্যায় মুক্তিস্নান। রক্তস্রোতে স্নান করে অমর শয্যায় শায়িত হলেন সঙ্গীসহ সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল।

ভারত উপমহাদেশের আযাদী সংগ্রামের এক মহান সৈনিক মাওলানা মুহাম্মদ আলী একদা বলেছিলেন, মুসলমানের জীবন কাহিনীর বিস্তৃতি মাত্র তিনটি অধ্যায়ে ঃ (১) হিজরত (২) জেহাদ ও (৩) শাহাদাত। সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদের জীবন এই তিনটি অধ্যায়েই ছিল মূর্ত প্রতীক।

বালাকোটের কাহিনীর শেষ ১৮৩১ সালের ৬ মে তারিখেই। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের শেষ হয়নি, উইলিয়াম হান্টার একথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সবই তো শেষ হলো, কিন্তু আমাদের হিন্দুস্থানী ধর্মান্ধদের বিতাড়িত করতে পারলুম না, কিংবা তাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে হিন্দুস্থানে স্বগৃহে ফেরত পাঠাতেও সফল হলুম না।" এই সফল না হওয়ার কারণও হান্টার সাহেব উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমরা একদিকে সীমান্তের বিদ্রোহী বসতিকে ক্ষাত্র শক্তির দ্বারা পেষণে নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু অন্যদিকে আমাদেরই ধর্মান্ধ প্রজারা অফুরন্তভাবে মানুষ ও টাকা পয়সা যোগান দিয়ে সেটাকে লালন করেছে। আমরা পোড়া ছাইকে একদম মৃত ভেবে ফেলে এসেছি। আর তারা নতুন করে তৈল দান করে করে পুনরায় সেটাকে প্রজ্বলিত করে তুলেছে।" হান্টার সাহেব অতি দুঃখের সাথে এ কথাগুলো লিখেছিলেন ১৮৭১ সালে। অর্থাৎ ১৮৩১ সালে বালাকোট বিপর্যয়ের পর ১৮৭১ সালে এসেও সৈয়দ আহমদ শহীদের ইসলামি আন্দোলন বিভিন্নভাবে সক্রিয় ছিল।

১৮৩১ সালের পর এবং ১৮৬৮ সালের মধ্যে ইংরেজ ও শিখদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের শুধু বিরাট আকারের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছে তিনটি। আর ছোট খাট সংঘর্ষ কত যে সংঘটিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ১৮৬০ সালের পরে ওহাবী ট্রায়ালগুলো এবং আন্দামানে নির্বাসিত মুজাহিদদের নথিপত্রগুলো যদি ঘেটে দেখা হয় তাহলে এর কিঞ্চিত নজির মিলবে।

বস্তুত ইসলামী আন্দোলনের অনির্বাণ শিখা নিভে যাবার নয়। এটা হয়ত পথ বদলায়, কর্মসূচি পরিবর্তন করে, স্থানান্তরিতও হয়তো হয়। কিন্তু লক্ষ্যপথের দুর্বার যাত্রা তার থেমে যায় না। ফিরাউনের জাহিলিয়াত নাশ করার জন্য মুসার আগমন দিনরাত্রির আবর্তনের মতই অবধারিত।

www.amarboi.org

ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার পুনরুজ্জীবন

আমার প্রবন্ধের যে শিরোনাম তাতে আলোচনার জন্য দু'শ থেকে সোয়া দু'শ বছরের একটা দীর্ঘ সময় হাতে এসেছে। বলা হয় ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জন ও ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের শুরু। তার আগে আটশ' বছরের একটা মধ্যযুগ ছিলো, তার আগে ছিলো প্রাচীন যুগ। আজকের আধুনিকতার কাছে মধ্যযুগ অন্ধকারের প্রতীক। এই অন্ধকারের আগের আরও অন্ধকার বলে কথিত যে প্রাচীন যুগ, তাতে আজকের আধুনিকতাবাদীরা কোন আলোর পরশ দেখে না। কিন্তু এই যুগেই আধুনিক এক সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, পত্তন হয়েছিল আধুনিক এক রাষ্ট্রের। যা ছিলো আদর্শিক পরিচয়ে ইসলামী রাষ্ট্র। নবুওতের ইতিহাস-ধারায় সর্বশেষ নবী ও রাসূল (স)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সবচেয়ে সফল ছিল এই রাষ্ট্র। সুবিচার, সুশাসন, মানুষের অধিকার ও নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতাসহ, সকল বিষয়ে এ ছিলো ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। কিন্তু কোথায় গেল সেই স্বর্ণযুগ? কেন নতুন করে আজ বলতে হচ্ছে, "আধুনিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা পেশ ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা? কেন ইতিহাসকাররা লিখেন, "The Islamic state which was originated as democratic, un-repressive and open state with its Head accountable to the community of Muslims .... was transformed into highly repressive, bureaucratic and despotic rule? [১] এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আমেরিকান এক ইসলাম বিষয়ক পণ্ডিত। তিনি বলেছেন, ইসলাম ক্ষমতায় ছিল খিলাফতে রাশেদা পর্যন্ত। তারপর এলো মুসলমানরা ক্ষমতায় এবং শুরু হলো পতনের। [২] পতনের এই কালে মুসলিম শাসকরা পরিবার, সমাজ ও বিচারব্যবস্থায় ইসলামকে টিকিয়ে রাখলেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, যুদ্ধ-শান্তি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পরিচালক হয়ে দাঁড়াল তাদের স্বেচ্ছাচারিতা। মুসলমানদের এই পতন শুধু মুসলমানদেরই অন্ধকারে নিমজ্জিত করলো না, ইউরোপীয় মধ্যযুগের যে অন্ধকার তার জন্যও মুসলমানদের এই পতনই দায়ী। ৭১৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর ফ্রান্স ও ইতালির দিকে অগ্রসরমান সেনাপতি মুসাকে যদি দক্ষিণ ফ্রান্সের পিরোনীজ পর্বতমালা থেকে ফিরিয়ে না আনা হতো এবং যদি ফিরিয়ে না আনা হতো সেনাপতি তারিককে স্পেন থেকে, তাহলে ইউরোপে আর আটশ' বছরের অন্ধকার যুগ সৃষ্টি হতো না। কর্ডোভা, মালাগা, গ্রানাডার মতো হাজারো মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরে যেতো সেদিনের ইউরোপ।

খিলাফতে রাশেদার পর ইসলামী আদর্শবাদ ও ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের উপর চেপে বসল প্রায় তেরশ' বছরের দীর্ঘ এক কাল রাত। দুর্ভাগ্য এতই মর্মান্তিক ছিল যে, এই কাল রাতে এমনকি নায়েবে নবী অধিকাংশ আলেমকেও

www.amarboi.org

'Had to suitably adjust their theories to suit the new .... condition. [৩] তবে সব আলেম পতনের এই স্রোতে গা ভাসাননি। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম, হাম্বল ইমাম ইবনে তাইমিয়া, শেখ আহমদ সরহিন্দ-এর মতো হাজারো আলেম স্বেচ্ছাচারি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে আপোষ করেননি। এঁদের এই মহান বিদ্রোহের বুনিয়াদের উপরই আধুনিক যুগের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা-আন্দোলনের সৌধ গড়ে উঠেছে।

কিন্তু এর পরও আধুনিক যুগের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তার যুগোপযোগী রূপে দেখার জন্যে অসহনীয় এক শূন্যতার মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে দীর্ঘদিন। এমনকি ১৯৩৭ সালে আধুনিক যুগের শেষার্দ্ধে এসেও ফ্রান্সের সমাজবিজ্ঞানী আহমদ রশীদ দুঃখ করে লিখেন, "এখন পর্যন্ত এমন কোন বই প্রকাশিত হয়নি যাতে আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। [৪] এই শূন্যতার মধ্যেও রশিদ আহমদ তার ফরাসী ভাষার বিখ্যাত গ্রন্থে ('L' Islam et le droit des gens')[৫] সাতজন চিন্তানায়কের কাজের উল্লেখ করেছেন, যারা ইসলামী আইনের রূপায়নে কাজ করছেন। এই সাতজনের ছয়জনই ফরাসী ভাষায়। আল্লামা মওদূদীর 'আল-জিহাদ ফিল ইসলাম'ই শুধু এই বলয়ের বাইরের। এই গ্রন্থে মওলানা মওদূদী অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিষয়ের পাশাপাশি যুদ্ধ, শান্তি ও চুক্তি সম্পর্কিত ইসলামী আইনের বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। এ কথাও এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী আইনের এই বিশেষ ক্ষেত্রের মতো ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রদান ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তার অবদান তখনই অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছিল। নীতির প্রশ্নে অটল থাকার পরও জটিল আইনী বিষয়ে মওলানা মওদূদী বিস্ময়করভাবে আধুনিক এবং সুবিস্তারিত ও সুবিন্যস্ত। এ রকম কথা বলেছেন উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথও। তার 'Islam in Modern History' গ্রন্থে লিখেছেন, ..." Perhaps the most significant constituent of Mawdudi's Position has been the gradual and continual. Mawdudi would appear to be much the most systematic thinker of modern Islam. One might even wonder whether his chief contribution......... has not been for good or ill his transforming of Islam into a system, or, Perhaps more accurately, his giving expression to a modern tendency so as to transform it." [৬] ইসলামী আইন ও আধুনিকতার উপর এমন অদ্ভুত অথরিটিই মওলানা মওদূদীকে ইসলাম রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়নে এবং তা বাস্তবায়নের পথ বিনির্মাণে সফল করেছে এবং এই দুই গুণের সমান সমাহার আর কারও মধ্যেই পাওয়া যায় না। আধুনিক ইতিহাসের পর্যালোচনাই তা প্রমাণ করবে।

ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু দুই মহান ব্যক্তিত্ব দিয়ে। তাঁদের একজন উপমহাদেশের শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, অন্যজন জাজিরাতুল আরবের মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব। মজার ব্যাপার হলো, এই দুই মনীষীর জন্ম সময় একই বছর, ১৭০৩ সালে।

www.amarboi.org

ইউরোপ আধুনিক যুগে প্রবেশের আগে ১৭৬২ সালে শাহ ওয়ালী দেহলভী ইন্তেকাল করেন, কিন্তু তাঁর আন্দোলন আধুনিক যুগকে প্রভাবিত করেছে ব্যাপকভাবে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী ইসলামী রাষ্ট্রের আধুনিক কোনো রূপরেখা দেননি, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র তিনি চেয়েছিলেন। তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের যুদ্ধ বিজয়ী বীর আহমদ শাহ আবদালি যখন কাবুলে ফেরত গেলেন, তখনই ভারতীয় মুসলিম রাজত্বের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ভারতের মুসলমানদের রক্ষার জন্যে নতুন করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই লক্ষ্যে তিনি তিন দফা কর্মসূচির কথা ভেবেছিলেন। তার প্রথম দফা হলো, লোক তৈরি করা, দ্বিতীয়তঃ তাদের নিয়ে একটা বাহিনী গড়ে তোলা এবং নাম্বার থ্রি, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি পানিপথের রণাঙ্গন থেকে দিল্লীতে তাঁর মাদ্রাসায় ফিরে গিয়েছিলেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, তার ছেলে শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী প্রমুখের চেষ্টায় সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদদের মত হাজারো মুজাহিদ তৈরি হয়েছিল। তাদের আন্দোলনের আওতায় এসেছিল সুদূর বাংলা থেকে আফগান সীমান্ত পর্যন্ত গোটা ভারত। একটা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমও হয়েছিল আফগান সীমান্তে। কিন্তু রাষ্ট্রটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবার সুযোগ পায়নি। বৃটিশ, শিখ এবং অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই আন্দোলনের গোটা পিরিয়ড শেষ হয়ে যায়। তারা লক্ষ্যে পৌছুতে পারেননি। কিন্তু আধুনিক যুগের শুরুর লগ্নে মুসলমানদের জগৎ-জোড়া হতাশার ঘন অন্ধকারে প্রথমবারের মতো ইসলামী রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রয়াসের মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

জাজিরাতুল আরবে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের সংস্কার আন্দোলন এই তুলনায় অনেকখানি সফল হয়েছিল। আরবের নজদ প্রদেশের তখনকার উদীয়মান শক্তি ইবনে সউদের শাসক পরিবার মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন এবং এই পরিবারের শাসন ক্ষমতার মাধ্যমেই এই সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই সংস্কার কর্মসূচি আরব উপদ্বীপে তৌহিদের অথরিটি পুনর্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামের শাসনতান্ত্রিক অথরিটি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এই দুই বড় সংঘবদ্ধ প্রয়াসের পর মুসলমানদের উত্থান, ইসলামের আইনী অথরিটির পুনর্জীবন এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার চিন্তা নিয়ে আধুনিক যুগের বর্তমান পর্যন্ত বিশাল সময় ধরে বহু ব্যক্তি-চিন্তা-নায়কের আবির্ভাব ঘটেছে। এঁরা সকলেই আধুনিক যুগের ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা আন্দোলনের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত।

এই ব্যক্তি চিন্তা নায়কদের মধ্যে প্রথমেই আসে জামালুদ্দিন আফগানির নাম। জন্ম তার ১৮৩৮ সালে এবং ১৮৯৭ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। মনে করা হয় আধুনিক যুগের 'প্যান ইসলামিজম'-এর প্রথম প্রবক্তা তিনি। W. C. Smith-এর মতে,

www.amarboi.org

জামালুদ্দিন আফগানি একই সাথে মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ সংস্কার এবং বাইরের হুমকি মোকাবিলার কথা চিন্তা করেছেন। তার 'প্যান ইসলামিজম' ছিলো প্রতিরক্ষার অস্ত্র। তবে জামালুদ্দিন আফগানি তখনকার সময় সামনে রেখে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন ও এর প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলনের চাইতে স্বভূমি ভিত্তিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার কথাই বেশি ভেবেছেন। তিনি বলেছেন, "A People without unity and a people without history is a people without glory, and a people will lack history if authorities do not rise among them to protect and revivify the memory of historical heroes so that they may follow and emulate. All this depend on a national (watan), education which begins with the homeland (watan), the environment of which is 'the homeland' ৭ সুতরাং 'প্যান ইসলামিজম'-এর কথা বললেও জামালুদ্দিন আফগানি ইসলামের আইনী দিকের পুনরুজ্জীবন ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নিয়ে সামনে এগুবার সুযোগ পাননি।

জামালুদ্দিন আফগানির পর মুসলিম বিশ্বের আরেকজন বড় ইসলামী চিন্তানায়ক হলেন মিশরের মুফতী মুহাম্মদ আবদুহ (১৮৪৯-১৯০৫)। পাশ্চাত্যের অশুভ প্রভাবের প্রতিরোধ এবং মুসলিম সমাজের সংস্কার ও উত্থানের পক্ষে তিনি কাজ করেছেন। মুফতি আবদুহর জীবনীকার মাহমুদুল হক লিখেছেন, "Muhammad Abduh's Contribution as an Islamic modernist is so significant that a close study of his system of thought seems viable for a understanding of the development of modern Islamic reform movement.' ৮ কিন্তু এই সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুফতি আবদুহ'র দৃষ্টিভঙ্গি ডিফেনসিভ। তিনি পাশ্চাত্যের পথ ও পদ্ধতির মোকাবিলায় চলমান ইসলামী আইন ও বিধানকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্যে এর পুনঃব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করতেন, যাতে পশ্চিমী প্রভাব মুসলিম সমাজে আসন গাড়তে না পারে। বস্তুতঃ পশ্চিমী আগ্রাসনের মুখে মুফতি আবদুহ-এর চিন্তা এতই আচ্ছন্ন ছিলো যে, আত্মরক্ষার বাইরে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন এবং তার প্রতিষ্ঠার মতো ইতিবাচক চিন্তা তিনি মাথাতেই আনতে পারেননি। তাছাড়া তিনি রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে জামালুদ্দিন আফগানির অনুসারী ছিলেন। তদুপরি জাগতিক অনেক ব্যাপারে তিনি পাশ্চাত্য চিন্তার প্রশংসা করতেন এবং মনে করতেন ব্যবহারিক অনেক ব্যাপারে সুন্নাহর অনুসরণ করাও অপরিহার্য নয়। সন্দেহ নেই, এ ধরনের চিন্তানায়করা অবস্থার চাপে আপোষবাদী হয়ে উঠতে পারেন।

এ সময়ের আরেকজন ইসলামী চিন্তানায়ক সিরিয়ার আব্দুর রহমান কাওয়াকিবি (১৮৫৪-১৯০২)। তিনি মুফতি আবদুহ'র মতই আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে ইসলামের পুনঃব্যাখ্যার পক্ষে ছিলেন। তিনি ইসলামকে আরবদের

www.amarboi.org

জাতীয় ধর্ম মনে করতেন এবং চাইতেন যে, মক্কার কোনো এক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের অধীনে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো একটি ইসলামী ইউনাইটেড স্টেটস গঠন করুক। তিনি বাহ্যিক এই কাঠামোগত আলোচনার বাইরে ইসলামী রূপরেখা প্রণয়ন কিংবা-এর বাস্তবায়ন নিয়ে ভাবেননি।

কাওকিবির সময়েরই আরেকজন বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন রশিদ রিজা। তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'খিলাফাত ওয়া আল-ইমামাহ আল-ওজমা' সম্পর্কে Rosenthal লিখেছেন, "(This work) Can be considered not only as the programme of the reformist party, but also as the authoritative to politics." ৯ এই গ্রন্থে রশিদ রিজা ইসলামী সভ্যতার বিস্তারে বংশীয় খিলাফতগুলোর অবদান স্বীকার করেও তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং খিলাফতে রাশেদার সাথে একাত্ম হয়ে পূর্ণভাবে ইসলামে ফিরে আসার পক্ষে। তাঁর মতে ইসলামী রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, সাম্য, সুবিচার এবং সকল মানুষের সকল বৈধ আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবী পূরণ ও তাদের স্বার্থেই বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজন। কিন্তু রশিদ রিজার মধ্যে যতটা আবেগের প্রকাশ ঘটেছে, ততটা বাস্তব চিন্তার সমাহার তাঁর মধ্যে ছিল না। একজন আলোচক এ সম্পর্কে বলেছেন, "He shows complete ignorance of modern state-taxation and finances an requirements of even a welfare state" ১০ রশিদ রিজার মধ্যে স্ববিরোধীতারও প্রকাশ দেখা গেছে। তিনি মনে করতেন তুরস্কের পার্লামেন্ট গ্রান্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্যে ইজতিহাদের দায়িত্বও পালন করতে পারে।

আধুনিক যুগের আরেকজন বড় ইসলামী চিন্তানায়ক আলী আবদ আল-রাজিক। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কিত তার গ্রন্থের নাম 'Al-Islam wad usual al hukm' ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কিত তাঁর চিন্তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তার মতে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বার্থে ধর্ম থেকে রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা হতে হবে। ইসলামের প্রতি আল-রাজিকের আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, জনাব রাজিক পশ্চিমী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত হয়েছেন। ইসলামী আইনের আধুনিক ব্যাখ্যায়নের কথা জামালুদ্দিন আফগানি, মুফতি আবদুহ, রশিদ রিজা, কাওকিবিসহ সকল চিন্তাবিদই বলেছেন, কিন্তু ইসলামকে দ্বিধাবিভক্তির কথা ইতোপূর্বে আর কোনো বুদ্ধিজীবী এইভাবে বলেননি। এই জন্যে পশ্চিমের Rosenthal মহাখুশী হয়ে বলেছেন, 'Ali Abd al Raziq comes much nearer to the truth as seen historically." অবশ্য এর দাতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন সেই সময়েরই ইসলামী চিন্তা নায়ক ইমাম মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী। তিনি লিখেছেন ঃ 'This separation is the result of the western imperialist influence, out to destroy Islam by isolating it

www.amarboi.org

from legislation." বিষয়টাকে আরও পরিষ্কার করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, " .... he (Prophet) began as a preacher, an announcer and an warner, but ended as a judge and ruler (hakim).......... his messengership turned from 'd awah' to 'dawlah' (state)"

ইমাম গাজ্জালী ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করাকে বিদয়াত বলেছেন। ক্ষমতা ছাড়া ধর্মকে তিনি অকার্যকর মনে করেন। তাঁর মতে ইসলামী রাষ্ট্রই মাত্র সব জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারে। কিন্তু তিনি আগের অনেক চিন্তানায়কের মতই তাত্ত্বিক উপস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবে কোনো পথ তিনি তৈরি করেননি। তাছাড়া আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় রূপরেখাও তিনি সামনে নিয়ে আসেননি। ১৯২৭ সালে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা নিয়ে আসেন সাঈদ হালিম পাশা। পাশার মতে এমন একটি পার্লামেন্ট হবে যেখানে কমুনিষ্টরা থাকবে না, সমাজতন্ত্রীরা থাকবে না, প্রজাতন্ত্রীরা থাকবে না এবং রাজতন্ত্রীরাও থাকবে না। শুধু থাকবে সদিচ্ছাসম্পন্ন একই আদর্শ ও লক্ষ্যের মানুষ, যারা তাদের সাধ্য অনুসারে শরিয়তের বিধান চালু করবে। ১২ হালিম পাশার চিন্তাকে আলোচকরা সমাজ বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন আকাশকুসুম এক চিন্তা বলে অভিহিত করেছেন।

ব্যক্তি পর্যায়ের এসব চিন্তা-ভাবনা ও প্রয়াসের পর শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবদের মতো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ প্রয়াসের আবার উত্থান ঘটে ১৯২৮ সালে হাসানুল বান্নার নেতৃত্বাধীন ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও ১৯৪১ সালে মাওলানা মওদূদীর নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামী গঠনের মধ্য দিয়ে। ইখওয়ানের ১৪ বছর পর জামায়াতে ইসলামী গঠিত হলেও মওলানা মওদূদীর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী আন্দোলনের উপর রচনাবলি আগের দেড় দশক ধরেই প্রকাশিত হয়ে আসছিল। মওলানা মওদূদীর লিখিত ইসলামের আইনী ও আন্তর্জাতিক উপস্থাপনাই প্রথম বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত রশিদ আহমদ-এর ফরাসি গ্রন্থের উল্লেখিত তালিকায়-এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াতে ইসলামী দুটি সংগঠনই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। দুই সংগঠনের সাহিত্য থেকে তাদের আন্দোলনের দর্শনকে এইভাবে চিহ্নিত করা যায় ঃ

ক. ইসলাম সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং ইসলামই রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজের চালিকাশক্তি।

খ. মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও দেউলিয়াপনা সৃষ্টি হয়েছে মূলতঃ ইসলাম থেকে সরে আসার কারণেই।

www.amarboi.org

গ. কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে আইন ও সমাজ সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের অপরিহার্য দায়িত্ব।

ঘ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি রোদ-বৃষ্টির মতই আল্লাহর নেয়ামত। তবে আধুনিক পন্থা ও পদ্ধতিকে অবশ্যই ইসলামের মূল দর্শনের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

চিন্তাগত এই মূল বুনিয়াদের নিরিখেই ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াত ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। কিন্তু ইখওয়ানুল মুসলিমুন আন্দোলন হিসাবে যত দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে, সাংগঠনিক নিয়ম-শৃংখলা তাদের ততখানি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে পারেনি এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে চিন্তা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগত কাজও তাদের সেই তুলনায় বাস্তব ও পদ্ধতিগত রূপ পায়নি। এর কারণও আছে। ইখওয়ান গঠিত হবার পর থেকেই একে বৃটিশ বিরোধী ও ইহুদী বিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে হয় এবং সরকারের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। ১৯৪৯ সালে ইখওয়ানের নেতা হাসানুল বান্না নিহত হন শুধু তাই নয়, পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই ইখওয়ান বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। সাইয়েদ কুতুবসহ শীর্ষস্থানীয় অর্ধ ডজন নেতা ফাঁসিতে শহীদ হন। হাজার হাজার কর্মী কারান্তরালে চলে যায়। ইখওয়ানের সেই বিপর্যয়ের আজও শেষ হয়নি।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী বার বার রাজনৈতিক সংকটে পড়েছে, কিন্তু ইখওয়ানের মত মহাসংকটের সম্মুখীন হতে হয়নি। তদুপরি জামায়াতে ইসলামীর বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ ছিল ইখওয়ানের চেয়ে অনেক বেশি মজবুত। মওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামী গঠন করেছেন ১৯৪১ সালে, কিন্তু এর পেছনে ছিলো তাঁর দেড় দশকের সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী চিন্তাগত বুনিয়াদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসলাম বিষয়ক শীর্ষ বিশেষজ্ঞ John L. Esposito তার 'Islamic Revivalism" নিবন্ধে বলেছেন, "From the 1930's Onward, this (Maulana Maududi) Journalist and editor committed himself to an Islamic alternative to nationalism, advocating an Islamic revival based on the renewal of Islamic society through a gradual social revolution. For Mawdudi, the Islamisation of society. was a Prerequisite to the reestablishment of a true Islamic state......... In his Journal, Exegesis of the Koran (Targumanul Quran), and in a host of Volumes, such as the Process of Islamic Revolution, First Principles of Islamic state, Islamic Law and Constitution and Economic Problem of man and its Islamic solution, Mawdudi asserted a self-sufficient and comprehensive bluprint of Islam for Political, legal, economic and social life." 13

www.amarboi.org

ইসলামী সাহিত্যের এই বুনিয়াদই মওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে সর্বাগ্রগণ্য করে তুলেছে। এই সাহিত্য ইখওয়ানের আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছে। John L. Esposito ইখওয়ানের শীর্ষ বুদ্ধিজীবী শহীদ সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, "Influenced by Hasan al-Banna and the writings of Pakistan's Mawlana Mawdudi, Qutub's Prolific writings exemplified the tendency of the times to move from a relatively Pacific view of Islam as a comprehensive alternative to western systems of governemnt. "১৪

বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপরেখা পেশ এবং তার বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগামী ভূমিকায় রয়েছেন মাওলানা মওদূদী। তাঁর 'Islamic law and Constitution' শীর্ষক একক একটি গ্রন্থই আধুনিক একটি রাষ্ট্রের ইসলামাইজেশনের ভিত্তি হিসেবে যথেষ্ট। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ধরন, তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব ও খিলাফতের ধারণা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইনের উৎস, সপ্তম অধ্যায়ে রাষ্ট্র, সরকার ও নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্তব্য, অষ্টম অধ্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের ভিত্তিসমূহ, দশম অধ্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ও ইজতিহাদ, দ্বাদশ অধ্যায়ে মানবাধিকার, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অমুসলিমদের অধিকার, চতুর্দশ অধ্যায়ে সামাজিক সুবিচার, পঞ্চদশ অধ্যয়ে রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ও নেতৃত্ব নির্বাচন এবং প্রতিরক্ষা, যুদ্ধ-সন্ধি, পররাষ্ট্রনীতি, নাগরিকত্ব বিষয়ক নীতি-নিরূপণ, ইত্যাদি বিষয়ে বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ সংস্থানের উৎস বিষয়ের উপর কোনো অধ্যায় নেই। তবে মাওলানার সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান শীর্ষক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আদর্শ ও কর্মসূচি শুধু তাত্ত্বিক উপস্থাপনা নয়, আদর্শ ও কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৪১ সালে মাওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। তার ইসলামী সাহিত্য এবং তাঁর সুপরিচালিত ও সুশৃংঙ্খল আন্দোলন গোটা দুনিয়ায়, বিশেষ করে এই উপমহাদেশের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছে। তাঁর এই আন্দোলনের প্রভাবেই এক সময় যে আলেমরা রাজনীতিকে হারাম জ্ঞান করতেন, তারাও এখন পুরো দস্তু রাজনীতিক। ইসলাম যে মুকাম্মাল নিজামে হায়াত, আল-কুরআনের একথা এঁরা মাওলানা মওদূদীর কাছ থেকেই শিখছেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে যে 'অবজেকটিভ রেজুলেশন'

www.amarboi.org

পাস হয়, তার পেছনে মাওলানার সাহিত্য ও জামায়াতের বিরাট ভূমিকা ছিলো। পরবর্তীতে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইসলামী শাসনতন্ত্রের ধারণাকে 'জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু জিরো' বলে বিদ্রূপ করলে ১৯৫২ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত আলেমদের সর্বদলীয় সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের সর্বসম্মত যে ২২ দফা নীতিমালা প্রণীত হয়, তার পেছনেও মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর অবদান প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করে পার্লামেন্টে যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়, তা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলনের একটা সীমিত বিজয়। ১৯৬৯ সালে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে ওআইসি (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স)-এর প্রতিষ্ঠা এবং ওআইসি'র প্লাটফরমে ১৯৮১ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের সম্মেলনে তাদের সকলের স্বাক্ষর সম্বলিত মক্কা ঘোষণা উম্মাহ-ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র-চিন্তার এক বিরাট বিজয়। মক্কা ঘোষণায় 'বিশ্বাসের ঘোষণা" অধ্যায়ের একটি অংশে বলা হয়--

"এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসাবে ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অনড় ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য এবং অনুসরণই বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। ইসলামের পথই একমাত্র পথ যে পথ শক্তি, সম্মান, সমৃদ্ধি ও সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমাদের পরিচালিত করবে। ইসলামই শুধু মুসলিম উম্মাহকে বস্তুবাদের যন্ত্রণাদায়ক সয়লাব থেকে বাঁচিয়ে মুসলিম উম্মার স্বকীয়তাকে সমুন্নত এবং এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। এবং ইসলামই মুসলিম জনতা ও তাদের নেতৃবৃন্দের জন্য এক অতুল শক্তির সঞ্জীবনী সুধা। শুধু-এর দ্বারাই তারা পারে তাদের পবিত্র স্থানগুলো মুক্ত করাসহ এই বিশ্বে তাদের হারানো আসন পুনরুদ্ধার করতে এবং অন্যান্য জাতির পাশে যোগ্য আসনে দাঁড়িয়ে বিশ্ব মানবজীবনে সাম্য, শক্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে।"

মক্কা ঘোষণায় "মুসলমানরা এক জাতি' শীর্ষক অধ্যায়ের এক অংশে বলা হয়--

"ভাষা, বর্ণ, দেশ এবং এ ধরনের সব পার্থক্য সত্ত্বেও বিশ্বের সব মুসলমান একটি এক ও অখণ্ড জাতির অন্তর্ভুক্ত। একই বিশ্বাসের বন্ধনে তারা আবদ্ধ। একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তারা সঞ্জীবিত হয়ে একই দিকে তারা ধাবিত হচ্ছে এবং একটিমাত্র লক্ষ্যই তাদের সামনে। ...... সুতরাং আমাদের সংহতি জোরদার করা, বিভেদ-বিরোধের অবসান ঘটানো এবং ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং আমাদের জন্য চিরন্তন সুবিচারের মাপকাঠি আল্লাহর আইন ও রাসূল (স)-এর সুন্নাহের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল নীতি ও বিধানের মাধ্যমে আমাদের মধ্যকার যাবতীয় বিরোধ মিটিয়ে ফেলার লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

www.amarboi.org

সবশেষে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি সম্মিলিত প্রার্থনা ও আল-কুরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতির মধ্যে বলা হয়--

"আমরা করুণাময় রাব্বুল আলামিন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি আমাদেরকে সিরাতুল মোস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, আমাদের চেষ্টাকে সাফল্যের স্বর্ণ মুকুটে শোভিত করুন এবং আমাদেরকে সালেহ্ বান্দার জীবন যাপনে তৌফিক দান করুন। (আল কোরআনে আপনার প্রতিশ্রুতি) "তোমরা যারা বিশ্বাসী এবং আমলে সালেহ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছ, তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা, তিনি অবশ্যই তাদের সফলতা দান করবেন এই পৃথিবীতে, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের সফলতা দান করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে, যে ধর্মকে তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তিনি এর বিনিময়ে তাদেরকে তাদের ভয় দূর করে নিরাপত্তা দান করবেন। আর যারা আমার উপাসনা করে, তারা কোনো কিছুকেই আমার শরিক করে না। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করবে, তারা প্রকৃতপক্ষেই দুস্কৃতকারী।"

মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বাক্ষরিত ওআইসি'র এই মক্কা ঘোষণা ইসলামের ইতিহাসের এক অমূল্য দলিলই শুধু নয়, এর মধ্য দিয়ে গত দু'শ বছরের, আরো বেশি বলতে গেলে গত হাজার বছরের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, সবকিছুই সবাক হয়ে উঠেছে। আমরা এই ঘোষণার মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, জামালুদ্দিন আফগানি, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব, ইমাম গাজ্জালী, মোজাদ্দেদ আলফেসানী, শেখ হাসানুল বান্না, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী প্রমুখ সকলেরই সরব কণ্ঠ শুনতে পাই। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা আন্দোলনের অবিস্মরণীয় সাফল্যের এক বেনজীর মাইলস্টোন এটা।

ইসলামের এই শক্তিমান প্রকাশের পর শয়তানি শক্তিও শক্তভাবে মাঠে নেমেছে। নব্বই দশকের শুরুতে সোভিয়েত ব্লকের পতনের পর এক মাত্রিক পৃথিবীর একক নেতা হওয়ার সুযোগ নিয়ে এই শক্তি ইসলামের রাষ্ট্রীয় উত্থানের পথ রোধ করার জন্য বলা যায় আজ সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এক সময় কম্যুনিষ্টরা লাশ তৈরি করে সেই লাশ নিয়ে মিছিল করে লাশের দায় প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চাপাত। কম্যুনিষ্টদের এই কৌশল পুঁজিবাদীরা ভালোভাবেই রপ্ত করেছে। সন্ত্রাসী তৈরি করে, সন্ত্রাস উস্কে দিয়ে তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। 'টুইন টাওয়ার' নামক লাশ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে ইসলামের উত্থান রোধ করার মোক্ষম এক পথ তারা রচনা করেছে। এ পথেই তারা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে দমন করতে চায়। ইসলামের রাষ্ট্রিক উত্থানবাদীদেরকে আজ মধ্যযুগীয় অসহনশীল, এমনকি সাম্প্রতিক কালে সভ্যতা বিরোধী এবং মানুষের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এবং

www.amarboi.org

এইভাবে ইসলামের উত্থানবাদীদেরকে মানবতার দুশমন হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের নিঃশেষ করে ফেলাকে ওরা বৈধ করতে চায়। John L. Esposito এই ধরনের মার্কিনী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ করে বলেছেন--

তিনি লিখেছেন "It is not .... modern technology and science that is being rejected (by the Islamists), but rather a competing ideology of western ideas and values. Islamic revolutionaries, like most other Muslims, do not shun modern transportation, housing, electricity, communications, or oil technology. The problem is not radio and television, but its programming. The gap is ideological, not technological or economic. ১৪"

এই সত্য কথাগুলো বলার পর তিনি মার্কিন নীতি নির্ধারকদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "American policy in the Muslim world, in short, be carried on in a context in which ideological differences between the west and Islam are recognized and, to the greatest extent possible, accepted or at least tolerated. "১৫ জন এল এজপোজিটো'র এই পরামর্শ মার্কিন নীতি নির্ধারকরা গ্রহণ করলে ইসলামের রাষ্ট্রীয় উত্থানবাদীদের সাথে তাদের আর কোনো বিরোধ থাকে না এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, এমনকি সহযোগিতাতেও তাদের কোনো আপত্তি উঠতে পারে না।

আজকের প্রবন্ধে আমার সর্বশেষ কথা হলো, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা আজ চূড়ান্ত রূপ লাভ করছে পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের দ্রুত ইসলামাইজেশনের মাধ্যমে। মওলানা মওদূদীর ইসলামিক ল এন্ড কনস্টিটিউশন-এর ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখাকে যদি আমরা ভিত্তি ধরি, তাহলে বলব সেই ভিত্তি আজ মহিরুহে পরিণত হচ্ছে আজকের অনেক ইসলামী চিন্তানায়ক ও মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানীর অংশগ্রহণে। অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মুসলিম বিশ্বে আজ গণরূপ পরিগ্রহ করছে। আলজেরিয়া, তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, জর্দান ও কুয়েতের নির্বাচন তারই ইঙ্গিত দেয়। ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে তিনটি করণীয় বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

এক ঃ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মূলতঃই বুদ্ধিভিত্তিক। লড়াইটা তাই বুদ্ধিবৃত্তির। সুতরাং অন্যান্য দিকের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হতে হবে মুসলমানদের।

দুই ঃ ইসলামের কথা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌছাতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন বিশ্বমানের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাহায্য। তার সাথে চাই বিশ্বমানুষের জন্য বিশ্ব মানের ইসলামী সাহিত্য; এবং

তিন ঃ শত বৈরিতা, শত প্রতিকূলতা, শত উস্কানির মুখেও ইসলামী আন্দোলনকে গণতন্ত্র তথা জনমত জয়কারী দাওয়াতের পথকেই অনুসরণ করে চলতে হবে।

www.amarboi.org

তথ্যসূত্র ঃ

1. Asghar Ali Engineer "The Islamic State' Vicas Publishing House Pvt. Ltd. Ghasiabad. U. P. India, Page — 45
2. Professor John L. Esposoti দৈনিক সংগ্রামের সাথে একটা সাক্ষাতকার।
3. Asgar Ali Engineer, "The Islamic state', Page – 88
4. Mr. Mohammad Hamidullah, "The Muslim conduct of state' (1941), Page – 30
5. 'L' Islam et le droit des gens'. রশীদ আহমদ, হেগ, ১৩৩৭.
6. W. C Smiith, 'Islam in the Modern History' Page – 235.
7. Muhammad Al Makhzumi, 'The opinions of Jamal-al-din Afghani (Arabic), Beirut, 1941, P– 257 and sylvia Haim, 'Arab Nationalism : An Anthology, London, 1962, Page– 13
8. Mahmudul Haqe, "Muhammed Abduh'Institute if Islamic studies, Aligarh Muslim University, 1970, P– IX.
9. E. I. J. Rosenthal, 'Some Reflection on the Separation of Religion and Polities in modern Islam.' Islamic studies, Journal of The Central Institute of Islamic Reserch, Karachi, Vol– 111, September. 1964 No. 3 Page 25– 52.
10. Asghar Ali Engineer, "The Islamic state. Page– 107
11. Muhammad Al-Ghazali, 'Our Begining in wisdom (Min huna n'alam), 2nd Ed. Preface, Washington, 1953, (Eng. translation by Ismai'l R. Al Faruqi. (PP. 11)
12. Said Halim Pasha, "The Reform of Muslim society', Islamic Culture, Hyderabad Quarterly Review, 1927, P– 129
13. Johan L. Esposito, 'Islamic Revivalism', The Muslim world Today, occasional Paper No. 3 American Institute for Islamic Affairs, Page – 7
14. Do. Page– 5

    Do. Page– 16

www.amarboi.org

সোনালী সূর্যের প্রত্যাশা

আটলান্টিকের পূর্ব উপকূল থেকে নিউগিনির পশ্চিম সীমান্ত এবং সোভিয়েত সাইবেরিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত থেকে মধ্য আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূ-ভাগকেই প্রধানতঃ আমরা মুসলিম বিশ্ব বলে অভিহিত করতে পারি। এই মুসলিম বিশ্ব প্রায় ষাটটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের অধীন অনেকগুলো পরাধীন মুসলিম এলাকা। অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বে-একক জাতি দেহ আজ বহু খণ্ডে বিভক্ত। বিভক্ত শুধু নয়, তারা অনেকে পারস্পরিক সংঘর্ষেও লিপ্ত। মুসলিম উম্মাহ এইভাবে দ্বন্দ্বমান জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়া ছাড়াও অভ্যন্তরীণভাবে বহু মত ও তরিকায় খণ্ড-বিখণ্ড। বিখণ্ডিত মুসলিম 'বিশ্ব, বিভক্ত উম্মাহ আপনাকে নিয়ে আপনি আজ এতটাই সংকট কবলিত যে, বিশ্বের প্রতি, মানবতার প্রতি কোন দায়িত্বই পালন করতে পারছে না। পারছে না শুধু নয়, তারা আজ করুণার শিকার। একদিনের তাদের সেই দাতার হাত আজ নির্লজ্জ গ্রহীতার হাতে পরিণত। মুসলিম উম্মার অনৈক্য ও অধঃপতন আজ এতটাই ভয়াবহ যে, ঐক্যের প্রয়োজন অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় আজ যেমন সবচেয়ে বেশি, তেমনি তা আজ এক দুর্লভ বস্তুও।

মুসলিম অনৈক্য ও অধঃপতনের বিপজ্জনক শুরু খোলাফায়ে রাশেদিনের পর থেকেই। কিন্তু তখনকার সে অনৈক্য ছিল নিছকই একটা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জাতি-রাষ্ট্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার মত জাহেলিয়াত তখন মুসলিম উম্মাহর দেহে প্রবেশ করেনি। এই রোগের অনুপ্রবেশ ঘটে মুসলিম বিশ্বে বিজাতীয় উপনিবেশিক শাসন চেপে থাকার সময়। আর এর উৎকট প্রকাশ ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বির্পযের সুযোগে যখন ঔপনিবেশিকদের প্ররোচনায় মুসলিম উম্মাহ ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফল হয় ভয়াবহ। ওসমানিয়া খিলাফত টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং জাতীয়তাবাদের জাহেলিয়াত পূর্ণরূপে মাথা তুলে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে। ঔপনিবেশিক কবল থেকে মুসলিম দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক বিভক্তি তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টি হয় ডজন ডজন জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম উম্মাহ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয় 'জাতীয়তাবাদ' নামের এক নতুন জাহেলিয়াতের ক্লেদাক্ত সয়লাবে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক সাইয়েদ আবুল মওদূদী (রঃ) বলেছেন ঃ

"পশ্চিমী জাতিসমূহের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পরাজয় তাদের চিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাছে আমাদের আত্মসমর্পণকে ব্যাপকতর করে দেয়। তাদের জীবন দর্শন তাদের তরবারীর চেয়ে ভয়াবহ প্রমাণিত হয়। তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য আমাদের দেহকেই মাত্র শৃংখলিত করেছিল, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি ও আদর্শ আমাদের মন-

www.amarboi.org

মানসকে বিকৃত করে দেয়। ফলে বিজাতীয় জাতিতত্ত্ব, যা আমাদের কাছে গত শতাব্দী পর্যন্ত অপরিচিত ছিল, মুসলমানদের গ্রাস করল। মুসলিম উম্মাহর গৌরবান্বিত সদস্য হওয়ার বদলে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি রাষ্ট্রের সদস্য হয়ে দাঁড়াল।"১

জাতীয়তাবাদ আরেকটা ভয়াবহ রোগ সাথে করে নিয়ে এল। সেটা হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যার অনুপ্রবেশ মুসলিম মানসকে দ্বন্দ্ব ও বৈপরিত্যে আচ্ছন্ন করে তার অধঃপতনকে দ্রুততর করে তুলল। পশ্চিমী চিন্তা ও আদর্শকে গ্রহণের ফলে প্রাচ্যের মুসলমানরা মনের দিক দিয়ে পশ্চিমী বনে গেল। পতনের এই প্রকৃতিকে তুরস্কের বিখ্যাত লেখক জিয়া গোকালপ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন--

"যখনই আমরা বলব আমরা তুর্কি জাতি, তখনই আমাদের ভাষা, নৈতিকতা, আইন, আদর্শ, দর্শন ও ব্যক্তিত্ব সবই তুর্কি সংস্কৃতি, রুচি ও স্বকীয়তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। আবার যখনই আমরা বলব, আমরা ইসলামী উম্মাহর সদস্য, তখনই আমাদের কাছে আল-কোরআন হবে আমাদের জীবনবিধান, মহানবী (স) হবেন আমাদের নেতা, কা'বা হবে পবিত্রতম কেন্দ্র এবং ইসলাম হবে আমাদের জীবন ব্যবস্থা। আর যখনই আমরা পশ্চিমী সভ্যতাকে আমাদের মনে করব, তখনই দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুর দিক দিয়ে আমরা ইউরোপীয়ান বনে যাব।"২

পশ্চিমী দর্শন ও কালচারের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ আমাদেরকে মনের দিক দিয়ে ইউরোপীয়ই করেছিল। আশা ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হবার পর সুদিন ফিরে আসবে, ইসলামী সমাজ-সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে এবং তার ফলে মুসলিম উম্মাহর খন্ড-বিখণ্ডিত দেহ আবার জোড়া লাগার একটা পথ হবে। কিন্তু তা হলো না। ঔপনিবেশিকদের শিক্ষায় শিক্ষিত নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ইসলামের নামে জনগণ জাগরিত হলো, নেতারা জনমতকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিতে পরিণত করার জন্য ইসলামের কথা বললেন, কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর তারা সুর পাল্টালেন। তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মোস্তফা কামাল "Jihad armies of the Ummah of Muhammad' উপাধী লাভ করেছিলেন। ৩ এই মোস্তফা কামালই স্বাধীনতার পর তুরস্কের সমাজ-সংস্কৃতিকে ইসলাম থেকে মুক্ত করার জন্য সতের বার সামরিক শাসন জারি করেন। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে আমরা এই ভূমিকাতেই দেখি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তিনি বলেছিলেন, তিনি প্রথমে ভারতীয় নন, তিনি প্রথমে মুসলমান, তারপর ভারতীয়। এবং তিনি বলেছিলেন, 'মুসলমানদের আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্বাধীন লালনের জন্য তারা স্বাধীন আবাসভূমি চান।' কিন্তু সেই কায়েদে আজমই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন,

" .... I think we would keep that infront" as our ideal, and you will find that in the course of time Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense because that is the personal faith of .... individual, but in the political sense as citizens of the state." ৪

www.amarboi.org

অর্থাৎ মুসলমানরা স্বাধীন হওয়ার পর তাদের সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ইসলামের আদর্শ, সংস্কৃতি বিতাড়িত হলো। এর ফল হলো ভয়াবহ। মুসলিম দেশে ইসলাম পরবাসী হয়ে গেল, জাহেলিয়াত বিজয় লাভ করল ইসলামের উপর। বার্নার্ড লুইসের ভাষায় 'এবার ইসলামের সংঘাত বাঁধল অতিতের মতো লাত, উজ্জার সাথে নয়, বরং নতুন প্রতিমা জাতি রাষ্ট্র ও জাতীয়তার সাথে, আর এই সংঘাতে ইসলামের উপর প্রতিমাই বিজয় লাভ করল। ৫

মুসলিম উম্মাহর সার্বিক অধঃপতিত অবস্থা যেমন তার উত্থান ও ঐক্যের পথে একটা অন্তরায় হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি তা আজ কতকগুলো চ্যালেঞ্জেরও মুখোমুখি। প্রথম চ্যালেঞ্জ পশ্চিমী ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্র অত্যন্ত পুরানো। এক সময় এ ষড়যন্ত্র চালিত হয়েছিল মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য, তারপর অধঃপতন যুগে এই ষড়যন্ত্র মুসলিম উম্মাহকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে তার পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। তুর্কি খিলাফতকে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র কিভাবে যন্ত্রণা দিয়ে গেছে বছরের পর বছর, তার কাহিনী রচিত হলে তা হবে আমার মনে হয় জগতের সবচেয়ে বড় বিয়োগান্ত মহাকাব্য। তুর্কি খিলাফতের অধীন বুলগেরিয়ার কৃষক হত্যা নিয়ে পশ্চিমী শক্তি যে নির্লজ্জ আচরণের পরিচয় দিয়েছিল তা চিরকাল পশ্চিমী ষড়যন্ত্রের এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বৃটেনের গ্লাডস্টোনের মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তি এ সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী রচনা করে ইউরোপের ঘরে ঘরে প্রচার করে গোটা ইউরোপকে তুর্কি খিলাফত ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। অথচ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাই বলছেন বুলগেরীয় গণহত্যার জন্য একদিকে বুলগেরিয়ার খৃস্টান কৃষক, অন্যদিকে রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তির ষড়যন্ত্রই সম্পূর্ণ দায়ী ছিল। এই পশ্চিমী ষড়যন্ত্র আজ আরও বিস্তৃত ও জোরদার হয়েছে। ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা, নাইজেরিয়ার আহমেদ বেল্লু ও আবুবকর বালেবা-তাফওয়ার হত্যা, ন্যাশনালিজম ও সেকুলারিজমের উত্থান, মুসলিম দেশগুলোর অশান্ত পরিস্থিতি ও পারস্পরিক সংঘাত, প্রভৃতি তাদের ষড়যন্ত্রেরই ফল। মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামী উম্মার ঐক্যের পথে এই ষড়যন্ত্র আজ এক দুর্লংঘ বাধা।

মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের পথে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ বিজাতীয় শিক্ষাসংস্কৃতির অব্যাহত আগ্রাসন। পশ্চিমের অনাত্মীয় শিক্ষা দর্শন ও উপকরণ আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনকে আজও নিয়ন্ত্রিত করছে। তুর্কি খিলাফতের সময় তানজিমাত নেতৃত্বের আমলে আমাদের একক শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। দুটি ধারাকেই পশ্চিমী চিন্তা-দর্শন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, কিন্তু প্রধান ধারাটি হয়ে উঠে ঔপনিবেশিকদের নিজের মতো লোক তৈরির কারখানা। লর্ড ম্যাকলের ভাষায় এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল "to form a class who may be interpreters of between us and the millions whom we govern-a class of persons Indian in blood and colour but English in task, in opinion, in morals and in intelect" এইভাবে পশ্চিমী শিক্ষার এই ধারা জাতির জন্য প্রয়োজনীয় মানুষ তৈরি না করে বিভীষণ বানাচ্ছে। অন্যদিকে তথাকথিত ইসলামী শিক্ষার ধারা যাদের তৈরি করছে তারা যুগের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে অযোগ্য প্রমাণিত হচ্ছে। এরা দু'দলই মুসলিম উম্মাহর উত্থান ও ঐক্যের পথে বাধার সৃষ্টি করছে– এক পক্ষ ভ্রান্তিজনিত শত্রুতা

www.amarboi.org

বশতঃ, অন্য পক্ষ অযোগ্যতাজনিত কারণে। এ ধরনের মৌল চ্যালেঞ্জ পাশ কাটিয়ে মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামী উম্মাহর ঐক্য সম্ভব নয়।

মুসলিম উম্মাহর উত্থান ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের পথে তৃতীয় চ্যালেঞ্জ আমাদের অর্থনৈতিক ও কারিগরি পশ্চাৎপদতা। পশ্চিমীরা আমাদের অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য দেয়ার নামে আমাদের শোষণ শুধু নয়, শাসনও করছে। আমরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক পাও এগুতে পারি না। আমাদের অর্থনীতি, শাসনপদ্ধতি এবং সরকার পদ্ধতি কেমন হবে তা তারাই নির্দ্ধারণ করে। এমনকি মন্ত্রিসভার গঠন পর্যন্ত তাদের মর্জি মোতাবেক হয়। আমাদের রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক আন্দোলন উভয়কেই তারা নিয়ন্ত্রণ করে। এই অবস্থায় হাত-পা বাধা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইসলামের উত্থান ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের জন্য কিছুই করতে পারছে না। হাত-পা এইভাবে বাঁধা থাকার কারণেই মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ ইসলামের উত্থানকে মৌলবাদ নামে অভিহিত করে তার বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছেন। আর এই কারণেই আল্লাহর ঘর কা'বার ছায়ায় বসে স্বাক্ষর করা তাদের ঐতিহাসিক মক্কা ঘোষণা তারা বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। পশ্চিমের উপর নির্ভরতা থেকে সৃষ্ট এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা না গেলে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য বিধানের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের পথে চতুর্থ চ্যালেঞ্জ হলো পশ্চিমী দুনিয়ার অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ এবং তাদের প্রপাগান্ডা। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমী দুনিয়া এতই নিপুণ যে, বহুক্ষেত্রে তাদের ষড়যন্ত্র চিহ্নিত করা যায় না। পড়েছিলাম, ইন্দোনেশিয়ায় তারা কম্যুনিস্ট পার্টি ঠেকাবার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি গড়েছিল যাদের বিপ্লবী শ্লোগান আসল কম্যুনিস্ট পার্টিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে তারা ইসলামী আন্দোলনকে ঠেকাবার জন্য ইসলামের সাইনবোর্ডে দল গড়তে পারে, যারা অতি বিপ্লবী শ্লোগান এবং অতি বিপ্লবী সব কাজ করে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করতে পারে। একটু খুঁজলেই হয়তো আমরা মুসলিম বিশ্বে এর দৃষ্টান্তের দেখা পাব। পশ্চিমের বিচিত্র ধর্মী প্রচার কৌশলের মধ্যে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে কাজ হাসিল করা তাদের একটা মারাত্মক অস্ত্র। ডঃ সুকর্ণোর আমলে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া যুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিমের ছড়ানো ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করেই। সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি ছদ্ম পরিচয়ে ভুল তথ্য দিয়ে উভয়কেই বুঝিয়েছিল যে সে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে। ফলে উভয় দেশই একে অপরের বুকে বন্দুক তাক করে ধরেছিল। পরে একজন কেজিবি এজেন্ট বিস্ময়ের সাথে এ সম্পর্কে বলেছিল, "আমাদের তথ্য ও প্রচারণা এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে যা আমাদেরকেই হতবাক করে দেয়।" পশ্চিমের প্রচার শক্তি আগের চেয়ে আজ আরও বেড়েছে। তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করবার ক্ষমতা রাখে। পশ্চিমের এই শক্তি ইসলামের উত্থান ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের পথে আজ এক বিপজ্জনক বাধা।

মুসলিম বিশ্বের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি খিলাফতের মতো ব্যবস্থার অধীনে গোটা মুসলিম বিশ্বে একক এক রাষ্ট্র। অথবা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর একটা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন। এমন একটা ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমেই মুসলমানরা আজ দুনিয়াকে কিছু দান করতে পারে। আর আজকের দুনিয়া এর প্রত্যাশিও। আমরা যদি চোখ মেলে চাই

www.amarboi.org

তাহলে দেখব দুনিয়ার মানব সভ্যতা আজ এক পরিবর্তনের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে। পি, এ, সরোকিন বলছেন, "We are living and acting at one of the epoch-making turning points of human culture and society-sensate is declining and different form is emerging." অর্থাৎ পুরাতনের বিদায় হচ্ছে, নতুন কিছুর আগমন আসন্ন। কারো কারো মতে, 'Man's very survival hings on the emergence of a 'New Order'. এই 'নিউ অর্ডার'টা কি? সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, বস্তুবাদের পক্ষে যা দেবার তা দিয়ে বস্তুবাদ আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। বস্তুবাদ একদিন বলেছিল, বস্তুর বাইরে কিছু নেই, সেই বস্তুবাদই আজ পরিণত বয়সে পৌঁছার পর বলছে, বস্তুর অরূপ অস্তিত্বই বেশি বলশালী যা ছিল এদিন আধ্যাত্মবাদীদের কথা। এইভাবে বিজ্ঞান যেমন আজ অরূপ জগতের যাত্রী, তেমনি বস্তুবাদ-ক্লান্ত মানুষও আজ দৈহিক শান্তির চেয়ে মনের শান্তির জন্য বেশি আকুল হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় আজ দৈহিক ও মানসিক শান্তির ভারসাম্য বিধানকারী ইসলাম মানবতার জন্য একমাত্র বিকল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এই কথা বলা যত সহজ, বাস্তবক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে ইসলামকে দাঁড় করানো তত সহজ নয়। এরজন্যে প্রয়োজন মুসলমানদেরকেই প্রথমে মুসলমান হওয়া তারপর প্রয়োজন মুসলিম দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানো। তাহলেই শুধু মুসলমানরা বিশ্বের মানুষকে পথ দেখানোর দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে। মুসলমানদের যে সামর্থ এবং যে চ্যালেঞ্জের কথা উপরে বলেছি সেদিক থেকে বিচার করলে আজকের দুনিয়ায় এই কাজ সহজ না হওয়ার কারণ বিশ্বের সবাই ইসলামের ব্যাপারে সচেতন। ইসলামের উত্থান এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের যে কোন উদ্যোগ পশ্চিমের তরফ থেকে বাধার সম্মুখীন হবে। তাছাড়া মুসলমানদের মুসলমান বানাবার কাজ রাতারাতি করে ফেলা সম্ভব নয়। এজন্য সুকৌশল ও ধীর পদ্ধতিতে সমাজের তলদেশ থেকে আমাদেরকে ইসলামের উত্থান ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের যাত্রা শুরু করতে হবে। প্রথমে ব্যক্তি হবে লক্ষ্য, তারপর জাতি, রাষ্ট্র, সবশেষে মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর অংগন। বিষয়টি আরও একটু বিস্তাড়িত করে বলা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত পর্যায় ঃ ব্যক্তি হলো সমাজের মৌল একক। বহু ব্যক্তির সমন্বয়ই হলো সমাজ। সুতরাং জাতির সংস্কার ও সংশোধনের কাজ ব্যক্তি পর্যায় থেকেই হতে হবে। কেউ বলতে পারেন এই সংস্কারের কাজ উপর থেকে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকেও হতে পারে। তবে এরজন্যে যারা এই সংশোধন সংস্কারের কাজ করতে চান তাদের ক্ষমতা দখল করতে হবে। শুধু ক্ষমতা দখল নয়, ক্ষমতার যারা নিয়ামক বা ভিত্তি সেগুলোকেও আপনার করে নিতে হবে। কিন্তু এটা করার কোন শর্টকার্ট পথ নেই। আর যে চ্যালেঞ্জগুলো মুখ ব্যাদান করে আছে তারা এটা হতেও দেবে না। বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে আফগান জেহাদ মুখ থুবড়ে পড়ল কেন, হিজরী পঞ্চদশ শতককে ইসলামের শতক হিসেবে স্বাগত জানানোর ঢাক-ঢোল পিটানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন, বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী আন্দোলন কেন অনাত্মীয় আচরণের শিকার, তার জবাবগুলো সামনে আসলেই এর সত্যতা বুঝা যায়। সুতরাং উপর থেকে নয়, ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও পরিবর্তনের পথে এগুতে হবে।

www.amarboi.org

জাতি রাষ্ট্র পর্যায় ঃ ব্যক্তি সংশোধনের উপযুক্ত ও অব্যাহত কাজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৎলোক ও সৎ নেতৃত্বের উত্থান ঘটাবে। এদের ক্রামশিক সংখ্যা বৃদ্ধি রাজনৈতিক দলগুলো ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে শুভ প্রভাব ফেলবে। সমাজের সব ক্ষেত্রে এই সংশোধন-মুখীতা দেশের শাসনতন্ত্র ও শাসনকাজেও সংশোধন আনবে।

মুসলিম আন্তঃ রাষ্ট্রপর্যায় ঃ জাতি-রাষ্ট্র পর্যায়ের সংশোধন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যের বাধাগুলোকে অপসারিত করবে এবং মুসলিম বিশ্বের ফলপ্রসূ ঐক্য সম্ভব করে তুলবে। মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা কেউ এখানে তুলতে পারেন। লিবিয়া-মিসর, মিসর-সিরিয়া, সিরিয়া-ইরাক, মিসর-ইয়েমেন প্রভৃতি ঐক্য টিকেনি। আরব লীগের ঐক্যেরও কোন মূল্য নেই। এমনিক ওআইসি'র ঐক্যও কোন কাজ দিচ্ছে না। এর জবাব খুব সোজা। মুসলিম দেশগুলোর সার্বিক জনমত ইসলামের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি, মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারগুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলের দিক থেকে ইসলামী নয়, সুতরাং তাদের ঐক্য ইসলামী হবে কি করে এবং টিকবে কি করে? জাগতিক স্বার্থের কারণে যে ঐক্য হয়, জাগতিক স্বার্থের কারণে তা ভেঙ্গে যায়। সন্দেহ নেই, ওআইসি'র ঐক্য ইসলামের ভিত্তিতে হয়েছে, কিন্তু সদস্য সরকারগুলোর অধিকাংশ যেহেতু ইসলামের ভিত্তিতে গঠিত নয় এবং যেহেতু ইসলামী আমল তাদের নেই, তাই ও আইসি'র মহৎ ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতিগুলো তারা বাস্তবায়ন করতে পারছে না। সরকারগুলো ইসলামী হলেই দেখা যাবে ওআইসি বিস্ময়কর কাজ দিচ্ছে।

যদিও আমাদের পতন অত্যন্ত গভীর, যদিও মুসলিম বিশ্ব খণ্ড-বিখণ্ড এবং বেদনাদায়ক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পূর্ণ, যদিও হতাশার অন্ধকার বড় তীব্র, তবুও আশার আলোকবর্তিকা এর মধ্যেও দৃশ্যমান। আমরা দেখছি, পতনের ষোল কলা যখন পূর্ণ, আশার প্রদীপ তার পাশে জ্বলে উঠছে। মুসলিম উম্মার রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক খিলাফত ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটানো হলো ১৯২৩ সালে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঐক্য প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেল। এই সময়ের দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য-প্রয়াসে ১৯২৬ সালে দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় কায়রোতে ১৯২৬ সালের ১৩ই মে থেকে ১৯ মে পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় মক্কায় ঐ বছরেই ৭ই জুন থেকে ৫ই জুলাই পর্যন্ত। বাদশাহ ইবনে সউদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মক্কা সম্মেলনটাই সফল হলো। এই সম্মেলনে গঠিত হয় মোতামার আল-আলম আল ইসলামী। মোতামার ফিলিস্তিন কেন্দ্রিক কিছু কাজ করা ছাড়া মুসলিম উম্মার ঐক্য বিধানে বেশি কিছু করতে না পাবলেও এর গঠন বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মোতামার সম্পর্কে বলতে গিয়ে H. A. R. Gibb লিখছেন ঃ "a new and important element in the structure of Muslim society, by which for the first time the lay and middle classes were organised for the furtherence of Muslim object. They there for represented .... the genuin 'Public opinion' of Muslim countries and were able to influence opinion to a much greater degree." ১০ মোতামার আলোড়ন সৃষ্টি করলেও নানা কারণে ফলপ্রসূ সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে

www.amarboi.org

ব্যর্থ হয়। অনেক পরে ১৯৬২ সালে সউদি আরবের উদ্যোগে মুসলিম বিশ্বের ইসলামী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে মক্কায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্য ছিল আরব জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের সয়লাবের বিরুদ্ধে একটা ইসলামী প্রতিরোধ সৃষ্টি করা। এই সম্মেলনেই গঠিত হয় 'রাবেতাত আল আলম আল-ইসলামী'। আর মুসলিম উম্মার যুবকদের সংগঠন হিসেবে ১৯৭২ সালে সউদি আরবের রিয়াদে গঠিত হয় 'ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ'। মুসলিম উম্মাহর যুবকরা যদি জ্ঞান, নিষ্ঠা ও শক্তিতে সজ্জিত হয়, তাহলে তারা ইসলামী রেনেসাঁর ভিত্তি, ক্ষমতার উৎস এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক ও বাহক হতে পারে- এই মহৎ আশাবাদ নিয়েই ওয়ামির প্রতিষ্ঠা হয়। মুসলিম ছাত্রদের আন্তর্জাতিক ফোরাম হিসেবে গঠিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন (IIFSO).

মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের আরেকটা ফোরাম হলো অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি)। ওআইসির গঠন মুসলিম উম্মার ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ইসলামের ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর এ ধরনের সংগঠন অতীতে আর কোন সময়ই হয়নি। বিশেষ করে যে পটভূমিতে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ওআইসি গঠিত হয়েছে, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ঢেউ-এ যখন মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে আরব বিশ্ব সয়লাব হতে চলেছে, তখন সউদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল ইসলামের ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যের শ্লোগান তুললেন। তিনি বললেন,

"It is .... moments, when Islam is facing many under -currents that are pulling Muslims left and right, east and west, that we need time for more co-operation and closer ties to enable us to face all the problems and difficulties that obstruct our ways as an Islamic nation' believing in god, His prophet and His Laws."

কিন্তু বাদশাহ ফয়সলের উদ্যোগ তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তুরস্ক, সিরিয়া, মিসর এবং লিবিয়ার মতো দেশ ইসলামের ভিত্তিতে এ ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। তাদের মতে ইসলামের ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংস্থা গঠন ঠিক হবে না। ১৯৬৯ সালে ইহুদিরা মসজিদুল আকসায় আগুন দিলে পরিস্থিতি বাদশাহ ফয়সালের অনুকূলে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে রাবাতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইরাক এবং সিরিয়া বৈঠক বয়কট করে। অবশেষে ২৫ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের উপস্থিতিতে ওআইসি গঠিত হয়।

মুসলিম ঐক্যের এই সংস্থাগুলো থেকে আকাঙ্ক্ষিত ফল এখনও পাওয়া যায়নি একথা সত্য, কিন্তু মুসলিম ঐক্যের বিষয়টা কোন আকাশ কুসুম ব্যাপার যে নয়, তা প্রমাণিত হয়েছে। এমন একদিন ছিল যখন অমুসলিমরা তো বটেই, এমনকি মুসলিম রাজনীতিকরা পর্যন্ত রাবেতা ও ওআইসির মতো ঐক্য সংগঠনের কথা কল্পনা করতে পারেননি। বরং এমন আইডিয়াকে তারা বিদ্রূপ করতেন। পাকিস্তানের এক কালের প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম ঐক্যের চিন্তাকে 'জিরো' বলে

www.amarboi.org

অভিহিত করে মন্তব্য করেছিলেন, "Zero plus zero plus zero plus zero is after all equal to zero." কিন্তু সবার মুখে ছাই দিয়ে ইসলাম প্রমাণ করেছে আজকের চরম আদর্শিক অবক্ষয়ের যুগেও ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্য গঠন সম্ভব। এক সময় যা স্বপ্নেরও অতীত ছিল আজ তা বাস্তব। এই বাস্তবতাই ইংগিত দিচ্ছে যে, আমরা মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর যে ধরনের ঐক্য চাই তা ভোরের সূর্যোদয়ের মতোই তার পূর্ণ অবয়ব নিয়ে সামনে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু এজন্য চাই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আমরা ইসলামের উত্থান ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের জন্য যে পথ অনুসরণ করব তা হতে হবে সুবিবেচিত। ইসলামের উত্থান ও মুসলিম ঐক্যের শত্রুরা সংখ্যায় শুধু বেশি নয়, তারা কুশলী এবং শক্তিশালীও। তারা শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমাদের যে কোন উদ্যোগ নস্যাত করে দিতে তারা প্রস্তুত, সেটা কখনও শত্রু হিসেবে, কখনও বিপথে চালনাকারী বন্ধু হিসেবে, কখনও বা আবার ছদ্মবেশী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। সুতরাং ঐক্য ও উত্থানের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের হতে হবে সুচিন্তিত। আমাদের কথা ও আবেগকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নির্দেশ। মাক্কী জীবনে মহানবী (স) যা করেছেন সেই বেশি কাজ, কম প্রদর্শনী এবং প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শান্তিবাদী নীতিই এখন আমাদের অনুসরণ করতে হবে। বিশ্ব পরিস্থিতির যে পর্যায়ে আমরা অবস্থান করছি তাতে নেতীবাচক নয়, ইতিবাচক কাজই আমাদের সাফল্যের সোনালী পথ।

তথ্যপঞ্জি ঃ

1. 'Movement for the Unity of Muslim States'– by Syed Abul A'la Maududi, Muslim News International, Jan. 1967.
2. 'The Principle of Turkism' -by Zia Gokalp.
3. 'Islam and Political Movement in Turkey'– by Binnas Topak, page 36–37.
4. Quated in 'Constitutional Development of pakistan'-by G. W. Chowdhury, Page 63-64.
5. 'Return of Islam' (commentary, Jan. 1976, page 39 – 49) – by Barnard lewis.
6. 'Basic documents in the development of Modern Inida and Pakistan 1835–1947'- by Chaistino & Dobbin, page – 8
7. 'The Crisis of an age 'by A. pritism sorokin, page 22.
8. 'Islamic congress' by H. A. R. Gibb, page –10.

প্রবন্ধটি ১৯৯৩ সালে লিখিত হয়।

www.amarboi.org

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস প্রোগ্রামের অধীনে ১৯৯৫ সালে ১৬ মে থেকে ১০ জুন পর্যন্ত আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছি।

সফরের মধ্যে ছিল ওয়াশিংটন ডিসি, কলরাডো স্টেটের ডেনভার, ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস, টিনেসি স্টেটের ন্যাসভিল, ইলিনয়ের শিকাগো স্টেটের ব্লুমিংটন ও প্লেনফিল্ড ও নিউইয়র্ক। প্রোগ্রামে না থাকলেও আমরা জনৈক বাংলাদেশী ছাত্রের আমন্ত্রণে মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোর যাই।

সফরের বিষয় ছিল 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম।' এই বিষয়ে জানার জন্য ইসলাম, খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

আলোচনার মধ্যে ব্যাপক বিষয় শামিল হয়। তার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার্চ এবং স্টেট আলাদা হওয়া, মার্কিন সমাজের ধর্মের প্রভাব, মার্কিন পাবলিক স্কুলে ধর্ম শিক্ষা নিষিদ্ধ হওয়া এবং প্রার্থনার সুযোগ না থাকা, মানবাধিকার, ইসলাম ও গণতন্ত্র, ইসলাম ও সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও ইসলাম, বিশ্বশান্তি ও ধর্ম, খৃষ্টান-মুসলিম ডায়ালগ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, ধর্মীয় আদর্শ এবং আগামী শতক, ধর্মহীনতা ও অপরাধ প্রবণতার সমস্যা ও ধর্ম, ইত্যাদি বিষয় ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর আমার জন্য একটা বিরাট সুযোগ। এতে মার্কিন জনগণকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। অনেকভাবে তাদেরকে জানার সুযোগ হয়েছে এর ফলে। দেখেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি মুক্ত সমাজ। মত প্রকাশ ও সমিতি-সংগঠন কায়েমের সমান অধিকার সকলের আছে। আইনের চোখে সেখানে ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। গণতন্ত্র যেন মার্কিন জনগণের ধ্যান ও জ্ঞান। জনসমর্থন নিয়ে যাই আসুক সেটাই তাদের কাছে শিরোধার্য। তাদের ধারণা গণতন্ত্রের মাধ্যমে কোন মন্দ এলেও গণতন্ত্রের মাধ্যমেই তা দূর হয়ে যাবে।

গণতন্ত্র মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের জন্য এক ধরনের আফিমে পরিণত হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। গণতন্ত্র যাই করুক তাতে তাদের আপত্তি নেই। আলজেরিয়ার ব্যাপারে তাদের দ্বিমুখী নীতিতে তাদের কোন অনুশোচনা নেই। তারা পরিষ্কার বলেছে, গণতন্ত্রের সিঁড়ি যারা গণতন্ত্রকে ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করবে, তাদেরকে আমরা এ সিঁড়ি ব্যবহারের সুযোগ দিতে পারি না। এর উত্তরে যখন বলেছি, আপনাদের কথা যদি সত্যও হয় যে, তারা গণতন্ত্র ধ্বংস করবে তবু তাদের ক্ষমতায় যেতে দেয়া উচিত ছিল। তারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গেলে জনগণই তাদেরকে আজ না হয় কাল ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিতো। জনগণের যেটা দায়িত্ব সেটা আপনাদের হাতে তুলে নেয়া ঠিক নয়।

www.amarboi.org

তারা উত্তরে বলেছে, জনগণ নামাবে, বিষয়টি একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। গণতন্ত্র ধ্বংস করে জনগণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা ৭২ বছর ক্ষমতায় ছিল।

মনে হয়েছে এক অতি গণতন্ত্র এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার বল্গাহীনতা মার্কিন জনগণের মধ্যে তাদের জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। তাদের এই শূন্যতা বা লক্ষহীনতারই সুযোগ গ্রহণ করেছে ইহুদীরা।

মার্কিন সমাজের আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছে, সেটা হলো তাদের ইতিহাস প্রীতি, ঐতিহ্যপ্রীতি। তাদের জাতীয় নেতাদের তারা অসম্ভব ভালোবাসে। জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, জেফারসন-স্মৃতি সৌধে গিয়েছি। কোনটিতে বার কয়েক যাওয়া হয়েছে। প্রতিবারই সেখানে যা দেখেছি, তাকে অনেকটা ঈদ উৎসবের সাথে তুলনা করা চলে। বিশেষ করে কিশোর-তরুণদের উপস্থিতি খুবই বেশি। যাদুঘরগুলোতে দেখেছি এই দৃশ্য। আমেরিকানরা তাদের জাতীয় বীরদের, জাতির জন্য জীবন বিসর্জনকারী সৈনিকদের কেমন ভালোবাসে তার জীবন্ত রূপ দেখেছি ভিয়েতনাম স্মৃতিসৌধ এবং অরলিংটন সমাধীভূমিতে গিয়ে। সেখানে ঈদ উৎসব ছিল না, ছিল শ্রদ্ধাবনত গর্বিত হৃদয় বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী এবং বৃদ্ধ-যুবাদের মৌন জনস্রোত। দেখে আমার মনে হয়েছে নিহত সৈনিকরা এ দৃশ্য যদি দেখত, তাহলে তারা কৃতজ্ঞ এ জাতির জন্য শুধু একবার নয়, শতবার মরতে চাইত। মার্কিনীদের এই ইতিহাসপ্রীতি, জাতীয় নেতা ও বীরদের প্রতি এই শ্রদ্ধা তাদের জাতীয় শক্তির এক অফুরান উৎস। এমন জাতির জীবনে নেতা ও বীরদের কখনও অভাব পড়ে না এবং জগৎ সভায় এমন জাতি তাদের অস্তিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের অবস্থা সম্পর্কে বলার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মের কি অবস্থা সে সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার। আমাদের সফরের বিষয়ও ছিল এটা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা শতকরা আশি ভাগেরও বেশি। কিন্তু কোন ধর্মেই বিশ্বাস করে না, এমন লোকের সংখ্যা সেখানে বাড়ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার্চ ছাড়াও খৃষ্টান ধর্মীয় সংগঠনের সংখ্যা অসংখ্য। এর মধ্যে শত শত সামাজিক ও দাতব্য সংগঠনসহ ধর্মীয় বার্তা সংস্থা, ধর্মীয় রেডিও-টিভি নেটওয়ার্ক রয়েছে। আমরা একটি ধর্মীয় বার্তা সংস্থা ও দুইটি ধর্মীয় রেডিও-টিভি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। এর একটি রেডিও-টিভি নেটওয়ার্ক যুক্তরাষ্ট্রসহ তেত্রিশটি দেশে, অপরটি ৪২টি দেশে অনুষ্ঠান প্রচার করে। তারা দর্শকদের কাছ থেকে মাসিক ভিত্তিতে ডোনেশান পায়। এটাই তাদের আয়ের মূল ভিত্তি, তারা বলেছে।

খ্রিস্টান ধর্মীয় সংগঠনগুলো অত্যন্ত বিত্তশালী। কারও কারও মতে সরকারও এত রিসোর্সফুল নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টান ইউনিভার্সিটি রয়েছে অনেক। তার একটি আমরা পরিদর্শন করেছি। আমাদের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে তা সুন্দর সুসজ্জিত।

www.amarboi.org

খ্রিস্টানদের মধ্যে বিখ্যাত কিছু বুদ্ধিজীবী এবং সংগঠন রয়েছে, যারা চার্চ ও রাষ্ট্রকে আবার একত্র করতে চায়। তাদের মতে, রাজনীতি থেকে চার্চকে আলাদা রাখার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রটাকে শয়তানরা (Devils) এসে দখল করে ফেলেছে। ঐ শয়তানদের তাড়াতে হলে চার্চকে রাজনীতি করতে হবে। এদের সংখ্যা খুব নগণ্য। এদের সাথে আমাদের দেখা হয়নি। দেখা হলে বুঝা যেত, এদের সম্পর্কে যা শুনেছি তা সত্য কি না।

ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ের অধ্যাপক মিঃ হেনরী এক প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলেন, মার্কিন সমাজ খুবই ধর্মভীরু, কিন্তু সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাঁর মতে, তাদের ফাউন্ডিং ফাদারদের সামনে ছিল ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা। ধর্ম ও রাষ্ট্রের রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বের রোমান অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে ফাউন্ডিং ফাদাররা চেয়েছিলেন রাষ্ট্র প্রশাসনকে ধর্ম প্রতিষ্ঠা বা ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে দূরে রাখতে। কিন্তু পরবর্তীকালে এর অপব্যাখ্যা, অপব্যবহার হয়েছে। শুধু ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ ঘটানো হয়নি, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক সবকিছু থেকে ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

আমেরিকান খৃস্টান ও খৃস্টান ধর্মীয় গ্রুপগুলোও তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব একটা চিন্তা করে না। তাদের প্রশ্ন করেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলতঃ দুইটি পক্ষ, একটি ধর্ম, অপরটি সেকুলার মতবাদ। সেকুলার মতবাদ নিজেই আজ এক ধরনের ধর্মে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্র যেহেতু সেকুলারিজমের পক্ষে কাজ করছে সেহেতু বলা যায় রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে সেকুলার ধর্ম পালনকারীতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সেকুলার হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সমাজে ধর্মহীনতাই প্রবল হয়ে উঠবে না কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তারা স্পষ্টই বলেছেন, মানুষ যা চায় সেটাই হবে, গণতন্ত্রের এটাই আদর্শ। সেই সঙ্গে তারা বলেছেন, রাষ্ট্র ধর্মের প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যেমন কাজ করছে না, তেমনি ধর্মের বিরুদ্ধেও কাজ করছে না। রাষ্ট্র ও প্রশাসন যারা চালান তারাও ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালন করেন।

একটা মজার ব্যাপার হলো, মার্কিন চার্চ ও স্টেট আলাদা হওয়া এবং সেখানে সরকারী স্কুলে প্রার্থনার ব্যবস্থা না থাকার কারণে সেখানে বিবাজিত অবস্থা বিষয়ে এক সময় যে ধারণা পোষণ করতাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর তার পরিবর্তন ঘটেছে।

ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা রাখার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খৃস্টান, মুসলমান ও ইহুদীদের মোটামুটিভাবে একমত দেখা গেছে। তবে কারণ ভিন্ন ভিন্ন। মুসলমানরা মনে করে চার্চ ও স্টেট এক হয়ে গেলে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে এবং সংখ্যাগুরুর দয়ার পাত্র, এমনকি নির্যাতনেরও শিকার তারা হতে পারে। অথচ চার্চ ও স্টেট আলাদা থাকায় সকল ধর্মের সমান অধিকার এবং সমান মর্যাদা রয়েছে। ইহুদীরাও এটাই ভাবে। আর খৃস্টানদের যুক্তি হলো, তাদের ফাউন্ডিং ফাদাররা ইউরোপীয়ান অভিজ্ঞতা সামনে রেখে রাষ্ট্র পরিচালিত ধর্মের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে নাগরিকদের রক্ষার জন্যই চার্চ ও স্টেট আলাদা রেখেছে। এর ব্যতিক্রম হলে দেশের ক্ষতি হবে।

www.amarboi.org

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী স্কুলে ধর্ম শিক্ষা ও উপাসনার ব্যাপারে মিশ্র মতামত দেখা গেছে। খৃস্টানরা সাধারণভাবে এর বিরুদ্ধে, খৃস্টান কোয়ালিশন নামক একটা গ্রুপ এর বিরুদ্ধে নয়। সাধারণভাবে খৃস্টানদের যুক্তি হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দু'শরও বেশি খৃস্টান মত রয়েছে, এত মতকে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় এ্যাকোমোডেট করা সম্ভব নয়। মুসলমানরা স্কুলে ধর্ম শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে, তবু সবাইকে এ ব্যাপারে খুব সিরিয়াস মনে হয়নি। অনকে বলেছেন, এতে ধর্ম শিক্ষার প্রকার, প্রকৃতি, পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দেবে, লাভের চেয়ে তাতে ক্ষতিই বেশি হবে। তারা বলেছেন, সানডে স্কুল এবং কমিউনিটি স্কুলগুলোতে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা তারা করছে।

এবার আসছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম প্রসঙ্গে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের আগমন ঘটে অনেকের মতে, প্রাথমিক ইউরোপীয় সেটলারদের সাথে। বিশেষ করে স্পেন ও আফ্রিকা থেকে তারা আসেন সৈনিক অথবা দাস হিসেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে আমাদের এসকর্ট অফিসার ইরউইন কার্ন ছিলেন নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের মানুষ। তাঁর মতে স্পেন থেকে আসা ঐ ধরনের মানুষের বংশধর তাঁদের এলকায় বেশ আছে। তাদের মুখে অপভ্রংশ আরবী শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন। 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ তারা 'ওকালা' শব্দের আকারে ঐ একই অর্থে ব্যবহার করে।

যা হোক পরবর্তীকালে আমেরিকায় মুসলমানদের আগমন শুরু হয় ১৮৭৫ সালের দিকে। ওসমানীয় খেলাফত কালে সিরিয়া, লেবানন এলাকা থেকে মুসলমানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসে। তারপর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পাঁচটি পর্যায়ে মুসলমানদের আগমন ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাদের সাথে আজ যুক্ত হয়েছে ইসলাম গ্রহণকারী ব্ল্যাক ও হোয়াইট আমেরিকান। সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের মার্কিন মুসলিম সমাজ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইসলামের জন্য খুবই উর্বর ক্ষেত্র মনে হয়েছে আমার কাছে। মুসলমানরা আমেরিকায় দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায়। ১৯৭০ সালের পর মুসলমানদের সংখ্যা ও তৎপরতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০ সালের পর এ বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত মসজিদ আছে তার শতকরা ৭৮% ভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮০ সালের পর। পক্ষান্তরে, ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শতকরা ১৫% ভাগ, ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শতকরা ৫% ভাগ এবং অবশিষ্ট ২% ভাগ হয়েছে ১৯৬০ সালের আগে। এ হিসাব থেকে বোঝা যায় ইসলামের প্রচার ও প্রভাব ১৯৮০ সালের পর কত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের সংখ্যা বলা মুশকিল। অধিকাংশ মসজিদই গীর্জা কিনে তৈরি করা হয়েছে। দোকান ভাড়া নিয়ে তাকে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসবের অনেকগুলো মসজিদ হিসাবে রেজিস্টার্ড নয়। কিছু কিছু হিসাব মতে ৬০৮টি মসজিদ আছে। লস এঞ্জেলেসের বেলাল মসজিদ এবং শিকাগোর মুষ্ঠিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মসজিদ বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে। ওয়াশিংটনের ইসলামিক সেন্টার মসজিদের কথাতো আমরা সকলেই জানি।

www.amarboi.org

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম প্রকাশনা রয়েছে ১৮টি, অডিও ভিডিও প্রকাশনা রয়েছে ১২টি, ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৫০টির বেশি, হাইস্কুল রয়েছে ৯৭টি, কলেজ রয়েছে ২টি, দাওয়া ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৪৯টি, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ২৮টি, বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু ভিত্তিক মুসলিম সংগঠন (যেমন Coalition for free & independent Bosnia & Harzegovina, Democratic League of Kosovo ইত্যাদি) রয়েছে ২৫টি, পত্রিকা ও ম্যাগাজিন রয়েছে ৪১টি, রিলিফ অরগানাইজেশন রয়েছে ৪৫টি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১৫টি। ইসলামিক যুব সংগঠন রয়েছে ২৫টি এবং মহিলা সংগঠন রয়েছে ২১টি। এছাড়া সেখানে আরও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে মুসলমানদের।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যা ৭০ লাখ বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে আফ্রো-আমেরিকান মুসলিম ২৯%, আরব মুসলিম ২১%, হিমালয়ান উপমহাদেশীয় মুসলিম ২৯% ও উপমহাদেশীয় মিশ্র ১০% এবং অন্যান্য ১১% ভাগ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে। লস এঞ্জেলেসে আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিম কমুনিটির নেতা আব্দুল করিম হাসান আমাদের জানালেন, স্থানীয় নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানরা ব্যালান্স অব পাওয়ার। স্থানীয় নির্বাচনে অনেক জায়গায় মুসলমানরা নির্বাচিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে টেক্সাসের একটি শহরে একজন মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হন। নির্বাচিত উক্ত মেয়র বলেন, শহরে তার পরিবারই একমাত্র মসুলিম পরিবার। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আস্থাভাজন ভেবেই শহরের অধিকাংশ মানুষ তাকে ভোট দিয়েছে। স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে এ ধরনের ঘটনা এ দেশে আরও ঘটছে। অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় নির্বাচনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ব্যাপারে সেখানকার মুসলমানরা আশাবাদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তসমাজে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন। কথা প্রসঙ্গে ব্ল্যাক মসুলিম নেতা আব্দুল করিম হাসান বিশেষভাবে জানালেন, মুসলিম দেশগুলোতে সন্ত্রাসমূলক কাজকে তারা খুব ভয় করেন। এই ধরনের কাজ মুসলমানদের খুব ক্ষতি করে, ইসলামের প্রচার কাজকে ব্যহত করে এবং সুনাম ক্ষুণ্ন করে। জনাব আব্দুল করিমের কাছে শুনে আমরা খুব খুশি হয়েছি যে, মুসলিম স্কুলগুলোর চরিত্রগঠনমূলক সুনামের কারণে অনেক খৃস্টান বাবা-মা তাদের ছেলে-মেয়েকে মুসলিম স্কুলে পাঠায়। এমনকি ইহুদিদের ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত মুসলিম স্কুলে আসে।

মুসলিম ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণ মার্কিনীদের কোন বিরূপ ধারণা নেই। তবে সম্প্রতি মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করায় তারা মুসলিম ও ইসলামিক সংগঠনের ব্যাপারে সাবধান হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবতাবাদী পরিচয়ের কিছু খৃস্টান সংগঠন রয়েছে, যারা সব ধর্মের মধ্যে একটা সম্প্রীতির চেষ্টা করছে। তারা চেষ্টা করছে তিনটি বৃহৎ ধর্মের (খৃস্টান, ইহুদি ও ইসলাম) সাজুজ্যগুলোকে বড় করে তুলে ধরতে এবং তা নতুন প্রজন্মকে জানাতে। যাতে করে এসব ধর্ম সম্পর্কে তাদের ভাল ধারণা হয়।

www.amarboi.org

ওয়াশিংটনের মিডল ইষ্ট ইনস্টিটিউটে এ ধরনের একটা ফিল্ম আমরা দেখেছি। এ ফিল্মটি ছাত্রদের দেখানো হয় এবং এর উপর একটা তাৎক্ষণিক পরীক্ষাও নেয়া হয়। লস এঞ্জেলেসের 'ক্রিস্ট্যাল ক্যাথেড্রালে' গিয়ে এ ধরনের আর একটি সংগঠন দেখেছি। তার নাম 'ক্রিশ্চিয়ান এন্ড মুসলিম ফর পিস'। এ সংস্থার যিনি ডাইরেক্টর তিনি কাশ্মীর ও ফিলিস্তিন -এর উপর দুটি বই লিখেছেন। কাশ্মীর গণনির্যাতনের উপর একেবারে আপটুডেট এ্যালবাট তার কাছে দেখলাম। মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ আমাকে বিস্মিত করেছে।

মার্কিন সমাজ খুবই গণতন্ত্রী, কিন্তু জাতীয় ব্যাপারে খুবই রক্ষণশীল। ওকলাহমার ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে প্রমাণ হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ও শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও দারুণ উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব আছে। আরও প্রমাণ হয়েছে, মুসলমানদের সম্পর্কে তারা দারুন ভুল বোঝাবুঝির শিকার এবং এ কারণে তাদের কেউ কেউ মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের ধারণা ওকলাহমার ঘটনায় কোন মুসলিম ধরা পড়লে বহু জায়গায় রায়ট লাগতো। মুসলমানরা কর্মক্ষেত্রে যেতে পারতো না, মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো। ওকলাহমার ঘটনার জন্যে খৃস্টান ধরা না পড়া পর্যন্ত অনেক জায়গায় মুসলমানরা প্রায় অপবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে সংবাদ-মাধ্যমের অপ্রচার। অনেকের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি, মার্কিন জনসাধারণ সন্ত্রাসবাদকে খুবই ঘৃণা করে বিধায় তারা খুব সহজেই এ অপপ্রচারের শিখারে পরিণত হয়েছে। বোধহয় এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেখানেই মার্কিন মুসলমানদের সাথে কথা বলছি, তাদের ভেতরে প্রবল সন্ত্রাসবিরোধী মনোভাব দেখেছি। তারা বলেছে, বিশ্বের কোথাও মুসলমানদের হাতে কোন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলে মনে হয় আমরা এখানে দশ বছর পিছিয়ে গেলাম।

ইসলাম গণতন্ত্রের পক্ষে নয়, মুসলমানরা গণতন্ত্রকে ক্ষমতায় যাবার শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে, এই ধারণা মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবল। যাদের সাথে আমাদের আলোচনা হয়েছে, তাদের আমরা এ ধারণা যে ভুল তা বুঝাতে চেষ্টা করেছি। ইসলামের প্রসার ও প্রচারের স্বার্থে তাদের এ ধারণা দূর করা দরকার।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাদের সাথে এবং যে সব খৃস্টান সংগঠনের সাথে কথা বলেছি, তাদেরকে মুসলমানদের ব্যাপারে খুবই উদার দেখেছি। তারা বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত সমাজে মুসলমানদের সামনে এগুবার অনেক সুযোগ রয়েছে। অনেকের মধ্যে আবার ভুল বুঝাবুঝিও কম নেই। যেমন নিউইয়র্কে আমাদের শেষ সাক্ষাতকারটা ছিল 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব দ্য চার্চের অব ক্রাইস্ট ইন দ্য ইউএসএ'-এর কো-ডাইরেক্টর বার্ট এফ, ব্রেইনার-এর সাথে। তিনি তার অফিসে আমাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় সংখ্যাধীক কম্যুনিটি হিসেবে। কিন্তু আলোচনার এক পর্যায়ে বললেন, মুসলমানরা যেভাবে পশ্চিমকে শত্রু ভাবছে এবং যুদ্ধ ঘোষণা করছে, তাতে সৌহার্দ-সম্প্রীতির চেষ্টা সামনে এগুবে কি করে?

www.amarboi.org

সন্দেহ নেই ভুল বোঝাবুঝির এটা একটা বড় পয়েন্ট। এটা দূর করার চেষ্টা করেছি। আমি ব্রেইনারের জবাবে বলেছিলাম, 'যুদ্ধ' শব্দের এই ব্যবহার বোধ হয় ঠিক নয়। আর 'শত্রু' শব্দের বদলে 'ভয়', 'অবিশ্বাস', 'বিক্ষুব্ধ, ধরনের শব্দ ব্যবহার করাই মনে হয় সংগত হতো।

তারপর তাকে বলেছিলাম, পশ্চিমকে ভয় করার, পশ্চিমকে অবিশ্বাস করার এবং পশ্চিমের উপর বিক্ষুব্ধ হবার মুসলমানদের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো ঃ আজকের পাশ্চাত্য মুসলিম ইস্টকে শাসন ও শোষণ করেছে। স্থানভেদে দেড়শ, দু'শ আড়াইশ বছর পর্যন্ত। এই শাসন-শোষণের বেদনা মুসলমানরা ভুলেনি। ভুলতে পারেনি পশ্চিমেরই কিছু দেশের কিছু ভূমিকায় কারণে। উপনিবেশ তারা ছেড়ে দিলেও শক্তি, অর্থ ও বিজ্ঞান-টেকনোলজির জোরে তারা আধিপত্যবাদী হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখে মুসলিম দেশগুলোর উপর। আরেকটি কারণ বলেছিলাম, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি ইস্যুতে পশ্চিম কার্যত হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, নয়তো পশ্চিমের কারণেই সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি অথবা সমাধান বিলম্বিত হয়েছে। স্লোভেনিয়া-সার্বদের মধ্যে যুদ্ধ তিন সপ্তাহ এবং ক্রোশিয়া-সার্ব যুদ্ধ তিন মাসের বেশি চলতে দেয়া হয়নি, অথচ বসনিয়ার যুদ্ধ আজ সাড়ে তিন বছরেও শেষ হচ্ছে না। এই জলজ্যান্ত ঘটনাগুলো পশ্চিমের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। শেষ যে কারণটির কথা আমি মিঃ ব্রেইনারকে বলেছিলাম, সেটা মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমী কিছু এনজিও-এর ভূমিকা নিয়ে। দারিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ করে সাহায্যের নামে তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসান চালাচ্ছে। ঔপনিবেশিক শাসনের পুরানো জ্বালা-পীড়িত মানুষ একে নতুন এক ঔপনিবেশিক অভিযান বলে মনে করছে। মূলতঃ এসবই পশ্চিমের প্রতি মুসলমানদের ভয়, অবিশ্বাস এবং বিক্ষুব্ধতার জন্যে দায়ী।

মিঃ ব্রেইনার এসব কারণের ব্যাপারে আমার সাথে একমত হয়েছিলেন, তবে বলেছিলেন, এর কোনটির জন্যই পশ্চিমী জনগণ দায়ী নয়, দায়ী একশ্রেণীর সরকার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখেছি, মুসলমানদের ব্যাপারে খৃস্টান ও ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই পৃথক। ইহুদিদের আচরণ অনেকটাই মারমুখো। আমরা নিউইয়র্কে 'কাউন্সিল অব জুইফ্র এ্যাসোসিয়েশনস' এর নির্বাহী পরিচালকের সাথে দেখা করেছিলাম। তিন জায়গায় তিনবার বডি সার্চ করার পর আমাদেরকে তাঁর অফিস কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি কথা শুরুর প্রথমেই অভিযোগ তুলেন। বলেন যে, মুসলমানরা সন্ত্রাসের জন্য আমেরিকায় অস্ত্র যোগাড় করছে এবং অর্থ যোগাড় করছে। তার মতে, সারা বিশ্বে মুসলমানরাই প্রধান টেররিস্টের ভূমিকায় রয়েছে। এ অভিযোগের জবাব আমরা দিয়েছি। বলেছি, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, মিন্দানাও, ইত্যাদির মত জায়গায় যা ঘটছে তা মূলতঃ স্বাধীনতা যুদ্ধ, সন্ত্রাস নয়। আর এ যুদ্ধের সাথে মুসলমানিত্ব বা ইমলামের কোন সম্পর্ক নেই। নিছকই ভূ-খণ্ডগত সংঘাত এগুলো। কিন্তু মনে হয়েছে, তারা সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদনাম ছড়াচ্ছে। কিন্তু কোন খৃস্টান ব্যক্তি বা সংগঠনের মধ্যে এই মনোভাব আমরা দেখিনি। খৃস্টানরা সব সময় মুসলমানদের সাথে সু-সম্পর্ক ও সহযোগিতার কথা বলেছে, ফান্ডামেন্টালিজম শব্দটা মুসলমানদের

www.amarboi.org

জন্য প্রযোজ্য নয় তাও তারা বলেছে। উপরন্তু তারা ওকলাহামার ঘটনার সময় মুসলমানদের যে কিছু অসুবিধা হয়েছে, সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। খৃস্টান অনেক নেতা বলেছেন, ওকলাহামার ঘটনা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির সময় তারা মুসলিম নেতাদের কাছে গিয়েছেন, তাদের সাহস দিয়েছেন এবং প্রকাশ্যে ওকলাহামার ঘটনায় মুসলমানদের অভিযুক্ত করার নিন্দা করেছেন।

খৃস্টানদের একটা মহলের মধ্যে প্রবল ইহুদী বিরোধী মনোভাব দেখেছি। টিনেসিতে থাকাকালে একদিন টিভিতে প্রাইভেট চ্যানেলে দেখলাম, একজন বক্তা টেলিভিশনের একটা প্রোগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য এককভাবে ইহুদীদের দায়ী করলেন। আরেকদিন প্রাইভেট চ্যানেলের একটা টিভি সাক্ষাৎকারে একজনকে বলতে শুনলাম, 'ইহুদীরা আমাদের জেসাসকে হত্যা করেছে, আমাদের বাইবেলের তারা এক নম্বর শত্রু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের বাস করার অধিকার নেই।"

আমার এই ছোট আলোচনা শেষ করার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমাদের সফরকালে ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার একজন নেতা আমাদের জানালেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম সবচেয়ে দ্রুত প্রসারমান ধর্ম। ক্রমবর্ধমান হারে আমেরিকানরা ইসলামিক সেন্টারগুলোতে যাচ্ছে এবং ইসলামিক বইয়ের বিক্রিও তাদের মধ্যে বেড়েছে। ইসলামকে বিকৃত করে দেখানো এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের উত্তেজনাকর খবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করছে। আরেকজন আমেরিকান মুসলিম বিরাট আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেছেন, ২০ বছর আগেও এ কথা কল্পনার বাইরে ছিল যে, আমেরিকানদের একটা নতুন প্রজন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের পতাকা বহন করবে।

ইউএস ইনফরমেশন এজেন্সির ওয়ার্ল্ড নেট, ডায়ালগে ইসলাম গ্রহণকারী আরেকজন আমেরিকান প্রফেসরও এই কথাই বলেছেন। তার ভাষায় "Islam tends to move itself. We have a rising class of Americans who are scholor, who are familiar with the religion."

আনন্দের বিষয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় ও জাতীয় প্রশাসনের ভূমিকাও ক্রমে মুসলমানদের অনুকূল হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের জন্য অনুকূল সিটি ল' প্রণীত হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমে মুসলমানদের হলিডে'র স্বীকৃতি আসছে ও প্রচার পাচ্ছে। ঈদের নামাযের জন্য স্থান ও গাড়ি পার্কি-এর বিশেষ সুবিধা অনেকক্ষেত্রে মুসলমানরা পেতে শুরু করেছে। মার্কিন সিনেট ও কংগ্রেসের উদ্বোধনের সময় কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা হয়েছে। ঈদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মুসলিম সমাজের জন্য বাণী দেন।

এই ভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম ও মুসলমানরা মার্কিন সমাজ ও রাষ্ট্রের অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত হচ্ছে।*

প্রবন্ধটি ১৯৯৫ সালের জুলাইয়ে লিখিত

www.amarboi.org

বিশ শতকে মুসলিম জাগরণের সূচনা পর্ব

বাংলা চৌদ্দ শতকের যখন শুরু ইংরেজি ১৮৯৩ সাল, ইংরেজি উনবিংশ শতকের তখনও সাত বছর বাকি। উনিশ শতকের হিন্দু-জাগরণ যাত্রা এ সময় এক সিদ্ধান্তকর পর্যায়ে উপনীত। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত তাদের যাত্রা তখন রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বত্র। সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধার পশরা তখন তাদের পায়ে আছড়ে পড়ছে। অন্যদিকে পলাশীর পরাজয়ের পর বালাকোটের বিপর্যয় ও ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে হতাশার অন্ধকারের যে যাত্রা শুরু, ইংরেজের জাতি বিধ্বংসী শতমুখী নির্যাতন-নিষ্পেষণে মুসলমানরা পিস্ট হবার পর তা এ সময় জমাট অন্ধকারে ঘনীভূত। উনিশ শতকের এ দুর্ভাগ্য দশা বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গের শক ট্রিটমেন্ট ও মুসলিম লীগের পত্তন পর্যন্ত টিকেছিল।

এ সত্ত্বেও ভূ-লুণ্ঠিত মুসলিম জাতি-সত্তাকে হিন্দু জাতিদেহে লীন করার চেষ্টা সফল হয়নি। তথাকথিত মানবতার নামে, মনুষ্যত্বের নামে, সমন্বয়ের নামে যে ষড়যন্ত্র মুসলিম জাতিকে হিন্দু জাতিদেহে লীন করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল, সে ষড়যন্ত্র মুসলিম জাতিদেহের অভেদ্য বর্ম ভেদ করতে পারেনি। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম ধর্ম একজন মুসলমানকেও তার সাথে শামিল করতে সমর্থ হয়নি। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সমন্বয় চিন্তার দিকে মুসলমানরা চোখ তুলেও তাকায়নি। মুসলমানরা জাগতিক সব কিছুই হারিয়েছিল, কিন্তু হারায়নি চেতনা নামক মহামূল্যবান বস্তুটি।

দিন কারও সমান যায় না। মুসলমানদেরও গেলনা। মুসলমানদের পতনের কবরগাহে অবশেষে জীবনের চারাগাছ গজাতে শুরু করল। যদিও তা আগের থেকে ভিন্ন প্রকৃতিতে, কিন্তু একই লক্ষ্যে-মুসলিম জাতিকে আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। পতনের কবর-গাহে গজিয়ে ওঠা উত্থানের নতুন চারাগাছের প্রকৃতিতে যে ভিন্নতা এল তা মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের অবিশ্বাস, অনাস্থা দূর এবং মুসলমানদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করার প্রয়োজনেই।

সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র ছয় বছর পর ১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল নওয়াব আব্দুল লতিফ কোলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি'। সশস্ত্র সংগ্রামোত্তর মুসলিম জাতীয় জীবনে এ ধরনের সংস্থা, সমিতি গঠন এই প্রথম। সমিতির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কোলকাতায় নওয়াব আব্দুল লতিফের ১৬ নং তালতলা লেনস্থ বাড়িতে ২রা এপ্রিল তারিখে। প্রথম এ বৈঠকে প্রথম যে প্রবন্ধ পাঠ করলেন অধ্যাপক ও মৌলবী ওয়াজীর, তাতে ওয়াহাবী আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করা হলো। এ বিষয়টির দিকে অংগুলী সংকেত করে অনেকে বলেন, নওয়াব আব্দুল লতিফ ও মোহমেডান লিটারারি সোসাইটির কাজ ছিল বৃটিশ তোষণ। এই অভিযোগকে অসত্য বলা যাবেনা, কিন্তু এটাই ছিল তখনকার বাস্তবতা। ১৯৬৯ সালে মোহামেডান লিটারারি

www.amarboi.org

সোসাইটি যখন গঠিত হচ্ছে, তখন সারা দেশ জুড়ে 'ওহাবী'দের ধর পাকড় হচ্ছে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ এবং সীমান্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণের অপরাধে। হাজারে হাজারে মুসলমান যাচ্ছে জেলে অথবা আন্দামানের নির্বাসনে। বৃটিশের সকল ক্রোধ, আক্রোশ ও সন্দেহ মুসলমানদের উপর নিপতিত। এই অবস্থায় মুসলমানদের বাঁচানো এবং বেঁচে থাকার মত অধিকার আদায় ছিল আশু প্রয়োজন। নওয়াব আব্দুল লতিফ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি গড়ে এই কাজেই হাত দিলেন। সোসাইটির মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি, মুসলমানদের প্রতি শাসকদের অবিশ্বাস দূর, মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটানো, সমকালীন চিন্তাধারার সপক্ষে মুসলিম জনমত গড়ে তোলা, ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেন। বস্তুত মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির মধ্য দিয়ে মুসলিম রাজনীতির এক অধ্যায়ের সমাপ্তি, অন্য এক অধ্যায়ের সূচনা ঘটল। সংগ্রাম ও অসহযোগের পথ পরিহার করে আপোষ ও সুবিধাবাদের পথ অনুসরণ করা হলো। জাতির আদর্শের বদলে জাতির ভৌত স্বার্থকে প্রধান বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত করা হলো।

এই বিচ্যুতি সত্ত্বেও মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বিরাট এক দুঃসময়ে মুসলিম জাতি স্বার্থকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করল। ভারতীয় স্বার্থের সাইনবোর্ডে হিন্দুরা যখন সব অধিকার একাই কুক্ষিগত করছিল, তখন মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রথমবারের মত মুসলিম স্বার্থের প্রয়োজন আলাদাভাবে তুলে ধরে। মোহসীন ফান্ডের টাকা লুটে-পুটে খাওয়া হচ্ছিল। যাদের জন্য এই টাকা এবং যাদের জন্য এটা বেশি প্রয়োজন, সেই মুসলমানরা মোহসীন ফাণ্ডের টাকা পাচ্ছিলনা। নওয়াব আব্দুল লতিফ তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা গভর্নর স্যার ক্যাম্পবলকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, মহসীন ফাণ্ডের টাকা দাতার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহৃত হচ্ছেনা। ফলস্বরূপ বাংলাদেশের বৃটিশ প্রশাসন ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুলাই গৃহীত এক প্রস্তাব অনুসারে মোহসীন ফাণ্ডের টাকা শুধু মুসলমানদের জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তখন থেকে হুগলী কলেজ সরকারি হয়ে গেল এবং মোহসীন ফাণ্ডের টাকা মুসলমানদের শিক্ষার কাজে নিয়োজিত হলো। এই টাকায় হুগলী ও কোলকাতা মাদ্রাসার উন্নতি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপন এবং মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হলো। সরকার ৯টি জিলা স্কুলে আরবি ও ফার্সির শিক্ষক রাখার নির্দেশ দিলেন।[১] এত বড় কাজ সম্ভব হয়েছিল বৃটিশ প্রশাসনের সাথে নওয়াব আব্দুল লতিফের সুসম্পর্কের ফলেই। উল্লেখ্য, মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির দ্বিতীয় আলোচনা সভাতেই নওয়াব আব্দুল লতিফ গভর্নর জেনারেল স্যার লরেন্সকে প্রধান অতিথি করে আনতে সমর্থ হন। এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৬ সালের ৬ই মার্চ।

১। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমীন আহমদ. পৃষ্ঠা ৭৬, ৭৭।

www.amarboi.org

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির মাধ্যমে নওয়াব আব্দুল লতিফের চেষ্টায় জাতি হিসেবে মুসলমানরা উনিশ শতকের সত্তরের দশকেই আরও কিছু সুবিধা অর্জনে সমর্থ হলো। ১৮৭১ সালের ৭ই আগস্ট ভারতের বৃটিশ সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলোকে নির্দেশ দিল যে, (ক) সকল সরকারি বিদ্যালয় ও কলেজে মুসলমানদের ধর্মীয় ও মাতৃভাষা শিখবার উৎসাহ দিতে হবে, (খ) মুসলিম অধ্যুষিত জিলাসমূহে স্থাপিত ইংরেজি বিদ্যালয়গুলোতে অধিকতর যোগ্য মুসলমান ইংরেজি শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে, (গ) নিজেদের মাতৃভাষা শিক্ষা বিদ্যালয় ও ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মুসলমানদের অধিকতর অর্থ সাহায্য দিতে হবে, (ঘ) নিজেদের মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার জন্য মুসলমানদের অধিকতর উৎসাহ দিতে হবে।[২]

আজকের বিচারে এই পাওয়াগুলো হয়তো খুব বড় নয় কিংবা এর অন্য রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও হতে পারে। কিন্তু যখন বৃটিশ শাসন বিদ্রোহী জাতি মুসলমানদের পিষে ফেলতে ব্যস্ত এবং হিন্দুরা যখন জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মুছে ফেলতে অগ্রসর, তখনকার সেই ঘোর অমানিশার দিনগুলোতে জাতি হিসেবে মুসলমানদের এই আলাদা প্রাপ্তি মোটেই ছোট ঘটনা ছিলনা। এই সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের আলাদা জাতীয় স্বীকৃতি ও স্বার্থ চিহ্নিত হয়েছিল। জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থানের ক্ষেত্রে এ ছিল এক পাতার এমন একটা চারাগাছ যা ক্রমে বহু পত্র, বহু শাখায় শোভিত হয়ে তার গর্বোন্নত মাথা ঊর্ধ্বে বিস্তার করেছিল ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে।

এ সময় মুসলমানদের জন্য আনন্দের আরেকটা ঘটনা ঘটল, নওয়াব আব্দুল লতিফ রোপিত উত্থানের চারাগাছটিতে সুবাতাস এসে লাগল। দৃশ্যপটে এলেন সৈয়দ আমীর আলী। তিনি ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন রাজনৈতিক সংগঠন 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশেন'। সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর দু'বছর আগে ১৮৭৬ সালে ভারতের জাতীয়তাবাদী জাগরণের নেতা বলে কথিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী প্রমুখকে সাথে নিয়ে এই ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে যোগদানের জন্য সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আমন্ত্রণ জানালেন সৈয়দ আমীর আলীকে। কিন্তু দূরদর্শী আমীর আলী পদদলিত ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের জন্য পৃথক সংগঠনের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে যোগদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে প্রতিষ্ঠা করলেন ঐ ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন। মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি থেকে এর প্রকৃতি ভিন্নতর হলো। সোসাইটি যেখানে বৃটিশের গায়ে হাত বুলিয়ে মুসলমানদের অধিকার আদায় করছিল, সেখানে ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন দাবি আদায়ের প্রেসার

২। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমীন আহমদ, পৃষ্ঠা ৭৭।

www.amarboi.org

গ্রুপ হিসেবে রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। বলা যায় নওয়াব আব্দুল লতিফের জাতীয় উত্থানের চারাগাছটি সৈয়দ আমির আলীর হাতে এসে আরও শক্তি অর্জন করলো।

এ্যাসোসিয়েশনের সামনে আশু লক্ষ্য হয়ে উঠলো মুসলমানদের জন্য চাকরির একটি অংশ সংরক্ষণ, চাকরির শর্ত হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর কম গুরুত্ব প্রদান, কভেনেনটেড সার্ভিসের পরীক্ষা একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত না করা, যে সব চাকরি কভেনেনটেড নয় সেগুলোর জন্য কোন পরীক্ষা না নেয়া এবং মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি।[৩] এ্যাসোসিয়েশনের এ দাবীগুলো ক্রমশ সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮৪ সালের মার্চে ভাইসরয়ের সেক্রেটারীর কাছে লিখলেন, "সব থেকে বড় প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অসম বণ্টন। এটা সব থেকে বেশি অসন্তোষ ও তিক্ততার জন্ম দিয়েছে। এবং এই অবস্থা চলতে থাকবে যে পর্যন্ত না সরকার জোরের সঙ্গে এই নীতি নির্ধারণ করবেন যে, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় চাকুরির অন্তত এক তৃতীয়াংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।"[৪]

এই দাবী সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দেবার জন্য সৈয়দ আমির আলী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করলেন এবং এ্যাসোসিয়েশনকে সর্বভারতীয় রূপ দেবার জন্য এর নাম রাখলেন 'সেন্ট্রাল মোহামেডান ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন'। ১৮৮৮ সালের দিকে বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে এ্যাসোসিয়েশনের ৫৩টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হলো।

১৮৮০ থেকে ১৮৯২ অর্থাৎ বাংলা তের শতকের শেষ বছর পর্যন্ত অনেকগুলো ঘটনা সংঘটিত হলো। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে পৃথক প্রতিনিধিত্বের অধিকার পেল। এখন হয়তো একে খুব বড় ঘটনা বলে মনে হবেনা কিন্তু সে সময় এটা ছিল পদদলিত ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের জন্য একটা বড় রাজনৈতিক বিজয়। এ ছিল মুসলমানদের জাতি স্বাতন্ত্রের রাজনৈতিক স্বীকৃতি। হিন্দুরা এটা খুব ভালো করেই বুঝেছিল। ১৮৮৫ সালে গঠিত হলো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল, কংগ্রেস। যদিও বলা হতো, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান সকলের, তবু কংগ্রেস নির্লজ্জভাবে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করল এবং যুক্ত নির্বাচন দাবী করল। অর্থাৎ কংগ্রেস পদদলিত ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের সমস্যার কোন আমলই দিতে চাইলনা। কংগ্রেসের এ ভূমিকা সম্পর্কে কলকাতার 'মোহামেডান অবজারভার পত্রিকা ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে লিখল, "সরকারি চাকরিতে নিযুক্তির জন্য খোলাখুলিভাবে প্রতিযোগিতাকে নির্বাচনের

৩। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', উমর পৃষ্ঠা ৫৫।

৪। The Emergence of Indian Nationalism, Anil Seal, page 28
('ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ৫৫)

www.amarboi.org

একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণের উপর জোর দেয়ার অর্থ সরকারি চাকরি থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণ বহিষ্কার। ....সংখ্যালঘুদের অধিকার আছে তাদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে কিনা সেটা দেখার এবং আমরা যুক্তিযুক্তভাবেই বলি যে, আমাদের লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষা ও রাজনৈতিক বুদ্ধির দিক দিয়ে হিন্দুদের সমকক্ষ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের যথেষ্ট রক্ষাকবচ ব্যতীত সংখ্যাগুরুকে বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান সংখ্যালঘুর ধ্বংসই ডেকে আনবে।'[৫] স্যার সৈয়দ আহমদ 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' ডাকলেন ১৮৮৬ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর। এই সম্মেলনে তিনি মুসলমানদের জন্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মতই স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্যার সৈয়দ তার বিখ্যাত লক্ষ্ণৌ বক্তৃতায় হিন্দুদের যুক্ত নির্বাচন দাবীর তীব্র বিরোধিতা করলেন। এ সময় কংগ্রেস উৎকট মুসলিম ও বিরোধিতা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লে বিপদের আশংকায় স্যার সৈয়দ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'মুসলিম প্রতিরক্ষা সমিতি' গঠন করলেন।

কিন্তু মুসলমানদের প্রতিবাদ, বিরোধিতা, ইত্যাদি কোন কাজেই এলনা। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস গঠনের পর আবহাওয়া যেন পাল্টে গেল। কংগ্রেস গঠন ও হিন্দুদের জংগী উত্থানে বৃটিশ প্রশাসন যেন হিন্দুদের মন রক্ষায় পাগল হয়ে উঠল। ১৮৯২ সালে 'ইন্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট' পাশ হলো। আইন পরিষদ ও ষ্টাটিউটরী বডিতে পরোক্ষ প্রতিনিধিত্বের নীতি ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হলো।

হিন্দু জাতীয় উত্থানের গতিতে ঝড়ের বেগ সঞ্চারিত হলো। ১৮৯৬ সালে শিবাজী উৎসব হিন্দু উত্থানকে মারমুখো এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করল। ঠিক এই সময় ১৮৯৩ সালে মারা গেলেন নওয়াব আব্দুল লতিফ এবং ১৮৯৮ সালে মারা গেলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। আর এ সময় সৈয়দ আমীর আলীও বিলেত মুখো হলেন। ১৯০৪ সালে তিনি বসতি স্থাপন করলেন বিলাতে।

সবদিক থেকে ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল মুসলমানরা। মুসলমানদের জাতীয় উত্থানের যে চারাগাছটা গজিয়েছিল তা পড়ে গেল প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে। এই দুঃসহ অমানিশার মধ্যে একবছর দুবছর করে দশটি বছর কাটিয়ে মুসলমানরা উপনীত হলো বাংলা চৌদ্দ শতকের দশম বর্ষে। চৌদ্দশতকের দশম বর্ষ ১৯০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষিত হলো, যা আহত ব্যাঘ্রের মত জাগ্রত ও হিংস্র করে তুলল হিন্দুদের। হিন্দুদের এই মারমুখো উত্থান মুসলমানদের জন্য শক-ট্রিটমেন্টের কাজ করল। মুসলমানরা আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করল। এই প্রয়োজন থেকে গড়ে উঠল তাদের আত্মরক্ষার এক ঐতিহাসিক দুর্গ। বাংলা চৌদ্দ শতকের শুরুতে সংঘটিত এই ঘটনা বাংলা চৌদ্দ শতককে দান করল সুস্পষ্ট এক চরিত্র, নতুন এক গতি এবং অনন্য এক ইতিহাস। কি ছিল ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই বঙ্গভঙ্গের ঘটনা?

৫। The Emergence of Indian Nationalism', Anil Seal, page 32
('ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', পৃষ্ঠা ৬৬)

www.amarboi.org

বঙ্গভঙ্গ আসলে নিছক কোন বঙ্গ-ভঙ্গ ছিলনা। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য লর্ড কার্জন তৎকালীন বিশাল বাংলা প্রদেশকে দুটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। একেই খারাপ অর্থে চিত্রিত করার জন্য হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ আখ্যায়িত করেছিল।

বঙ্গভঙ্গ বা এই প্রদেশ বিভাগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম ঘোষিত হলো ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর। সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনে ঘোষিত এ পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট এলাকাসহ সম্বলপুর, গাঞ্জাম ও ভিজাগাপত্তম এজেন্সী বাংলা প্রদেশের সাথে, অন্যদিকে বাংলার চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাকে আসাম প্রদেশের সাথে এবং ছোট নাগপুরকে মধ্য প্রদেশের সাথে যুক্ত করার কথা বলা হলো।

প্রদেশ বিভাগের এই পরিকল্পনা পরে আরও সংশোধিত ও পরিবর্তত হলো। ১৯০৪ সালের এপ্রিলে লর্ড কার্জন যখন লন্ডন যান, তখনই তিনি বিষয়টির পুনর্বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলে গেলেন। কার্জন লন্ডন গেলে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন অ্যাম্পটহিল। তার সময়েই বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করল। ১৯০৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর বঙ্গবিভাগের নতুন পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত করা হলো। এই ডিসেম্বরেই কার্জন ফিরে এলেন লন্ডন থেকে। তিনি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের কাছে প্রেরণ করলেন। ইংল্যান্ডে একটি বিশেষ কমিটি প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে দেখার পর ১৯০৫ সালের ৯ই জুন বাংলা বিভাগকে অনুমোদন দান করলো। অনুমোদিত এ পরিকল্পনা অনুসারে বাংলার রাজশাহী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মালদহকে চীফ কমিশনার শাসিত আসামের সাথে যুক্ত করে নতুন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলো। আর বাংলার অবশিষ্ট এলাকার সাথে সম্বলপুর উড়িষ্যার পাঁচটি এলাকা যুক্ত করে গঠিত হলো বাংলা প্রদেশ। হিন্দী ভাষা-ভাষী পাঁচটি এলাকা বাংলা প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্ত হলো গিয়ে মধ্যপ্রদেশের সাথে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে নতুন প্রদেশ বিভাগকে কার্যকরী করা হলো।

.প্রদেশ পুনর্গঠনের পর পূর্ব বংগ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হলো ঢাকা। এই নতুন প্রদেশের লোক সংখ্যা দাঁড়ালো ৩ কোটি ১০ লাখ। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ালো ১ কোটি ৮০ লাখ, হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ। অন্যদিকে বাংলা প্রদেশের লোকসংখ্যা দাঁড়ালো ৫ কোটি ৪০ লাখ। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৯০ লাখে, আর হিন্দু সংখ্যা হলো ৪ কোটি ২০ লাখ। কলকাতা হলো বাংলা প্রদেশের রাজধানী। এই প্রদেশ বিভাগের ফলে জাতি হিসেবে মুসলমানরা লাভবান হলো। একদিকে ঢাকাকে তারা রাজধানী হিসেবে পেল, অন্যদিকে ১৮৬৫৪০ বর্গমাইলবিশিষ্ট বিশাল প্রদেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুর্শিদকুলিখান ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নেবার পর পূর্ব বাংলার প্রতি যে অবহেলা শুরু হয়েছিল এবং বৃটিশ আমলে কোলকাতা কেন্দ্রীক শাসনে পূর্ব

www.amarboi.org

বাংলার উপর যে দুর্দিন চেপে বসেছিল, তার প্রতিকারের একটা পথ হলো নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে। সচেতন সবার কাছেই পরিষ্কার ছিল, রাজধানী থেকে বহুদূরের 'পূর্ব বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল দুর্বল ও অদক্ষ এবং স্বাভাবিকভাবেই কার্যকর ও সক্রিয় ছিলনা। জনকল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য যে অর্থ এ এলাকায় ব্যয় করা হতো তা ছিল বাস্তব প্রয়োজন অপেক্ষা নিতান্তই অপ্রতুল। এমনকি এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান সমস্যাকেও উপেক্ষা করা হতো। শিক্ষায় ছিল অবহেলিত, যোগাযোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। কৃষকরা সাধারণত কলকাতায় বসবাসকারি জমিদারদের এজেন্ট ও কর্মচারীদের হাতে অত্যাচারিত হতো। ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক থেকেও এ অঞ্চল দারুণভাবে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম বন্দরের কোন উন্নতি না হওয়ার ফলে পূর্ব বাংলার বড় বড় নদী অঞ্চলকে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারের জন্য যথাযথ ব্যবহার করা হয়নি।'[৬]

বঙ্গ বিভাগের মূলে পূর্ব বাংলার এ দুর্দশা দূরীকরণ চিন্তা যতটাই থাক, মূলত প্রশাসনিক সুবিধার জন্য নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল।

লর্ড কার্জন এক চিঠিতে বলেছিলেন, "যে কোন ব্যক্তির (প্রশাসকের) পক্ষে বাংলার প্রশাসন পরিচালনা এক অসম্ভব ব্যাপার। (এ অবস্থায়) প্রশাসন যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার তা অনুধাবনের জন্য শুধু তাকে জেলায় যেতে হবে।"[7] সন্দেহ নেই, প্রশাসনিক সুবিধার দিকটা সামনে রেখেই সব বিরুদ্ধতাকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। বিভিন্ন স্তরে বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যখন চরম পর্যায়ে ওঠে, তখনও উপদেষ্টারা লর্ড কার্জনকে পরামর্শ দেন, 'বিভিন্ন সংস্থা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা প্রশাসনিক স্বার্থ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'[৮] ইবেৎসন কার্জনকে বলেন, "বাংলার (প্রশাসনিক) স্বার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর আসামের জন্য তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয়, প্রশাসনিক প্রয়োজনে (সকল স্তরের) বিরোধিতা সত্ত্বেও এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া উচিত।'[৯]

কিন্তু কার্জন প্রশাসন তার সিদ্ধান্তের পক্ষে এ ধরনের যত যুক্তিই দেন, একটি মহল আজও বলছে লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তখনও বলা হয়েছিল, এখনও বলা হচ্ছে যে, একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি করে ক্রমবর্ধমান হিন্দু প্রভাব ক্ষুণ্ন করার মনোভাবই এর পেছনে কাজ করেছে। এই

৬। 'বঙ্গ ভঙ্গ', মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ২,৩।

৭। Curzon to Zroderiek, Feb, 17, 1904 ('বঙ্গ ভঙ্গ', মুনতাসির মামুন, পৃষ্ঠা ১৯)।

৮। 'Ibetson', Note, Feb 7. 1904 (Public- A Proceceings. C. P. Vol-47. para. 1-3 (বঙ্গ-ভঙ্গ', মুনতাসির মামুন, পৃষ্ঠা ১৩,১৯)

৯। 'Ibetson', Note. Feb 7, 1904 (public Proceeding's. C. P. Vol-47. Para 7} (বঙ্গ ভঙ্গ', মুনতাসির মামুন, পৃষ্ঠা ১৩.১৯।

www.amarboi.org

যুক্তির পক্ষে ক্রমবর্ধমান হিন্দু প্রভাব বৃদ্ধি সম্পর্কে বৃটিশ ভীতির দৃষ্টান্তও তারা তুলে ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো কার্জনের কাছে ভারত সচিব হ্যামিল্টনের একটি চিঠি। এ চিঠিতে হ্যামিল্টন লেখেন, "আমার মনে হয় আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর ভারতে আমাদের শাসনের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হয়ে যা দেখা দেবে, তা হলো পাশ্চাত্যের ঢং-এ আন্দোলন সংগঠনের পর্যায়ক্রমিক অথবা ব্যাপক বিস্তার। আমরা যদি শিক্ষিত হিন্দুদের ভিন্নমুখী ভাবধারায় দু'টি দলে বিভক্ত করতে পারি তবে উত্তরোত্তর উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ফলে আমাদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যে সূক্ষ্ম আক্রমণ আসছে তা প্রতিহত করতে পারব।"[10] আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে উদ্ধৃত করা হচ্ছে 'ভ্যালেন্টিন চিরোল'-এর রিপোর্টকে, যা তিনি লর্ড মিন্টোর কাছে পেশ করেছিলেন। ভ্যালেন্টিন চিরোল তার এ রিপোর্টে বলেছেন "এটা নিঃসন্দেহ যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে 'অসন্তোষ' দানা বেঁধেছে তা প্রধানত কৃত্রিম, কিন্তু যা মূলত আমাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে আর যা আমার নিকট অত্যন্ত অশুভ মনে হয় তা হলো পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রতিপত্তি, বিশেষ করে এর আত্মিক ও নৈতিক, পার্থিব ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও সর্বাত্মক বিপ্লবের আন্দোলন। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী বিজয় নিঃসন্দেহে এ আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু এর মূল প্রোথিত আরও গভীরে। এ আন্দোলন এশিয়াব্যাপী প্রাচ্যের সব জাগরণের কোন ভারতীয় অভিব্যক্তি নয়, বরং এ আন্দোলন হল প্রধানত হিন্দু (পুনর্জাগরণের) আন্দোলন। ত্রিশ বছর পূর্বে যখন আমি ভারতে এসেছিলাম তখন লক্ষ্য করেছিলাম, নতুন আশায় উদ্বেল নতুন ভারত বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে হতে চেয়েছিল ইংরেজদের চেয়েও ইংরেজ মনোভাবাপন্ন। পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্র তথা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও শাসনব্যবস্থাকে তখন বিনা দ্বিধায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানো হয়েছিল। স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের আগ্রহ কমে আসার আটের দশকে ঘড়ির দোলক যেন পেছনে ফিরেছে আর নয়ের দশকে তা হিন্দু পুনর্জাগরণের এক আন্দোলনে রূপ লাভ করেছে যার ফলে বেদ অনুশীলন, বাণী পূজা, গণপতিমেলা অনুষ্ঠান ও শিবাজী মহারাজ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বৃদ্ধি পেয়েছে। .... বর্তমানে আমরা বাংলা, দাক্ষিণাত্য ও পাঞ্জাবের মত তিনটি ঝটিকা কেন্দ্রে এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি।"[১১ক]

উপরোক্ত দুটি উদ্ধৃতিতে ইংরেজদের যে উদ্বেগ-অনুভূতি, তার প্রত্যেকটি কথাই সত্য। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মারমুখো রূপ নিয়েছিল তা ঐতিহাসিক ঘটনা। যদিও এ আন্দোলনের টার্গেট ছিল মুসলমানরা, তবে তা প্রয়োজনে বৃটিশ বিরোধীও হয়ে উঠতে পারে, একথা না বোঝার মত নাবালক ইংরেজরা ছিলনা। বরং দূরদর্শী

১০। 'Hamilton to Curzon', September 20, 1899 (Curzon papers, Vol-I)

১১। ক। Valentine Chirol to Minto, May 23, 1910 (MTP Correspondence, Vol-11, No. 175).

www.amarboi.org

ইংরেজরা পঞ্চাশ বছর পরে কি হতে পারে সেটা সঠিকভাবেই অনুমান করেছিল। এ অনুমান যারা করতে পারেন, তারা বাঙলা ভাগ করে এই পরিণতি ঠেকাতে চেষ্টা করবেন এ কথা বিশ্বাস করতে বলা একটা বালখিল্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলার হিন্দু জাতীয়তাবাদী যে জাগরণ, তার স্রষ্টা কি শুধু বাংলার হিন্দুরা? তা যে নয় ইতিহাস এর সাক্ষী। হিন্দুবাদী জাগরণের যিনি জনক সেই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বাংলার লোক নয়। দয়ানন্দ সরস্বতীর পর, হিন্দুদের মারমুখো জাগরণের পতাকা যারা বহন করেন, সেই বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপাত রায়, প্রমুখের কেউই বাংলাদেশের নন, ।[১১খ] তারা দূরবর্তী প্রদেশ পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, প্রভৃতি থেকে এসে যদি বাংলার হিন্দু মনে জাগরণের আগুন লাগিয়ে থাকেন, স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরে থাকেন, তাহলে বাংলা ভাগ হলেই হিন্দু জাগরণ বন্ধ হয়ে যাবে, আসলে যারা এ ধরনের অবস্থা চিন্তা করেন, তাদের এ চিন্তাই প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য প্রণোদিত। হিন্দু বাবু-বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিই এরা চোখ বন্ধ করে উদ্‌গীরণ করতে চায়।

লর্ড কার্জনের কয়েকটি উক্তিকেও দলিল হিসেবে সামনে এনে বলা হয় যে, বঙ্গ ভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এ ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের যে উক্তিটিকে সবচেয়ে বড় দলিল হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়, তাতে তিনি বলেন, "যারা নিজেদের একটি জাতি ভাবছে এবং স্বপ্ন দেখছে যে, ইংরেজরা বিতাড়িত হলেই কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউজে একজন বাঙ্গালী বাবুকে বসানো হবে, সেই বাঙ্গালীরা তাদের এ স্বপ্নের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে এমন কোন কিছুই বরদাশত করবেনা। আজ আমরা যদি তাদের হৈ চৈ প্রতিরোধে দুর্বলতা প্রদর্শন করি, তাহলে বঙ্গ বিভাগ আর কোন দিনই সম্ভব হবে না এবং এর দ্বারা এমন একটা শক্তিকে সংহত ও শক্তিশালী করা হবে যারা ভবিষ্যতের জন্য ক্রমবর্ধমান বিপদের উৎস হয়ে উঠছে আমাদের পূর্বাঞ্চলে।"[১২]

প্রথমত কার্জনের এই কথাগুলো একটা জবাবী বক্তব্য বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষণার ২ মাস ৬ দিন পর লর্ড কার্জন এই কথাগুলো বলেছেন। বলেছেন এমন সময় যখন তিনি তার পরিকল্পনার সপক্ষে জনমত তৈরির জন্য প্রচারে বেরিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষণার পর তিনি হিন্দু জমিদার ও বুদ্ধিজীবীদের যে আক্রমণের

১১। খ। বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতা শ্রী অরবিন্দ বাঙ্গালী হলেও তার প্রেরণা বাংলাদেশ থেকে নয়। শ্রী অরবিন্দু 'পশ্চিম ভারতীয় এক ঠাকুরের নিকট সন্ত্রাসবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তা বাংলায় চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।' ('অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৭৮) শ্রী অরবিন্দ বরোদা কলেজের অধ্যাপক থাকাকালে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীত প্রাণ এবং মারাঠা দেশে এই আন্দোলনের নেতা দামোদর হরি চাপেকার ও বিষ্ণুহরি চাপেকার-এর কাছে বিপ্লবের দীক্ষা নেন। (স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, পুর্নেন্দু দস্তিদার, পৃষ্ঠা ৫৬)।

১২। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি কার্জন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ার ফেরত ট্রেনে ভারত-সচিব ব্রোডরিককে এ কথাগুলো লিখেছিলেন।

www.amarboi.org

শিকার হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছেন তিনি এখানে। তাঁর উপর যেমন রাজনৈতিক আক্রমণ হয়েছে, তিনি তেমনি তার রাজনৈতিক জবাব দিয়েছেন। এ যুক্তিগুলো প্রকৃতপক্ষে বিরোধীপক্ষকে ঘায়েল করার যুক্তি, বঙ্গভঙ্গের যুক্তি নয়। উপরের উক্তিটিতে কার্জন মূলত দুইটি কথা বলেছেন। এক. বাঙ্গালী বাবুদের টার্গেট কলকাতার গভর্নর হাউজ অর্থাৎ বাংলার কর্তৃত্ব দখল করা এবং তাদের এ স্বপ্নকে তারা কোনভাবে খণ্ডিত হতে দিতে রাজী নয়। দুই. তাদের দাবীর কাছে যদি নতি স্বীকার করা হয়, তাহলে তারা আরও সংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। প্রথম উক্তির মধ্যে দিয়ে লর্ড কার্জন প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী বাবুদের বাংলার রাজা হওয়ার স্বপ্নকে বিদ্রূপ করেছেন, বাংলা ভাগ করে তাদের উদ্দেশ্যকে বানচাল করা যাবে একথা তিনি বলেননি। এমন অযৌক্তিক কথা তিনি বলতেও পারেন না। কারণ বাংলা ভাগ হলেও কোলকাতার বাবুদের কোলকাতার গভর্নমেন্ট হাউজে বাস অর্থাৎ ঐ বাংলার কর্তৃত্ব দখলে কোন অসুবিধা হতে পারেনা। অতএব বাংলা ভাগ করে বাঙ্গালী বাবুদের উদ্দেশ্য বানচাল করতে পারছেন কই? লর্ড কার্জন তাঁর উক্তির দ্বিতীয় অংশে যে কথা বলছেন তার সারকথা এই যে, বাঙ্গালী বাবুদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে তাদেরকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করা উচিত হবেনা। বঙ্গ বিভাগের মাধ্যমে তাদের দুর্বল করা যাবে এ কথা তিনি এখানে বলেননি। বলা কোন দিক দিয়ে যুক্তিসংগত নয়। পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, যুক্তপ্রদেশ, বাংলা প্রভৃতি প্রদেশের হিন্দুরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে, তাহলে বাংলা ভাগ হলেই বাংলার হিন্দুরা দুর্বল হয়ে পড়বে কেন? ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর থেকে ১৯১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলা বিভক্ত ছিল। এই বিভক্তি হিন্দুদের ঐক্য ও আন্দোলনে কোনই বাধার সৃষ্টি করেনি, সামান্য দুর্বলও তাদের করেনি। তাদের শক্তি ও সন্ত্রাসের মুখেই ইংরেজরা নতি স্বীকার করে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে। সুতরাং হিন্দুদের জাতীয় জাগরণ ও উত্থান দমন করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বঙ্গ বিভাগ হয়েছিল এটা একটা গাঁজাখুরি যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আসল কথা হলো, বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গ বিভাগ ছিল তখনকার বৃটিশ শাসকদের দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক চিন্তা-ভাবনার ফল। যা কার্যত শুরু হয় ১৮৫৪ সালে। এ বছর বাংলার গভর্নরের (লেফটেন্যান্ট গভর্নর) পদ সৃষ্টি করার সময় এ আশা পোষণ করা হয় যে, এর ফলে বাংলার প্রশাসন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। ১৮৬৭ সালে উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের পর প্রণীত তদন্ত রিপোর্টে বাংলার আয়তনজনিত প্রশাসনিক দুর্বলতাকে দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১৩] বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার উইলিয়াম গ্রে লরেন্সের নিকট লিখিত এক পত্রে বললেন, "বর্তমান বাংলা

১৩। 'Yule's Minute, July 18, 18, 67, No, 1 Paras 11 and 111, Feres Minurte, December 2, 1867 cited in Z. H. Zaidi, op-cit, Page 115 ('বঙ্গভঙ্গ, মুনতাসির মামুন সম্পাদিত পৃষ্ঠা ১৪, ১৫)।

www.amarboi.org

সরকারের মত এমন অস্বাভাবিক ব্যবস্থা ভারতে আর আছে বলে আমি জানিনা। ভারতে আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম প্রশাসনিক ব্যবস্থা আর গুরুত্বের দিক থেকে সর্বপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সরকারের কর্মক্ষমতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার অপেক্ষা অনেক কম ও শ্লথ।"[১৪] এইভাবেই বঙ্গবিভাগের সুস্পষ্ট চিন্তা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। উল্লেখ্য, এ সময় হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী উত্থানের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়নি। লেফটেন্যান্ট গভর্নর গ্রে যখন এ চিঠি লেখেন, তারও নয় বছর পর ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, প্রমুখ হিন্দু নেতারা ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এরও নয় বছর পর ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেস। সুতরাং হিন্দুদের উত্থান প্রতিরোধ করার জন্য বঙ্গবিভাগ চিন্তার উদ্ভব হয়নি। এছাড়া লর্ড কার্জন গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার ২ বছর আগে ১৮৯৬ সালে বঙ্গবিভাগের সুস্পষ্ট প্রস্তাব প্রণীত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ওল্ডহ্যাম ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপারিশ করলেন যে, আসামসহ চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের অংশবিশেষ নিয়ে পূর্ব বাংলা নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়া দরকার।[১৫] চট্টগ্রাম অথবা ঢাকাকে তিনি এ নতুন নামে নতুন প্রদেশের রাজধানী করার কথা বললেন। এ বছরই নভেম্বর মাসে আসামের চীফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড আসামের সাথে চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সংযুক্তি করণের প্রস্তাব দিলেন।[১৬] উল্লেখ্য, এর আগে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে লুসাই অধিবেশনের সুপারিশক্রমে চট্টগ্রাম জিলাসহ লুসাই অঞ্চলকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা অবশ্য তখন কার্যকরী হয়নি।[১৭] সুতরাং ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো, গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড কার্জন আসার আগেই বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। লর্ড কার্জন এই চিন্তা, প্রস্তাবকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন মাত্র। অতএব লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত একথা কোন দিক দিয়েই ধোপে টেকেনা।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, অবহেলিত পূর্ববংগের স্বার্থ সামনে রেখে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই যদি বঙ্গভঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাও এর প্রতিবাদ করেছিল কেন? এ প্রশ্ন তোলার অবকাশ অবশ্যই আছে। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা ঘোষিত হবার পর পূর্ব বাংলা থেকে প্রতিবাদ উঠেছিল। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পূর্ববঙ্গ থেকে উত্থিত মুসলিম নামীয় প্রতিবাদগুলোর সব ক'টিই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা ঘোষণা

১৪। 'Grey to Lawrence', July 1867 (John Lawrence Collection. Vol-1913).

১৫। Commissioner of Chittagong Division to Government of Bengal, Feb. 7, 1896, No. 722 P. L. 1897, Vol. 24.

১৬। Chief Commissioner of Assam to Government of India Nov, 25, 1896, No. 583, Page 17-19.

১৭। The Proceedings of Government of India of the Foreign Department 1883-E of July, 25, 1892, See also Lansdowne to cross. Janu, 6, 192 (The Coross Collection. Eur. E, 243 Vol. 32-1.9.L).

www.amarboi.org

(১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর) থেকে চূড়ান্ত বঙ্গ বিভাগ ঘোষণার (১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর) মধ্যবর্তী সময়ের। চূড়ান্ত বঙ্গবিভাগ ঘোষণার পর এর বিরুদ্ধে কার্যত কোন মুসলিম প্রতিবাদ আমরা দেখিনা। লক্ষ্য করার বিষয়, ১৯০৩ সালের বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা এবং ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ এক জিনিস ছিলনা। ১৯০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বরের পরিকল্পনার মধ্যে আপত্তির কিছু সংগত কারণ ছিল।

১৯০৩ সালের পরিকল্পনায় আসামের সাথে চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। যার ফলে ঢাকা বিভাগের একটা অংশ এবং গোটা রাজশাহী বিভাগ পূর্ববঙ্গ প্রদেশ থেকে বাদ পড়েছিল অর্থাৎ পূর্ববঙ্গও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পূর্ব থেকে উত্থিত আপত্তির একটা কারণ ছিল এটা। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর চূড়ান্ত বঙ্গ বিভাগের এ আপত্তি দূর হয়ে যায়, গোটা ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ পূর্ববঙ্গ প্রদেশের শামিল হয়ে যায়। মুসলমানরা এই চূড়ান্ত বঙ্গ বিভাগে খুশী হয় এবং একে স্বাগত জানায়।

সবচেয়ে বড় কথা হলো বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গ থেকে যে সব প্রতিবাদ উত্থিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উদ্যোক্তা মুসলমানরা ছিলনা। 'পূর্ববঙ্গের প্রধান হিন্দু জমিদার ও 'ভদ্র লোক' নেতারাই এখানকার প্রতিবাদ সভাগুলোর আয়োজন করেছিলেন এবং কৌশলগত কারণে অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সভাপতি করেছেন।[১৮] বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঢাকায় প্রথম যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তার সভাপতি ছিলেন ধানকোরার জমিদার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী। এ সভায় বক্তৃতা করেন কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এবং উকিল আনন্দচন্দ্র রায়। পরে ঢাকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারী রাখার লক্ষ্যে গঠিত হয় "জনসাধারণ সভা"। এ 'জনসাধারণ সভা' গঠনের প্রেরণা ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর ভারত সভা'। প্রধানত হিন্দু উকিলরা ছিলেন এর উদ্যোক্তা। বঙ্গবঙ্গের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের প্রতিক্রিয়া নিয়ে সবচেয়ে উৎসাহী ভূমিকা পালন করে ঢাকার সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ।' 'তিল'কে সে 'তাল' করে প্রচার করত। পত্রিকাটি ছিল হিন্দু মালিকানাধীন এবং হিন্দু উত্থানবাদীদের আড্ডা। ১৯০৩ সালে বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষণার পরপরই 'ঢাকা প্রকাশ' লিখল, "ভাই বঙ্গবাসী, এই বিষম বিপ্লবকর প্রস্তাব কার্যে পরিণত হলে, বাঙ্গালী জাতির কি সর্বনাশ সংঘটিত হবে একবার তাহা নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?..... অতএব স্বদেশের জন্য, স্বদেশীদের জন্য, যে কোন বঙ্গ সন্তানের শ্রদ্ধা আছে তাহাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, এই প্রলয়ংকর প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করে জাতীয় অসন্তোষ চিহ্ন ভারত গভর্নমেন্টের নিকট স্থাপন করুন।"[১৯] এক সপ্তাহ পরেই পত্রিকাটি আবার লিখল, "রাজ পুরুষের কুটিল কটাক্ষ দেখে ভীত হইওনা। পুরুষ পরম্পরাগত পৈত্রিক সম্পত্তি 'বাঙ্গালী' আখ্যা রক্ষার নিমিত্ত যদি আত্মোৎসর্গে বিমুখ হও, তবে ধরা পৃষ্ঠা হতে যত শীঘ্র তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়, ততই মঙ্গল।'[২০]

১৮। ''বঙ্গ ভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া', মুনতাসির মামুন (দ্রষ্টব্য 'বঙ্গভঙ্গ', পৃষ্ঠা ৭২)

১৯।'ঢাকা প্রকাশ,' ডিসেম্বর ২০, ১৯০৩ (দ্রষ্টব্য 'বঙ্গ ভঙ্গ', পৃষ্ঠা ৬২. ৬৩)

২০। 'ঢাকা প্রকাশ', ডিসেম্বর ২৭, ১৯০৩ (দ্রষ্টব্য 'বঙ্গভঙ্গ', পৃষ্ঠা ৬৩)।

www.amarboi.org

'ঢাকা প্রকাশ'-এর এই কণ্ঠ পূর্ববঙ্গের কণ্ঠ নয়, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কণ্ঠ তো নয়ই। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর কণ্ঠে ঢাকার কণ্ঠ নয়, কোলকাতার বাবু কণ্ঠ, শ্রুত হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দু প্রমুখের কণ্ঠ। সুতরাং 'ঢাকা প্রকাশ' ও তার মত বঙ্গভঙ্গবিরোধী কণ্ঠ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কোন দিক দিয়েই পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত হবার উপযুক্ত নয়।

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মাধ্যমে হিন্দু মনোভাব এক যুগান্তকরী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। বাংলাদেশের হিন্দু উত্থান রোধের লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবিভাগ হয়নি এটা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু হিন্দুরা তাদের শোষণ ক্ষেত্র পূর্ববঙ্গ হারানো, পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা, কোলকাতার পশ্চাৎভূমি থেকে পূর্ববঙ্গের খসে পড়া এবং রাজধানী ঢাকা ও বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামের বিকাশ লাভকে তারা বরদাশত করতে পারেনি। পারেনি বলেই হিন্দুরা একবাক্যে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় নেমে এল!

প্রথমেই মাঠে নামলেন 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক' বলে কথিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। উল্লেখ্য, কোলকাতা কেন্দ্রিক ভদ্রলোক (বাবুশ্রেণী) ও বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে কোন মুসলমান ছিলনা) জনমত গঠন ও তাদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করার প্রধান দায়িত্ব ও নেতৃত্ব সুরেন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন।[২১] ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত সরকারের সচিব রিজলীর বঙ্গবিভাগ সংক্রান্ত চিঠি প্রকাশ হবার সাথে সাথেই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তার কাগজ 'দি বেঙ্গলীতে লিখলেন, "বাংলাকে খণ্ডিতকরণের প্রস্তাবে আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আমরা নিশ্চিত যে গোটা দেশ একটা দেহের মত এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।"[২২] বাংলার জমিদার শ্রেণীর সংগঠন 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিবাদ সভা করল ১৯০৪ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে। এ প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করলেন উত্তর পাড়ার জমিদার, বেঙ্গল ও ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য প্যারীমোহন মুখার্জী। সভায় উপস্থিত ছিলেন নাটোরের জমিদারসহ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সীতানাথ রায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, প্রমুখ শীর্ষ হিন্দু ব্যক্তিত্ব। সভায় বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করে ভারত-সচিবের কাছে প্রেরিত স্মারক পত্রে বলা হলো, "বাঙ্গালী জাতিকে আলাদা আলাদা অংশে বিভক্তিকরণ এবং তাদের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভাষাগত বন্ধনে ভাঙ্গন সৃষ্টি অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করবে।"[২৩] ১৯০৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে বেঙ্গল চেম্বারস অব কমার্সের অনারারী সেক্রেটারী সীতানাথ রায় বাহাদুর এবং ১৯ শে মার্চ, এই সংগঠনের সেক্রেটারী ডাব্লিউ পার্সন আর তাদের সঙ্গে বৃটিশ ইন্ডিয়ান

২১। সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে দেখুন তার নিজের লেখা ঃ 'A Nation in the Making', Calcutta, 1925.

২২। 'The Bengalee', December 13, 1903.

২৩। Papers Relating to the Reconstitution of Bengal and Assam. London 190.

www.amarboi.org

এ্যাসোসিয়েশনের অনারারী সেক্রেটারী মহারাজ প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর ১৯ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে স্মারক লিপি পাঠান। এদের সাথে ভারতের শ্বেতাংগ চা ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী সংগঠন 'ইন্ডিয়ান টি এ্যাসোসিয়েশন', ক্যালকাটা বেলড জুট এ্যাসোসিয়েশন', 'ইন্ডিয়ান জুট মিলস এ্যাসোসিয়েশন' এবং 'ইন্ডিয়ান মাইনিং এ্যাসোসিয়েশন'-এর এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারীদের চিঠিও শামিল ছিল। এভাবে কোলকাতা ভিত্তিক জমিদার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী অর্থাৎ 'পাওয়ার এলিট'দের সকলে একজোট হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করল। এর সাথে এসে যুক্ত হলো প্রবল রাজনৈতিক বিরোধিতাও। ১৯০৫ সালের ১০ই জানুয়ারি কোলকাতা টাউন হলে এক সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গবঙ্গে বিরোধিতা করল। এরপর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোলকাতা টাউন হলের জনসভায় বৃটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাব পর্যন্ত গ্রহণ করা হলো। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের রণহুংকারে পরিণত হলো। ১৯০৫ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন কালিঘাটের বিখ্যাত কালি মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেয়া হলো।[২৪] এর দু'দিন আগে ২৪ ও ২৭ শে সেপ্টেম্বরের দুটি জনসভায় সভাপতির ভাষণে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ হিসেবে বঙ্গবিভাগ বাস্তবায়নের দিন ১৬ই অক্টোবর 'রাখীবন্ধন' দিবস ঘোষণা করলেন।[২৫]

অন্যদিকে মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে আনন্দ ও উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করল। উল্লেখ্য প্রাথমিক বিভ্রান্তির পর মুসলমানরা বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনাকে জাতির জন্য এক মহাসুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। বৃটিশ পার্লামেন্টের নেতা কেয়ার হার্ডিকে লেখা নবাব সলিমুল্লার এক চিঠির ভাষায় মুসলমানদের মনোভাব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। ঐ চিঠিতে সলিমুল্লাহ লিখেছিলেন, "আমরা বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করছি। এটা আমাদের উপকারে আসবে। এ ব্যাপারে সামান্য কোন সন্দেহও নেই বঙ্গবিভাগ মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করেছে এবং ফলস্বরূপ এখানে তারা গুরুত্ব লাভ করেছে। আমাদের স্বার্থকে এখানে যত্নের সাথে দেখা হবে। পুনর্গঠিত জেলা প্রশাসনের অধীনে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি উৎসাহ লাভ করছে। আগের ব্যবস্থায় এটা সম্ভব ছিলনা। কারণ প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুসারে যে মনোযোগ লাভের প্রয়োজন ছিল, তা আগের ব্যবস্থা দিতে পারেনি।"[২৬]

পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মুখপাত্র তখন ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ। বঙ্গভঙ্গের পক্ষ-বিপক্ষ আন্দোলনের কঠিন দিনে তিনি জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

২৪। 'বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৬।

২৫। 'বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৬।

২৬। 'Keir Hardie and the first Partition of Bengal M.K.U Mollah. Appendix B. Rajshahi University Studeis, vol, iii, January, 1970. Page 18.

www.amarboi.org

বঙ্গবিভাগের প্রথম বার্ষিকী হিন্দুরা উদযাপন করল 'জাতীয় শোক দিবস' পালনের মাধ্যমে। মুসলমানরা এদিন আনন্দ উৎসব করল বটে, কিন্তু তাদের কণ্ঠ ছিল দুর্বল। এই সময় একটা বড় ঘটনা ঘটল। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সবচেয়ে সোচ্চার কণ্ঠ মিঃ ফুলার পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। 'ফুলার হিন্দু নেতাদের তীব্রতম আক্রমণের শিকার ছিলেন। সরকারি সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণে তাঁর দৃঢ় প্রচেষ্টার জন্য তিনি তাঁদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। আন্দোলনের সংকটাপন্ন মুহূর্তে তার পদত্যাগের অর্থ ছিল আন্দোলনকারীদের জয় এবং সরকারের নতি স্বীকার। ফুলারের পদত্যাগের সরকারি সিদ্ধান্তে মুসলমানরা বিস্মিত হলো এবং একে রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব প্রসূত বলে অভিহিত করল। ফুলারের পদত্যাগ এবং হিন্দুদের ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে মুসলমানরা সতর্ক হলো এবং বাংলা বিভাগের প্রতি কংগ্রেসের হুমকি মোকাবিলার জন্য ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকায় একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন।'[২৭] নবাব সলিমুল্লার এ সম্মেলন আহ্বান ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই তিনি এ সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল একটি 'সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ' (The Mohamedan All India confederacy) প্রতিষ্ঠা। এই মুসলিম সংঘ প্রতিষ্ঠার পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল ঃ এক. তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিহত করা। দুই. মুসলমানদের উপযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না থাকায় যে সব মুসলিম যুবক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে, পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান গঠিত হলে তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের পরিচয় দেবার সুযোগ পাবে এবং তিন. মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতির কাজ করা।[২৮] নওয়াব সলিমুল্লার এ পরিকল্পনা তার শত্রুরা যথাসময়েই জানতে পারল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'দি বেঙ্গলী' সলিমুল্লাহর পরিকল্পিত মুসলিম সংঘকে বিদ্রূপ করে লিখল, "মুসলমানদের সর্বভারতীয় সংঘের পরিকল্পনা আমাদেরকে পূর্বের মারাঠা সংঘ ও বালমা সংঘের কথা স্মরণ করে দিচ্ছে। যখন তোষামোদের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন এই প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র, তখন নবাব কি জন্য এর এরূপ যুদ্ধংদেহী নাম রেখেছেন?"[২৯]

দি বেঙ্গলী নবাব সলিমুল্লাহ পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানকে বিদ্রূপ করলেও এই বিদ্রূপের মধ্যে তাদের ভয়ের ভাবটাই মুখ্য। তাদের এই ভীতিই নবাব সলিমুল্লার উদ্যোগের সঠিকতা প্রমাণ করেছিল।

নবাব সলিমুল্লাহ ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান গঠনের দিকে এগুচ্ছিলেন। এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যাপারে রাজশাহীর মোহাম্মদ ইউসুফ, কুমিল্লার নওয়াব আলী চৌধুরী, সিলেটের মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, ময়মনসিংহের আব্দুল হাই আখতার, বগুড়ার খন্দকার হাফিজ উদ্দীন, ধনবাড়ির নওয়াব আলী চৌধুরী

২৭। 'বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১০।

২৮। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', (নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ' অংশ) ইয়াসমিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৬৬, ১৬৭।

২৯। The Bengalee', December 16, 1906- ঐ।

www.amarboi.org

এবং বরিশালের এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ নওয়াব সলিমুল্লাহকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা দান করেন। এরা সকলেই সলিমুল্লার রাজনৈতিক জীবনের সহচর ছিলেন। এছাড়া ভারতের সব মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নওয়াব সলিমুল্লাহ তার পরিকল্পনার খসড়া পাঠিয়েছিলেন।

১৯০৬ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর ঢাকায় সম্মেলন বসল। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো নবাব সলিমুল্লাহর শাহবাগস্থ সুরম্য উদ্যানে। ভারতের সকল প্রদেশ ছাড়াও দেশের বাইরে থেকে প্রতিনিধি এ সম্মেলনে আসেন। প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি এসেছিলেন সম্মেলনে। প্রতিনিধিদের মধ্যে নবাব ভিখারুল মুলক, পাতিয়ালার খলিফা মুহাম্মদ হোসেন, হাকিম আজমল খান, লক্ষ্ণৌর রাজা নওশাত আলী খান, খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, মওলানা শওকত আলী, ভুপালের মৌলবী নিযামউদ্দীন, নবাব মুহসিনুল মুলক, ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ, অমৃতসরের রাজা মুহাম্মদ ইউসুফ শাহ প্রমুখ শীর্ষ মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছিলেন।

২৭ শে ডিসেম্বর থেকে ৩০ শে ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। শিক্ষা সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ঘোষণা করা হলো, মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশন শেষে এক বিশেষ সম্মেলনে মিলিত হবেন।

সে অনুযায়ী শাহবাগের সে বাগানেই বিশেষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হলো। নবাব সলিমুল্লার প্রস্তাবক্রমে নবাব ভিখারুল মুলক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন। সলিমুল্লার 'সর্বভারতীয় মুসলিম সঙ্ঘ' পরিকল্পনাকে ভিত্তি করেই আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। শুরুতেই সম্মেলনের সভাপতি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বললেন, "মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।' উদ্বোধনী বক্তব্য শেষে নবাব ভিখারুল মুলক স্যার সলিমুল্লাহকে তার পরিকল্পনা পেশ করতে বললেন। নবাব সলিমুল্লাহ তার পরিকল্পনা পেশ করতে উঠে দেশের পরিস্থিতি, মুসলমানদের জাগরণ এবং বর্তমান প্রয়োজন....বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি তার ঐতিহাসিক বক্তব্যের একাংশে বললেন,

"আপনারা বহু অসুবিধা সত্ত্বেও দেশের দূর অঞ্চল থেকে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে মিলিত হয়েছেন। এ মুহূর্তে আমাদের জন্য অধিকতর রাজনৈতিক তৎপরতার যে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে আমার বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যক নেই। দেশ ও সম্প্রদায়ের সাথে যাদের সম্পর্ক আছে তারা অবশ্যই অনুভব করেছেন যে, আমাদের জাতীয় জীবনে নবজীবনের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে এবং যে মুসলমানদের জীবন স্পন্দন এতদিন রুদ্ধ ছিল তাদের মধ্যেও আজ জাগরণের সাড়া পড়েছে।........ বিলাতের দলীয় সরকার ভারতে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। এই কারণে যারা বেশি চিৎকার করতে পারে, তাদের কথাই শোনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করে চলেছে। মুসলমানরা শান্ত-শিষ্ট থেকে কিছুই পায়নি। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কার্যকরী

www.amarboi.org

ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।......... প্রায় দশবছর আগে স্যার সৈয়দ আহমদ যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে সেরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আজকের পরিস্থিতিতে তাদের সামনে চারটি পথ খোলা আছে-- (ক) রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার কাজ সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়া, (খ) রাজনীতিতে নেমে হিন্দুদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করা, (গ) হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ্য দেয়া এবং তাদের কার্যকলাপে নিজেদের শরিক করা, এবং (ঘ) মুসলমানদের নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা। মুসলমানরা তৃতীয় পথ অনুসরণ করতে পারেনা, কারণ ১৮৮৭ সাল থেকে তারা কংগ্রেস থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মুসলমানরা দ্বিতীয় পথও অনুসরণ করেনি। মুসলমানদের পরম শত্রুও বলতে পারবেনা যে, মুসলমানরা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। ১৮৮৭ সাল থেকে মুসলমানরা প্রথম পথ অনুসরণ করে দেখেছে, কিন্তু রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় থাকায় তাদেরকে খুব অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। .... যুগধর্মের প্রেরণায় মুসলমানরা এক রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। বর্তমানে মুসলমানদের জন্য সক্রিয় প্রচারণা, তাদের দাবীদাওয়া ও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি ঘটানো এবং তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক 'রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণই তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হবে। এতে বৃটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের রাজভক্তি এবং প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের সদ্ভাব ব্যাহত হবেনা। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানরা প্রয়োজনমত তাদের দাবী-দাওয়া সরকারের নিকট উত্থাপন করবে। ...... ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন স্বার্থের ব্যাপারে কোনরূপ সংঘাতের সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তাদের মুখ্য স্বার্থের ব্যাপারে মতানৈক্য, দেখা দিতে পারে। মুসলমানদের পৃথক প্রতিষ্ঠান না থাকলে তাদের পক্ষে ন্যায্য অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবে না।"[৩০]

এরপর নবাব সলিমুল্লাহ তার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। হাকিম আজমল খান, জাফর আলীসহ আরও কয়েকজন প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ

"ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক এই সভায় 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা যাচ্ছে। নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধন করা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হবে।

(১) ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি রাজভক্তি উদ্রেক করা এবং সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হলে তা দূর করা।

(২) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার, স্বার্থ রক্ষা ও উন্নতির ব্যবস্থা করা।

(৩) সংস্থার উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলি অব্যাহত রাখা এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যাতে বিদ্বেষ সঞ্চার না হয় তার ব্যবস্থা করা।"[৩১]

৩০। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৬৯, ১৭০, ১৭১।

৩১। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৭১।

www.amarboi.org

ঢাকার এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হলো।

নবাব ভিখারুল মুলক ও নবাব মুহসিনুলমুলক অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের যুগ্ম-কর্ম সচিব নির্বাচিত হলেন। গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য গঠিত হলো ৬০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রোভিশনাল কমিটি।

অতপর নবাব সলিমুল্লাহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত ঘোষণা করলেন।

সম্মেলন শেষ হলো এবং সেই সাথে শুরু হলো মুসলমানদের এক ঐতিহাসিক যাত্রার। ১৮৬৩ সালে নওয়াব আব্দুল লতিফের হাতে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির মাধ্যমে নব পর্যায়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থানের যে চারাগাছ জন্ম লাভ করেছিল, সে গাছটি ১৮৭৮ সালে সৈয়দ আমির আলীর হাতে 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের' মাধ্যমে মাটিতে শেকড় প্রোথিত করে, সেই চারাগাছটিই ঢাকার শাহবাগ উদ্যানে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' এর মাধ্যমে মহীরুহের প্রকৃতি নিয়ে আকাশে মাথা তুলল। কংগ্রেসের মাধ্যমে এবং কংগ্রেসের আড়ালে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা যে ভয়াবহ ঝড় সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে মুসলমানদের বাঁচার জন্য এমন একটি মহীরুহের প্রয়োজন ছিল।

মুসলিম লীগ গঠন হিন্দুদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল তারা। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত 'দি বেঙ্গলী' মুসলিম লীগকে 'সলিমুল্লাহ লীগ' এবং 'সরকারের ভাতাভোগী' ও 'তাবেদারদের সমিতি' বলে কটাক্ষ করল।[৩২]

বলাবাহুল্য মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থানের প্রত্যেকটি পদক্ষেপই এদের দ্বারা নানা রকম কটাক্ষ ও প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছিল। ১৮৬৩ সালের 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' গঠন তাদের পছন্দ হয়নি। ১৮৭৮ সালের 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়শেন' গঠনকে তারা সাংঘাতিক বক্র দৃষ্টিতে দেখেছে। ১৮৮২-এর ইন্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট-এ মুসলমানরা মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের যে অধিকার লাভ তাদের মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল এবং তারা কংগ্রেসের মাধ্যমে আন্দোলন করে ১৮৯২ সালে তা বাতিল করে ছেড়েছিল। মুসলিম লীগ গঠনের তিন মাস আগে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগাখানের নেতৃত্বে নওয়াব মুহিসিনুলমুলক বিলগ্রামী, নওয়াব আলী চৌধুরী, এ, কে, ফজলুল হকসহ ভারতের ৩৫ জন মুসলিম নেতা সিমলায় ভাইসরয় মিন্টোর সাথে দেখা করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট দাবী পেশ করেছিলেন।[৩৩] এ দাবীগুলোর মধ্যে ছিল "(ক) সামরিক, বেসামরিক এবং

৩২। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৭২।

৩৩। বঙ্গ ভঙ্গের প্রশ্নটি সিমলা সম্মেলনে তোলা না তোলা নিয়ে মতান্তর হওয়ায় নওয়াব সলিমুল্লাহ সিমলা প্রতিনিধি দলে শামিল হননি। তবে সব দাবী দাওয়ার সাথে তিনি একমত ছিলেন এবং প্রতিনিধিদল লর্ড মিন্টোর জন্য নওয়াব সলিমুল্লার এক দীর্ঘ চিঠি নিয়ে যায়।

www.amarboi.org

হাইকোর্টে মুসলমানদের যথেষ্ট সংখ্যায় নিয়োগ, উচ্চ পদগুলোতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যতীতই নিয়োগের ব্যবস্থা, (খ) মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের নিশ্চয়তা প্রদান, (গ) জনসংখ্যার অনুপাতে নয়, তাদের রাজনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক কাউন্সিলে মুসলমানদের নির্বাচন, (ঘ) মুসলমানরা যাতে অগুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘুতে পরিণত না হয়, তার জন্য পৃথক নির্বাচনে ভিত্তিতে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমানের ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচন করা, এবং (ঙ) একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করা, যা হবে মুসলিম ধর্মীয় এবং বুদ্ধিগত জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ।"[৩৪] মুসলমানদের এই দাবী দাওয়া পেশকে সাংঘাতিক বিদ্বেয় দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। একে 'সাম্প্রদায়িক শো' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এর সংগঠক নাকি ছিল বৃটিশ ভারতীয় সরকার।[৩৫] এমনকি কংগ্রেস কর্মী শিবলী নোমানী পর্যন্ত বলেছিলেন, 'আমরা সিমলা ডেপুটেশনের কোন অর্থ বুঝিনা। সাম্প্রদায়িক মঞ্চে ছিল এটা সর্ববৃহৎ শো।"[৩৬] অথচ সিমলা ডেপুটেশন ইতিবাচক ফল ডেকে এনেছিল মুসলমানদের জন্য। সিমলা ডেপুটেশনের কাছে লর্ড মিন্টো মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের দাবী মেনে নেয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এই আশ্বাস কার্যকরী হয়েছিল ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে। এই সংস্কারে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেয়া হয়। মুসলমানদের এই সুবিধা লাভও হিন্দুদের প্রবল বৈরিতার সম্মুখীন হয়। ১৯০৯ সালেই কংগ্রেস তার এক প্রস্তাবে 'মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের ভারতীয় প্রজাদের মুসলিম ও অমুসলিম সংজ্ঞায় বিভক্ত করাকে অন্যায়, বিদ্বেষপ্রসূত ও অপমানকর বলে অভিহিত করে।'[৩৭] অর্থাৎ কংগ্রেস মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থান তো দূরে থাক, জাতি হিসেবে মুসলমানদের নাম পর্যন্ত বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। কারণ এই সে, জাতিহিসেবে মুসলমানদের নাম উচ্চারিত হলে, তাদের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি দিতে হয়। কংগ্রেস তা দিতে রাজী ছিলনা। সে চাইছিল, মুসলমানরা তাদের স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় অর্থাৎ বৃহত্তর হিন্দু জাতি দেহে লীন হয়ে যাক। বিস্ময়ের ব্যাপার, এসময় কংগ্রেসী মুসলমানরাও হিন্দুদের এ চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল। তারা হিন্দুদের মতই বিরোধিতা করছিল মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থান প্রচেষ্টার। কংগ্রেস নেতা হিসেবে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার মত লোকও মর্লি-মিন্টো সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। শুধু বিরোধিতা নয়, ১৯১০ সালে কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনের মর্লি-মিন্টো সংস্কারের উল্লেখিত পৃথক নির্বাচন ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব

৩৪। History of the Freedom Movement in India', By Tarachand, page 394 (বদরুদ্দীন ওমরের 'ভারতীয় আন্দোলন'- উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৮৬, ৮৭।

৩৫। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন ওমর, পৃষ্ঠা ৮৮।

৩৬। 'ইতিহাস অভিধান' (ভারত) যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৬৩।

৩৭। 'নেহেরু', মাইকেল এডওয়ার্ড পৃষ্ঠা ৪৩ ('স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১০৩, ১০৪)।

www.amarboi.org

ব্যবস্থার বিরোধিতা করে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তার উত্থাপক ছিলেন কায়েদে আযম এবং জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে যিনি এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন তিনিও একজন মুসলিম, বিহারের জননেতা মৌলভী মজহারুল হক।[৩৮] অবশ্য কংগ্রেসের স্বরূপ ধরতে এবং নিজেদের ভুল বুঝতে এই সব বিজ্ঞ মুসলমানের খুব বেশী দেরী হয়নি। যে জিন্নাহ মুসলমানদের স্বতন্ত্র অধিকার অর্জনের নিন্দা করে কংগ্রেসের সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, সেই জিন্নাহই মাত্র কয়েক বছর পর কংগ্রেস নেতাদের মুখের উপর 'আপনারা কি চাননা যে, মুসলিম ভারত আপনাদের সাথে এগিয়ে যাক, সংখ্যালঘুদের কি সংখ্যাগুরুদের দেবার মত কিছুই নেই?' বলে অশ্রুসজল চোখে কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।[৩৮-ক]

মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থানের যাত্রা ছিল সেদিন সত্যই অত্যন্ত কঠিন। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রচণ্ড বিরোধিতা, অন্যদিকে কংগ্রেসী কিছু মুসলমানের বাধা। এই দুয়ের মোকাবিলা করে সামনে এগুতে হয়েছিল উত্থানবাদী মুসলমানদের। মুসলিম লীগ গঠিত না হলে মুসলমানদের পক্ষে এই এগুনো সম্ভব হতো না। মুসলিম লীগ সে সময় যুদ্ধক্ষেত্রের পতাকার মত মুসলমানদের অস্তিত্ব, উপস্থিতি ও উত্থানের কথা ঘোষণা করছিল। নির্যাতিত মুসলমানরা জেগে উঠেছিল, সমবেত হয়েছিল একে কেন্দ্র করেই। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অশ্রু সজল চোখে কংগ্রেস থেকে বিদায় নিয়ে এসে শক্তিশালী করেছিলেন মুসলিম লীগকেই। সবচেয়ে বড় কথা, মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে মুসলমানরা একথা সোচ্চার কণ্ঠে বলে দিয়েছিল, ভারতে মুসলমান নামে একটা জাতি আছে যাদের অস্তিত্ব ও দাবী অস্বীকার করা যাবেনা।

মুসলিম লীগের প্রাথমিক বছরগুলো সংগ্রামের চেয়ে আত্মগঠনের সময় হিসেবে ব্যয়িত হলো। মুসলিম লীগের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো করাচীতে ১৯০৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। সভাপতিত্ব করলেন বোম্বাই এর স্যার আদমজী। এ সম্মেলনে গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করা হলো। এই ১৯০৮ সালেই নবাব মুহসিনুলমুলক মারা গেলেন এবং নবাব ভিখারুলমুলক আলীগড় কলেজের কর্মসচিব নিযুক্ত হওয়ায় মুসলিম লীগের কর্মসচিবের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলেন। ১৯০৮ সালের ১৮ মার্চে আলীগড়ে মুসলিম লীগের একটি বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এ সম্মেলনে আগাখান লীগের স্থায়ী সভাপতি এবং সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী মুসলিম লীগের কর্মসচিব নির্বাচিত হলেন। সৈয়দ আমীর আলী ১৯০৮ সালের ৬ই মে লন্ডনে মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯০৮ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতিত্ব করলেন সৈয়দ আলী ইমাম। এ সম্মেলনে লর্ড মর্লির প্রস্তাবিত সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয় এবং প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব ও সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের নিয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলিম লীগের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো দিল্লীতে ১৯১০ সালের ২৯ শে জানুয়ারি। সভাপতিত্ব করলেন আর্কটের যুবরাজ স্যার গোলাম মাহমুদ আলী খান। সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

৩৮। 'নেহেরু মাইকেল এডওয়ার্ড স্বাধীনতার অজানা কথা' বিক্রমাদিত পৃষ্ঠা ১০৩, ১০৪)

www.amarboi.org

বিলগ্রামী ভারত সচিবের ভারতীয় পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় এ সম্মেলন লীগের মহাসচিব নির্বাচিত করলো মৌলবী মুহাম্মদ আজিজ মির্যাকে। লীগের সদর দফতর আলীগড় থেকে লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত হলো। মুসলিম লীগের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন সৈয়দ নাজিবুল্লার সভাপতিত্বে ১৯১০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর নাগপুরে অনুষ্ঠিত হলো। লীগের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ১৯১২ সালের ৩রা মার্চ কোলকাতায় বঙ্গভঙ্গ রদের বিষাদময় পরিবেশে। এতে সভাপতিত্ব করলেন ভগ্নহৃদয় ও ভগ্নস্বাস্থ্য নবাব সলিমুল্লাহ। তিনি তার ভাষণে বেদনার সাথে পুনরুক্তি করলেন, 'বঙ্গভঙ্গ রদ, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মনে দারুণ আঘাত করেছে এবং তাদের ঘরে ঘরে করেছে বিষাদের সঞ্চার।' এই সাথে নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি ঘোষণায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন।'[৩৯] এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিন্দুদের বিরোধিতার তিনি তীব্র নিন্দা করলেন। নবাব সলিমুল্লাহ তার ভাষণে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ, বিশেষ সুবিধা এবং ব্যবস্থাপক সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দাবী করলেন। নবাব সলিমুল্লার ভগ্ন হৃদয়-উত্থিত এই কথাগুলোকে বিদায়কালীন বেদনার্ত এক আর্তির মত শোনাল। বঙ্গভঙ্গ রদে আহত নবাব সত্যিই বিদায় নিলেন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে। ভগ্নস্বাস্থ্য সলিমুল্লাহ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন জীবনের অবসরও তার ঘনিয়ে এল। ১৯১৫ সালে ১৬ই জানুয়ারি তিনি ইন্তিকাল করলেন। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু নির্যাতিত জাতিকে জাগিয়ে গেলেন।

অনেকে মুসলিম লীগের এই প্রথম পর্যায়কে ইংরেজ অনুগত অভিজাত ও জমিদার নবাব অধ্যুষিত বলে কটাক্ষ করেন।[৪০] কিন্তু ইতিহাস বলে, এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি আনুগত্য নিয়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ হয়েছিল। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ইংরেজের প্রতি যে আনুগত্য দেখিয়েছিল, সেটা ছিল সেই সময়ের বাস্তবতা। এই বাস্তবতা অস্বীকার করে হিন্দুদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সামনে এগুনো সম্ভব ছিলনা। যারা সেই সময়ের মুসলিম অভিজাত ও নবাব-জমিদারদের নেতৃত্বকে কটাক্ষ করেন, তারা হয় অজ্ঞ, নয়তো এক শ্রেণীর হিন্দুর মত বিদ্বেষ দৃষ্টিতে মুসলিম উত্থানের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করেন। বাস্তবতা হলো, মুসলিম অভিজাত, নবাব-জমিদাররাই তখন ছিলেন মুসলিম জনগণের নেতা এবং মুসলিম জনতার কণ্ঠ। তাদের নেতৃত্ব ছিল স্বাভাবিক, সময়ের দাবী। এ দাবী পূরণ করে তারা জাতিকে ধন্য করেছেন। আজকে পর্যালোচনায় দোষ-ত্রুটি হয়তো আমরা খুঁজে পাব, কিন্তু তাঁরা এগিয়ে না এলে মুসলিম লীগের মত সংস্থা গঠন এবং মুসলমানদের জাতীয় উত্থান কিছুতেই হয়তো সম্ভব হতোনা এবং হতো সম্ভব হতোনা বাংলাদেশের মত মুসলিম আবাস ভূমির প্রতিষ্ঠা।

৩৯। বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১২ সালের ৩১শে জানুয়ারি বড়লাট মুসলমানদের সান্ত্বনা দেবার জন্য ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং ২রা ফেব্রুয়ারি সরকার এক ইশতিহারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন।

৪০। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন,' বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ৯৭।

www.amarboi.org

পোপ, ক্রুসেডের পাপ ও পাশ্চাত্য

বিশ্বে আজ যখন মুসলিম ও পশ্চিমের মধ্যে এক অলিখিত ক্রুসেড (Clash of civilizations) চলছে, তখন পোপ জনপল অতীত ক্রুসেডের নিন্দা করলেন। তিনি সম্প্রতি বলেছেন, 'পবিত্র স্থান উদ্ধারের জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত।' পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করেছেন, ক্রুসেডের ৯০০ বছর পূর্তির মুখে পোপের এই বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের মতে এ উপলক্ষে পোপ মুসলমানদের কাছে ক্ষমাও চাইতে পারেন।

এ আশাবাদ হয়তো খুব বেশি। তবে ২০০ বছরব্যাপী পরিচালিত ক্রুসেডে খৃস্টান ইউরোপ যে পাপ করেছিল মানবতার বিরুদ্ধে, সে পাপের জন্য মানবতাবাদী বলে পরিচয়দানকারী ইউরোপ অনুতাপ-অনুশোচনা কিছু করতেই পারে। কারণ ইউরোপের অনেক ঐতিহাসিকেরও কলম কাঁপছে ইউরোপের সে পাপের বর্ণনা দিতে। ইউরোপের ক্রুসেডারদের মধ্যে ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড মহান ও সিংহদিল আখ্যা পেয়েছেন ইউরোপে। সেই রিচার্ড সম্পর্কে ইউরোপের ঐতিহাসিক কক্সবার্ট বলছেন, "গথ আলারিক, হুন এটিলা কখনও নিজেদেরকে সভ্য জাতির রাজা বলে প্রকাশ করেননি। কিন্তু কোন অর্থেই 'মানবজাতির চাবুক' আখ্যা লাভে রিচার্ড অপেক্ষা তাদের দাবী অধিক নয়।" জেরুজালেম দখলের পর খৃস্টানরা সে নগরীতে যে হত্যাকাণ্ড চালায় তার তুলনা শুধু ঐ হত্যাকাণ্ডই। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা লিখেছে, "ক্রুসেডারদের ধ্বংস ছিল কি ভয়াবহ। তাদের ঘোড়াগুলো হাঁটু রক্ত পাড়ি দিয়ে মসজিদে পৌঁছেছিল। শিশুদের পা ধরে দেয়ালে আঁছড়ে মারা হয়েছে।" অথচ হযরত ওমর যখন এই জেরুজালেমে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছিলেন, তখন একফোঁটা রক্তপাতও হয়নি। আবার গাজী সালাহউদ্দিন যখন ক্রুসেডারদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করেছিলেন; তখনও আল্লাহ আকবর ধ্বনি ছাড়া কোন হিংসাত্মক কথা বা কোন রক্তপাত সেখানে হয়নি। ইউরোপের খৃস্টান ক্রুসেডারদের বর্বরতা এবং মুসলমানদের মহানুভবতা ছিল অবিশ্বাস্য ধরনের এক কিংবদন্তীর মত। খৃস্টান ঐতিহাসিক স্টানলি লেন পুল স্বীকার করেছেন, "ক্রুসেডারদের নিষ্ঠুর ও কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের দোষস্খলনের কোন ওজরই কল্পনা করা যায় না। সালাহউদ্দিনের শৌর্যপূর্ণ সদয় ও সদাশয় কার্যাবলির পাশে ইংল্যান্ডাধিপতি ও ফরাসী রাজপ্রতিনিধিদের নিষ্ঠুরতা বিস্ময়কর বলে মনে হবে। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী মহাযুদ্ধে মুসলামানরাই যে সুসভ্যতা, সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা, মার্জিত আচরণ, প্রভৃতি যাবতীয় সদগুণের অধিকারী ছিল ক্রুসেডের পাঠকগণকে তা বলা নিষ্প্রেয়োজন।" এই ইতিহাস পাঠ করে আজকের ইউরোপের লজ্জা পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

www.amarboi.org

কিন্তু সবচেয়ে বেশি লজ্জা পোপ পাবার কথা। কারণ তার পূর্বসূরী পোপ ছিলেন দশ' বছরব্যাপী দীর্ঘ ক্রুসেডের গোড়ার লোক। ১০৯৫ সালের ২৯শে নভেম্বর খৃস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ আরবান দ্বিতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'হলি' ক্রুসেড শুরু করেন। 'পবিত্র' যুদ্ধের নামে তারা হত্যা ধ্বংসের উন্মত্ততা চালায় ১২৯১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। দু'শ' বছরব্যাপী এই পাপকাণ্ডের দায়িত্ব বর্তায় প্রধানত পোপের কাঁধেই। সুতরাং এর জন্য বেশি লজ্জা, বেশি দুঃখ, বেশি অনুশোচনা পোপ আরবান দ্বিতীয় এর উত্তরসূরী পোপ জনপলেরই হওয়া উচিত। মনে হয় এই বোধ থেকেই পোপ ক্রুসেডের সিদ্ধান্তটিকে ভুল বলে ঘোষণা করেছেন এবং তিনি যখন ক্রুসেডের ৯০০ বছর পূর্তির কাল দিনটির মুখোমুখি হবেন, তখন মুসলমানদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, যা পর্যবেক্ষকরা অনুমান করছেন, বিস্ময়কর কিছু হবে না।

তবে এ ক্ষমা প্রার্থনার চেয়ে আমাদের কাছে বড় হলো পাশ্চাত্যের গোটা খৃস্টান জগতের কাছে পোপ এ কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবেন যে, ক্রুসেড নামের আড়ালে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা কাহিনী রচনা করা হয়েছে, যত অপবাদ ছড়ানো হয়েছে, শত শত বছর ধরে যে আতংক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে সব মিথ্যা, সব ভুয়া।

এই ঘোষণা, এই স্বীকৃতি আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ ৯শ' বছর আগে যে ক্রুসেড ঘোষণা করা হয়েছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে ক্রুসেড এখনও চালানো হচ্ছে অন্য নামে, অন্যভাবে এবং এর জন্য বিস্ময়করভাবে দোষী করা হচ্ছে মুসলমানদেরকেই। হান্টিংটনদের লিখা যারা পড়েছেন, তারা জানেন কিভাবে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। আমার সাম্প্রতিক একটা অভিজ্ঞাতার কথাও এখানে বলি।

আমার সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের শেষ পর্যায়ে নিউইয়র্কে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব দা চার্চেস অব ক্রাইস্ট ইন দি ইউএসএ' এর অফিসে গিয়েছিলাম। আমাদের সফরের যে প্রোগ্রাম, তার অংশ হিসেবে সেখানে যাওয়া। সুতরাং প্রোগ্রামটা আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল। এই খৃস্টান সংস্থাটি আন্তঃধর্ম সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্যও কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার কো-ডাইরেক্টর বার্ট এফ ব্রেইনারের সাথে তাঁর অফিসে আমাদের দেখা হয়। সেখানেই নয়া ক্রুসেড বা যুদ্ধ সম্পর্কে কথা উঠে।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পর তাঁর সাথে আমাদের কাজের কথা শুরু হলো।

মিঃ ব্রেইনার তার কর্মজীবনের শুরু থেকেই একজন মিশনারী। আগে ইংল্যান্ডে কাজ করেছেন, এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দীর্ঘ তাঁর অভিজ্ঞতা। কিন্তু তিনি প্রথমেই বিস্ময়করভাবে যে কথা বললেন, তা হলো, মুসলমান তো পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তারা পশ্চিমকে এখন শত্রু ভাবছে। এই অবস্থায় সম্পর্কের উন্নয়ন বা আলোচনা ফলপ্রসূ কিভাবে হতে পারে?

www.amarboi.org

এই ধরনের প্রশ্ন দিয়েই তিনি তার বক্তব্য শেষ করলেন। তার চোখে-মুখে বেদনার ছাপ। অর্থাৎ তিনি অন্তর দিয়েই কথাগুলো বলেছেন। তার অর্থ, তিনি বিশ্বাস করেন মুসলমানরাই পশ্চিমের বিরুদ্ধে আজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং অন্যায়ভাবে মুসলমানদের শত্রু ভাবছে।

আমি মনে করি মিঃ ব্রেইনার তার এই বক্তব্য ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পশ্চিমের সাধারণ জনমতের প্রতিনিধিত্ব করেন। আর 'শত্রু' শব্দের এই ব্যবহার বোধহয় ঠিক নয়। 'শত্রু' শব্দের বদলে 'ভয়', 'অবিশ্বাস', 'বিক্ষুব্ধ', ধরনের শব্দ ব্যবহার করাই মনে হয় সংগত হতো।

তারপর তাকে বলেছিলাম, পশ্চিমকে ভয় করার, পশ্চিমকে অবিশ্বাস করার এবং পশ্চিমের উপর বিক্ষুব্ধ হবার মুসলমানদের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, আজকের পাশ্চাত্য মুসলিম ইষ্টকে শাসন ও শোষণের বেদনা তারা বলেনি। ভুলতে পারেনি পশ্চিমেরই কিছু দেশের কিছু ভূমিকার কারণে। উপনিবেশ তারা ছেড়ে দিলেও শক্তি, অর্থ ও বিজ্ঞান-টেকনোলজির জোরে তারা আধিপত্যবাদী হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখে মুসলিম দেশগুলোর উপর। আরেকটি কারণ বলেছিলাম, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি ইস্যুতে পশ্চিম কার্যত হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, নয়তো পশ্চিমের কারণেই সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি অথবা সমাধান বিলম্বিত হয়েছে। স্লোভেনিয়া সার্বদের মধ্যে তিন সপ্তাহ এবং ক্রোশিয়া সার্ব যুদ্ধ তিন মাসের বেশি চলতে দেয়া হয়নি, অথচ বসনিয়ার যুদ্ধ সাড়ে তিন বছরেও শেষ হচ্ছে না। এই জ্বলজ্যান্ত ঘটনাগুলো পশ্চিমের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অবিশ্বাস বাড়াচ্ছে এবং বিক্ষুব্ধ করে তুলছে তাদেরকে। শেষ যে কারণটির কথা আমি মিঃ ব্রেইনারকে বলেছিলাম, সেটা মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমী কিছু এনজিও এর ভূমিকা নিয়ে। দারিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ করে সাহায্যের নামে তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে। মূলত এসব কারণই পশ্চিমের প্রতি মুসলমানদের ভয়, অবিশ্বাস এবং বিক্ষুব্ধতার জন্য দায়ী।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই কারণগুলো প্রকৃত অর্থে কোন কারণ নয়, বরং কারণ থেকে সৃষ্ট ফল। কিছু সৃষ্ট কারণেরই ফল এগুলো। এবং এ কারণগুলোর স্রষ্টা পশ্চিম। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক আধিপত্য, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন ও বসনিয়ায় মুসলিম স্বার্থের প্রতি বৈষম্য দৃষ্টি এবং এনজিও বাহিনীর যথেচ্ছাচার সৃষ্ট সে কারণগুলোর জন্য পশ্চিমই দায়ী।

সুতরাং মুসলমানরা পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি কিংবা পশ্চিমাদের শত্রুও বানায়নি। বরং পশ্চিমের প্রতি মুসলমানদের যে ভয়, অবিশ্বাস এবং বিক্ষোভ তার সৃষ্টি পশ্চিমই করেছে।

www.amarboi.org

পূর্ব-পশ্চিম বা মুসলিম ও পাশ্চাত্যের এ সংঘাতে মুসলমানদের অবস্থান সম্পূর্ণভাবেই আত্মরক্ষামূলক। আমি আমার এ কথাগুলো মনে হয় মিঃ ব্রেইনারকে কিছুটা বুঝাতে পেরেছিলাম। তিনি পশ্চিমের শোষণ, আধিপত্য এবং বর্তমান বৈষম্য দৃষ্টির কথা স্বীকার করে বলেছিলেন, এর জন্য কিছু শাসক দায়ী, পশ্চিমের জনগণ নয়।

আমিও তার সাথে একমত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পশ্চিমী ঐ জনগণের সাথে মুসলমানদের যে ভুল বুঝাবুঝি তা দূর করবে কে? এবং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ও সমঝোতার সেতুবন্ধন রচনা করার দায়িত্ব কে নেবে?

আমার মনে হয়, খৃস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ এবং মিঃ ব্রেইনারের সংস্থার মত পশ্চিমের সংগঠনগুলো এ দায়িত্ব নিতে পারে। এদের সাথে যদি মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতির প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম দেশভিত্তিক ইসলামী সংগঠনগুলোর অব্যাহত যোগাযোগের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাহলে দুই জাতি, দুই সভ্যতা পরস্পরের কাছাকাছি আসা সম্ভব।

আমার মনে হয় পোপ ক্রুসেডের নিন্দা করে এই সম্ভাবনাময় নতুন এক ইতিহাসের যাত্রা পথের সূচনা করেছেন। সাতশ' বছরের পুরানো ক্রুসেডের নিন্দা করে তিনি কার্যত পশ্চিম ও মুসলমানদের চলমান 'ক্রুসেডকেও নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এ কথা তিনি প্রকাশ্যে বলেননি, স্পষ্টতঃ বলেননি। তিনি বলেননি যে, ৯শ' বছর আগে ক্রুসেড ঘোষণা করে খৃস্টানরা যে ভুল করেছিল, বর্তমান মুসলিম-পশ্চিম সংঘাতের জন্য মুসলমানদের দায়ী করে খৃস্টান পশ্চিম সে ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করছে এবং মুসলানদের অসহায় আত্মরক্ষার প্রয়াসকে আক্রমণ বলে তারা ভুল করছে।

আমি মনে করি পোপের এ কথা বলার সময় এখনও যায়নি। এ বছর ২৯শে নভেম্বর মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সেই ভুল ও অন্যায় ক্রুসেড ঘোষণায় ৯ শ' বছর পূর্তি হচ্ছে। এই কালো দিন খৃস্টান পাশ্চাত্য আত্মসমালোচনার এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে পারে। পোপ এবং পশ্চিম তাদের অতীত ও বর্তমান ভুল শোধরানোর ঘোষণা দিয়ে এই মুহূর্তকে এক নতুন ইতিহাসের মাইল-স্টোনে পরিণত করতে পারেন।*

---

* প্রবন্ধটি ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে লিখিত

www.amarboi.org

পশ্চিমের তথ্য-সম্রাজ্য

'গ্লোবাল ইনফরমেশন এন্ড ওয়ার্ল্ড কম্যুনিকেশন' বিষয়ক আলোচনায় একজন সমাজবিজ্ঞানী আজকের জটিল জীবন কাঠামোর একটা ছক এঁকেছেন। ছকের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইনফরমেশন এবং কম্যুনিকেশন। তার চারদিকে রয়েছে সমাজ, রাজনীতি, শিল্প ও অর্থনীতি। আর এসব কিছুকে ঘিরে সাংস্কৃতিক প্রতিবেশের বৃত্ত। এর অর্থ আজকের আধুনিক জীবন কাঠামোর কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ইনফরমেশন এবং কম্যুনিকেশন। অন্য কথায় ইনফরমেশন কম্যুনিকেশন নিয়ন্ত্রণ করছে আজকের গোটা জীবন কাঠামোকে।

ইনফরমেশন এবং কম্যুনিকেশনের ক্ষেত্রে গত এক যুগে এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন শুধু আঙ্গিক এবং প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, সংস্কৃতির বিস্তার ও বিন্যাসে এর ভূমিকা নতুন যুগের সূচনা করেছে। আজকের ইনফরমেশন এবং কম্যুনিকেশনের মত গণমাধ্যম নিছক মাধ্যমের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশের সজ্ঞান ও সক্রিয় অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। রেডিও, ভিডিও, ক্যাসেট, টেলিভিশন প্রভৃতি আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে বিরাট অংশ কেড়ে নিচ্ছে। যেমন-আমাদের বাংলাদেশেই প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা সময়ের ১৪ ঘণ্টাও বেশি সময় নিয়ে যাচ্ছে টেলিভিশন। এর মধ্যে গড়ে দুই তৃতীয়াংশ সময় নিয়ে যাচ্ছে বিদেশী প্রোগ্রাম।

এই শেষোক্ত দিকটা খুবই উল্লেখযোগ্য। ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চিমী দুনিয়া আজ গোটা দুনিয়ায় রাজত্ব করছে। শাসন, শোষণ ও বাণিজ্য সবই তারা করছে। পশ্চিমা দেশগুলোর রেডিও এবং টেলিভিশন প্রচার মাধ্যম বিশ্বের মোট রেডিও ওয়েভ লেংথের শতকরা ৯০ ভাগ এবং পশ্চিমা প্রধান নিউজ এজেন্সীগুলো প্রতিদিন মোট নিউজের শতকরা ৮০ ভাগের মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রচারিত এই নিউজের শতকরা সর্বোচ্চ পঁচিশ ভাগ উন্নয়নশীল দেশ সংক্রান্ত। এই হিসাব সিএনএন এবং বিবিসি টেলিভিশন বর্তমান পর্যায়ে আসার আগের। সুতরাং সিএনএন এবং বিবিসি টিভি বিশ্বজোড়া প্রচার শুরু করার পর অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে।

পশ্চিমের 'তথ্য' ও 'সংবাদ' আজ তাদের অতি লাভজনক পণ্যে পরিণত হয়েছে। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো এই পণ্য চড়া দামে কিনে থাকে। প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে এ মূল্য আমরা দিচ্ছি। সিএনএন এবং বিবিসি'র স্টার টিভি'র মূল্য আমাদের কোন কোন দেশকে হয়তো এখন খুব উচ্চহারে দিতে হচ্ছে না, কিন্তু অভ্যাসটা গড়ে নেবার পর সে উচ্চমূল্য তারা হাঁকবে। তাছাড়া নগদ মূল্যের বাইরে সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি-অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে চড়া মূল্য আমরা দিচ্ছি তা আরও মারাত্মক।

www.amarboi.org

বস্তুত ইনফরমেশন এবং কম্যুনিকেশনের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো আজ পশ্চিমা শিল্পোন্নত দুনিয়ার আগ্রাসনের শিকার। এ আগ্রাসনের রূপ সার্বিক। তাদের প্রচার মাধ্যম আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই এক ধ্বংসকারী হস্তক্ষেপে রত রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রচার বা গণমাধ্যমগুলো পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের আগ্রাসনের মুখে ক্ষতিগ্রস্ত ও সংকুচিত হচ্ছে। এমন এক সময় আসছে যখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর শান্তি, শৃঙ্খলা, জনমত গঠন, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ সবই গিয়ে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের হাতে গিয়ে বাধা পড়বে। তখন আমাদের ভালোকে তারা মন্দ করবে, আমাদের মন্দকে তারা ভালো দেখাবে। এইভাবে তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ ষোলআনা আদায় করে নেবে আমাদের কাছ থেকে। কয়েকদিন আগে বিবিসি টেলিভিশনের প্রোগ্রামে ভারতের মিজোরাম রাজ্যকে 'খ্রিস্টান স্টেট' বলে উল্লেখ করা হলো। বলা হল সেখানে শতকরা ১০০ ভাগই খৃস্টান। সম্ভবত বাসিন্দাদের ১০০ ভাগ খৃস্টান বলেই মিজোরামকে 'খৃস্টান স্টেট' বলা হয়েছে। অথচ মিজোরাম খ্রিস্টান স্টেট নয়। এটা এক ধরনের উস্কানি। মিজোরামে খৃস্টান আগমনের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিবিসি'র টিভি অনুষ্ঠান অনেকটা সময় ব্যয় করেছে যা বিবিসি বা সিএনএন উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোন ভাল দিক দেখানোর জন্য মোটেই করে না। অবশ্য সময় দেয়, কিন্তু সে সময়টা দেয় আমাদের মত দেশের দারিদ্র্য, সংঘাত, কু-সংস্কার ইত্যাদি খারাপ জিনিস প্রদর্শনের জন্য।

অবস্থা এমন হবে, সেটা অনেক আগেই বোঝা গিয়েছিল। এজন্যই এখন থেকে প্রায় দুই যুগ আগে 'নিউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন এন্ড কম্যুনিকেশন অর্ডার' এর দাবী উঠেছিল উন্নয়নশীল বিশ্বের পক্ষ থেকে। এ প্রেক্ষিতেই জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কো ম্যাকব্রাইড কমিশন গঠন করে। স্বাধীন ও ভারসাম্যপূর্ণ সংবাদপ্রবাহ নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমঝোতা জোরদার করার লক্ষ্যে নতুন, সুবিচারপূর্ণ ও অধিকতর কার্যকর নিউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন এন্ড কম্যুনিকেশন অর্ডার' সুপরিশ করার জন্য এ কমিশনকে দায়ীত্ব দেয়া হয়। কমিশনের বিবেচনার মধ্যে যে বিষয়গুলো ছিল তা হলো, (১) রেডিও ওয়েভ লেংথ-এর বরাদ্দ পরীক্ষা করে দেখা এবং সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা, (২) উপগ্রহের যুক্তিযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে একটা চুক্তি সম্পাদন করা, (৩) পশ্চিমী নিউজ সরবরাহের মূল্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য হ্রাস করা, (৪) পশ্চিমী দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে টেকনোলজির স্থানান্তর অবাধ করা, (৫) সংবাদ বিনিময় ব্যবস্থায় অর্থ সাহায্যের জন্য একটা বিশেষ তহবিল গঠন করা যাতে করে উন্নয়শীল দেশগুলোতেও সময়ানুগ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ সম্ভব হয় এবং (৬) উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও স্বাধীন নিউজ এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা। যা নিয়ন্ত্রণমুক্ত তথ্য সরবরাহের বিস্তার ঘটাবে, জাতীয় সংরক্ষণবাদিতার বদলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করবে, বড় বড় তথ্য মাধ্যমের

www.amarboi.org

একচ্ছত্র প্রভুত্বের জায়গায় ছোট মাধ্যমগুলোর প্রতিযোগিতা শক্তি বাড়িয়ে তাদের সামনে নিয়ে আসবে এবং তথ্য সরবরাহে সরকারী হস্তক্ষেপই একে বহুমুখী করে তুলবে।

কিন্তু 'নিউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন এন্ড কম্যুনিকেশন অর্ডার' গড়ে তোলার জন্য গঠিত ম্যাকব্রাইড কমিশন কাজ করতে পারেনি। তাকে কাজ করতে দেয়া হয়নি। শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলো নতুন তথ্য ব্যবস্থার দাবীর মধ্যে তাদের তথ্য সাম্রাজ্যবাদের পতন দেখতে পেয়েছিল। তাই তারা বিশ্ব তথ্য ব্যবস্থায় এই নতুন ধারণাকে গাঁজাখুরি (Mere a fiction) বলে অভিহিত করল এবং চাপ দিল ইউনেস্কোকে এই উদ্যোগ পরিত্যাগের জন্য। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হলো পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে ইউনেস্কোর। সেই সময় ইউনেস্কোর ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন সচেতন ও সাহসী একজন আফ্রিকান মুসলিম। তিনি পশ্চিমা দুনিয়ার দাবীর কাছে মাথা নত করেনি। এমনকি বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কো পরিত্যাগের হুমকি দিলেও নয়। অবশেষে সত্যিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ইউনেস্কোতে চাঁদা দেয়া বন্ধ করে দেয় এবং সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। এসব ডামাডোলের মধ্যে ম্যাকব্রাইড কমিশন অকেজো হয়ে পড়ে। ইউনেস্কোর সেই সাহসী ডাইরেক্টর জেনারেলও তার পদ হারান। এইভাবে নিউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন এন্ড কম্যুনিকেশন অর্ডার'-এর অপমৃত্যু ঘটে যেমন অপমৃত্যু ঘটেছিল ঠিক এই সময়েই 'নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক অর্ডার' -এর দাবীর।

ম্যাক ব্রাইড কমিশন ব্যর্থ হয়েছে, উন্নয়নশীল বিশ্বের দাবী অনুযায়ী 'নতুন বিশ্ব তথ্য ব্যবস্থা' প্রণীত আর হয়নি। তবে নতুন তথ্য ব্যবস্থা দুনিয়ায় এসেছে, তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়নও হয়েছে আকাশস্পর্শী। কিন্তু নতুন তথ্য ব্যবস্থা এবং এর আকাশ স্পর্শ উন্নয়ন পশ্চিমা দুনিয়ার সাথে উন্নয়নশীল দুনিয়ার প্রায় গোটা 'টাইম এন্ড স্পেস' কেই দখল করে নিয়েছে। নিউজ এজেন্সীর ক্ষেত্রেও ওদেরই একাধিপত্য। প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রেও গোটা দুনিয়া ওদের বাজার। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার তথ্য রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছে আজ দুটি পক্ষ ঃ'Have' and Have not'- একপক্ষ সর্বস্বের অধিকারী, আরেক পক্ষ সর্বস্বহারা।

আধুনিক জীবন কাঠামোতে 'ইনফরমেশন কম্যুনিকেশন' যেখানে কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়ের গতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করছে, সেখানে এই ক্ষেত্রে পশ্চিমা দুনিয়ার হাতের পুতুল হওয়ার অর্থ পশ্চিমের সার্বিক উপনিবেশে পরিণত হওয়া। উন্নয়শীল বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা গড়িয়ে গড়িয়ে এদিকেই যাচ্ছে। সেদিন আসছে. যখন আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি শুধু নয় এবং আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব শুধু নয়, আমাদের নিজ জনগণের চিন্তা-চেতনাকেও ওরা নিয়ন্ত্রণ করবে ওদের বিশ্বজোড়া ও সার্বক্ষণিক ইলেট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়া সাম্রাজ্যের সীমাহীন শক্তির মাধ্যমে।

www.amarboi.org

এই উদ্বেগজনক দিক নিয়ে এক সময় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছিল, কিন্তু জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সেই আগের সুদিন নেই বলে তার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব বলে মনে হয় না। মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ইসলামী সম্মেলন সংস্থাও এ নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং এখনও করছে। ১৯৮৮ সালে মুসলিম দেশগুলোর তথ্যমন্ত্রীগণ জেদ্দায় মিলিত হয়ে সমন্বিত তথ্য-কৌশল ও সহযোগিতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে এ বিষয়টি নিয়ে আরও চিন্তা-ভাবনা ও সুপারিশ তৈরির জন্য একটা সাব কমিটি গঠন করা হয়। এই সাব কমিটি ১৯৮৯ সালের ২১শে অক্টোবর তাদের আলোচনা পর্যালোচনা পর যে সুপারিশমালা পেশ করে তার মধ্যে রয়েছে ঃ

(এক) ইসলামী তথ্য-কৌশল গ্রহণ, ইসলামী তথ্য-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সংস্কারের জন্য একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে।

(দুই) সাব-কমিটি কর্তৃক মুসলিম বিশ্বের তথ্য-মাধ্যমের সমন্বয়-সংযোগ, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সহযোগিতার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করার জন্য ওআইসি সেক্রেটারী জেনারেলকে অনুরোধ করা হয় ঃ

(১) যোগাযোগ উন্নয়নমূলক প্রজেক্ট গ্রহণ।

(২) ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়ের খরচ হ্রাসকরণ।

(৩) ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের ১৫তম বৈঠিকে গৃহীত 'ইসলামিক টেলি-কম্যুনিকেশন ফেডারেশন' সম্বন্ধীয় 'এ্যাক্ট' কে অনুমোদন দান।

(তিন) নিম্নলিখিত তথ্য বিষয়ক ইসলামী সংস্থাকে সহায়তা দান ঃ

(১) ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক নিউজ এজেন্সী (IINA)।

(২) ইসলামিক স্টেটস ব্রডকাস্টিং অর্গানাইজেশন (ISBO)।

(চার) 'ইসলামিক ইনফরমেশন চার্টার অব অনার' প্রণয়ন করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও তথ্য সংক্রান্ত আরো ছয়টি সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

এই সুপারিশগুলো হয়তো আজ যা প্রয়োজন, তার সবগুলো পূরণ করে না। তবু এ সুপারিশমালা কার্যকরী হলে বিশ্বে তথ্য জগতে একটা শক্তির উত্থান ঘটতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য কিছু অগ্রগতি ছাড়া উল্লেখ করার মত কিছুই মুসলিম বিশ্ব করতে পারেনি। সবচেয়ে জরুরী বিষয় ছিল 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক নিউজ এজেন্সী' এবং 'ইসলামিক স্টেটস ব্রডকাস্টিং অর্গানাইজেশন' সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে লজ্জাজনক ব্যর্থতা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা প্রকাশেরও অযোগ্য। ১৯৮৬ সালে জেদ্দাস্থ ইসলামিক নিউজ এজেন্সীর অফিসে আমরা যাবার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম রয়টার, এফপি

www.amarboi.org

এ,পি'দের বিস্তার যখন ক্রমবর্ধমান, তখন IINA তার কাজ গুটিয়ে ফেলেছে কেন। উত্তরে জানলাম, একমাত্র সউদি আরব ছাড়া ইসলামিক নিউজ এজেন্সীকে দেয় চাঁদা অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্র পরিশোধ করেনি। ফলে টাকার অভাবে বিশ্বব্যাপী যে নিউজ নেটওয়ার্ক তারা গড়ে তুলছিল তা গুটিয়ে ফেলতে হয়েছে। যা টাকা তারা পাচ্ছে তার ভিত্তিতে যতটুকু কাজ করার, তারা তা করছে। ইসলামিক স্টেটস ব্রডকাস্টিং এর ব্যাপারেও এই একই কথা। মক্কা ভিত্তিক 'ভয়েস অব ইসলাম' নামে ব্রডকাস্টিং স্টেশন গঠিত হয়েছে, তার 'ভয়েস' আমরা শুনতে পাই না। অথচ এই 'ভয়েস অব ইসলাম' এবং ইসলামিক নিউজ এজেন্সী আজ পশ্চিমী সিএনএন, বিবিসি, এবং রয়টার, এপি, এএফপি'র পাশাপাশি বিশ্বে স্থান লাভ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি এই কারণে যে, মুসলিম দেশগুলো এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলোর জাতীয়ভাবেও সাধ্য নেই যে, তারা সিএনএন, বিবিসি, রয়টার, এপি, এএফপি'র, মোকাবিলা করে।

সুতরাং সংগত কারণেই আজ আমরা পশ্চিমী তথ্য সাম্রাজ্যবাদের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছি। অসহায় বলছি এই কারণে যে, আমাদের আকাশকে যে সিএনএন এবং বিবিসি এর কাছে খুলে দিয়েছি তা অসহায় হওয়ার কারণেই। একদিকে তাদের প্রস্তাব আমাদের কাছে আদেশ যা অস্বীকার করার সাধ্য আমাদের নেই, অন্যদিকে আমাদের কাছে সিএনএন ও বিবিসি'র কোন বিকল্প নেই। অবশ্য আমাদের অসহায়ত্বকে ঢাকা দেবার জন্য আমাদের সরকারী কর্মকর্তাগণ বলছেন যে, তথ্যের 'অবাধ গতি'র প্রতি শ্রদ্ধাবশতই তারা এটা করেছেন। এটা যে দুর্বলের অসহায় আত্মতৃপ্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই আত্মতৃপ্তি 'ইনফরমেশন এন্ড কম্যুনিকেশন' এর মত এমন একটি বিষয় নিয়ে যা আমাদের আধুনিক জীবনের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের গোটা জীবনকেই প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে। সাবধান না হলে এই আত্মতৃপ্তি আমাদেরকে এক নয়া উপনিবেশবাদের অক্টোপাশে ঠেলে দিতে পারে। যে উপনিবেশবাদ আজ 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' এর মোহনীয় পোশাক পরে সামনে এগুচ্ছে যার বাম হাতে আছে 'মুক্ত বা বাজার অর্থনীতি' এবং ডান হাতে আছে ছক কাটা এক 'গণতন্ত্র' এবং মাথায় আছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংবলিত বিশাল 'তথ্য-শক্তির সাম্রাজ্য!

www.amarboi.org

নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার বিকল্প

মানব জীবন আজ বিশ্ব ইতিহাসের পালাবদল চিহ্নিত এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতনের পর ইউরোপের শিল্প বিপ্লব এবং রেনেসাঁ যে মতবাদগুলোর জন্ম দিয়েছিল এবং ধর্মের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল, তার আজ বিদায় ঘটছে। মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বিলোপ, দূর পাল্লার কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র হ্রাস চুক্তি স্বাক্ষর, সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট ব্লক ও কমিউনিজমের পতন, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান এবং সোভিয়েত মার্কিন সহযোগিতার নতুন যাত্রা সংঘাত বিমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ এক বিশ্বের অবয়ব আমাদের সামনে তুলে ধরছে। কিন্তু তার পাশেই আমরা আবার পালাবদলের ওপরে নতুন সংঘাতের বীজ উপ্ত হয়ে উঠতে দেখছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন রাজনৈতিক বিন্যাসের অধীনে এমন একটা শান্তি ও সহযোগিতার বিশ্ব আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু তিরিশের মন্দা সবই ওলট পালট করে দিয়েছিল। বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ যতটা না রাজনৈতিক, তার চেয়ে বেশি ছিল অর্থনৈতিক। কথাটা মিথ্যে নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস লীলা ছিল আজকের শিল্পোন্নত বিশ্বের সমৃদ্ধির বুনিয়াদ। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনমূলক মার্শালি পরিকল্পনা ছিল পশ্চিমী পুঁজির জন্য এক সঞ্জীবনী শক্তি। আমি মনে করি ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর আজকের আপাত শান্তির বিশ্বটা ধীরে ধীরে এক অর্থনৈতিক যুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে। তিরিশের মন্দা আর কেউ চায় না। চায়না বলেই বাঁচার চেষ্টা, পুঁজির রক্ষার চেষ্টা এক অর্থনৈতিক যুদ্ধ অপরিহার্য করে তুলবে। আর এ অর্থনৈতিক যুদ্ধ সংঘটিত হবে রাজনৈতিক সংঘাতের মোড়কে। এ রাজনৈতিক সংঘাত হবে ঠাণ্ডা যুদ্ধের চেয়েও বিস্তৃত ও জটিলতর এবং দীর্ঘতরও। ঠাণ্ডা যুদ্ধের বিপরীত পক্ষে ছিল কমিউনিজমের আদর্শ। আর ভাবী সংঘাতের এক পক্ষে থাকবে ইসলামের আদর্শবাদ যা পতনের শেষ তল থেকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর মতো মুজাদ্দিদদের চেষ্টায় আজ শুধু পুনরুজ্জীবিত নয়, ভাবী আদর্শিক লড়াই-এর যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সে সমর্থ হয়ে উঠছে। বিশ্ব-রাজনৈতিক অঙ্গনের এ মতবাদিক লড়াইয়ের বিপরীত পক্ষে থাকবে কে? অনেকেই আসতে পারে। তবে মুখ্য পক্ষ হিসাবে আসছে পুঁজিবাদের চৌকিদার তথাকথিত 'লিবারেল ডেমোক্রেসী' নামক নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা যার নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা একটি সংযুক্ত পশ্চিম।

আমার এই মেরুকরণের মধ্যে আঁৎকে ওঠার মতো কিছুই নেই। পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ইসলামের দাবি পূরণে অক্ষম মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক পতনের পর রাজনৈতিকভাবে বিজয়ী শোষণ-নিপীড়নমুখী খ্রিস্ট ধর্মকে

www.amarboi.org

সরিয়েই আজকের উদারনৈতিকতাবাদের পোশাক পরা ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র-তত্ত্বের উত্থান, যার গোড়ায় রয়েছে নিরেট বস্তুবাদ। নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে আমাদের আলোচনা আমরা আধুনিক ইতহাসের এ আদি পর্ব থেকেই শুরু করতে পারি।

আধুনিক যুগের যাত্রালগ্ন অর্থাৎ অষ্টদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় গির্জার অধীন স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা জটিল ও অসহনীয় আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। চতুদর্শ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও স্বাধীন জ্ঞান চর্চার অপরাধে যাজকতন্ত্র পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে আরোহণকারী মুসলিম সভ্যতার শিখা তখন নির্বাপিত প্রায়। উল্লেখ্য, ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১ শ' খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সকল শাখায় মুসলমানদের একক বিচরণ ছিল। ১১ শ' খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩ শ' ৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব মসলমান ও ইউরোপের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে। ১৩শ' ৫০ খ্রিস্টাব্দের পর মুসলমানরা হারিয়ে যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে থেকে। পঞ্চদশ শতকের শেষে স্পেন মুসলামানদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবে যায় মুসলিম বিশ্ব। এ কারণেই খৃস্টান চার্চের অধীনে রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রের মাধ্যমে যে অসহনীয় আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার সমাধানে ইসলাম কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। কিন্তু সমাধান তো অবশ্যই একটা চাই। মানুষের জাগরিত চেতনা এর গতিশীল কর্মস্পৃহা সমস্যা বুকে আঁকড়ে বসে থাকতে পারে না। তাই হয়েছে। যাজকতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এসেছে উদার নৈতিকতাবাদ। ওরা এসে যুক্তি ও বস্তুর বাইরের সবকিছুকে অস্বীকার করল। ধর্মকে আবদ্ধ করলো চার দেয়ালের মধ্যে। উদার নৈতিকতাবাদ থেকে জন্ম হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। ইউরোপের উদারনৈতিকতাবাদের সয়লাব গোটা পৃথিবীতেই বইল। তবে এ প্রভাব আফ্রিকা ও এশিয়ার ইউরোপীয় কলোনীগুলোতে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হলো তারা স্বাধীন হবার পর। বিপুল সংখ্যক মানুষ উদার নৈতিকতাবাদের ভালো দিকের, যেমন গণতন্ত্রের চেয়ে ধর্মহীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, বস্তুবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিই গ্রহণ করলো বেশি।

উদার নৈতিকতাবাদের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন বস্তুবাদী সমাজচিন্তা এবং পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা একটা পরিবর্তন আনল বটে, কিন্তু মানুষের আর্থ সামাজিক সমস্যার জটিলতা দূর করতে পারলো না। বরং স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বাধীন পুঁজি গঠনের নামে পুঁজিবাদী শোষণকে উৎকট করে তুলল। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে এল সমাজবাদ এবং কমিউনিজম। পুঁজির স্বাধীনতা হরণ শুধু নয়, সবার হাত শূন্য করে সব পুঁজি নিয়ে গিয়ে জমা করা হলো রাষ্ট্রের হাতে। পুঁজির স্বাধীনতা হরণের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল স্বাধীনতা হরণ করা হলো। পেট ভরানোর নামে মানুষের গলায় পরানো হলো সার্বিক

www.amarboi.org

পরাধীনতার শৃঙ্খল। কিন্তু পেট ভরলো না মানুষের বরং রেশন দোকানে লাইন দেয়ার মতো অব্যাহত নানা দুর্ভোগে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সব মিলিয়ে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট দেশগুলোতে ঘটল প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণ। তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়ল কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য।

পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়নের প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছিল সমাজবাদ ও কমিউনিজম। সমাজবাদ ও কমিউনিজমের শোচনীয় ব্যর্থতার পর আবার সকলে আজ পুঁজিবাদেই প্রত্যাবর্তন করছে। অবশ্য এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর আমলের সেই অন্ধ ও শোষণধর্মী পুঁজিবাদ এখন নেই। শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্মেষের ফলে পুঁজিবাদ অনেক কল্যাণধর্মী হয়ে উঠেছে। তবু পুঁজিবাদী শোষণ-বঞ্চনার তুলনায় এ কল্যাণ অনেক নগণ্য। উন্নয়ন ও সম্পদের স্বর্গভূমি বলে কথিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যায় ও অশুভ প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভিশাপ মাথায় নিয়ে প্রতি বছর শত শত কৃষি ফার্ম ও ডজন ডজন ব্যাংক দেউলিয়া হচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সম্পদের জৌলুস ও উন্মাদনার আড়ালে ক্ষুধার্তের কান্না নিদারুণভাবে চাপা পড়ছে। ইসলাম ছাড়া এদের এ কান্না মুছাবার আর কেউ নেই এ দুনিয়ায়। তবে পুঁজিবাদ আজ শুধু এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই নয়, পুঁজিবাদ আজ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তির মালিক। মুক্ত অর্থনীতির নামে, বাজার অর্থনীতির নামে, গণতন্ত্রের নামে, মানবতার নামে পশ্চিমী রাষ্ট্রশক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তির সুবিধা নিয়ে এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার জন্য আজ ছুটে আসছে। এ সাম্রাজ্যবাদের নাম দিয়েছে তারা নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা।

এ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যান্ড করপোরেশনের সাবেক গবেষক এবং মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অন্যতম পলিসি প্ল্যানিং স্টাফ ঐতিহাসিক ফ্রান্সিস ফকুয়ামা তাঁর বিশ্বজোড়া বহুল আলোচিত প্রবন্ধ "The End of History' তে 'লিবারেল ডেমোক্রেসি' বলে অভিহিত করেছেন। এ লিবারেল ডেমোক্রেসিকে তিনি সামনের পৃথিবীর একমাত্র জীবন ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত লিবারেল ডেমোক্রেসির পথকে কুসুমাস্তীর্ণ মনে করেন না, কিন্তু তাঁরা একে আজকের পৃথিবীর আদর্শ জীবন ব্যবস্থা বলেই মনে করেন। ফ্রান্সিস ফকুয়ামার মতে কমিউনিজমের পতনের সাথে সাথে লিবারেল ডেমোক্রেসির প্রতিদ্বন্দ্বী সব ব্যবস্থা পদ্ধতিই শেষ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিজয় প্রমাণ করছে যে, পশ্চিমা উদার নৈতিকতাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সব ব্যবস্থাই আজ খতম হয়ে গেছে।' শুধু তাই নয়, তিনি বলছেন,"What we may be witnessing is not just the end of the cold war, or the passing of a particular period of post war history, but the end of history as such, that is, the end point of mankinds ideological evolution and the universalization of Western Liberal democracy" অর্থাৎ "আমরা যে

www.amarboi.org

সময়টা দেখছি তা শুধু ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি কিংবা যুদ্ধোত্তর ইতিহাসের অপস্মৃতিই নয়, আমরা দেখছি ইতিহাসের সমাপ্তি। অন্য কথায় আমরা দেখছি মানবজাতির আদর্শিক বিবর্তনের শেষ প্রান্ত সীমা এবং দেখছি পশ্চিমী লিবারেল ডেমোক্রাসির বিশ্বজনীনতা।" ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা এখানে মানুষের সকল আদর্শিক চাহিদার সমাপ্তি টেনে সব ধর্মের বিকল্প হিসেবে লিবারেল ডেমোক্রেসিকে পেশ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, ধর্মের ব্যর্থতার পটভূমিতেই যেহেতু উদার নৈতিকতাবাদের জন্ম এবং সেহেতু ধর্মকে পরাজিত করেই উদার নৈতিকতাবদের উত্থান, তাই ধর্ম কোনভাবেই উদার নৈতিকতাবাদের বিকল্প হতে পারে না। অবশ্য ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ইসলামকে গণনার মধ্যে এনেছেন, কিন্তু তাঁর মতে লিবারেল ডেমোক্রেসির বিকল্প হবার মতো বিশ্বজনীনতা ইসলামের নেই। তিনি বলেছেন, "In the contemporary world only Islam has offered a theocratic state as a political alternative to both liberalism and communism. But the doctrine has little appeal for non-Muslims and it is hard to believe that the movement will take any universal significance." অর্থাৎ "আজকের সমসাময়িক বিশ্বে একমাত্র ইসলামই কমিউনিজম ও উদার নৈতিকতাবাদের রাজনৈতিক বিকল্প হিসেবে ধর্মরাষ্ট্রের রূপরেখা পেশ করেছে। কিন্তু অমুসলিমদের কাছে এ আদর্শের খুব কমই গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং এটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন যে, এ আন্দোলনটির কোন বিশ্বজনীন তাৎপর্য আছে।" এ উক্তি শুধু ফুকুয়ামার নয়, পশ্চিমের পণ্ডিতরা সাধারণভাবে এটাই আজ মনে করছেন। এভাবে তারা এ উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে লিবারেল ডেমোক্রেসি এবং এর অঙ্গ হিসেবে মুক্ত অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদ বিশ্বজয় করতে যাচ্ছে এবং ধর্মসহ অন্যসব ব্যবস্থার ইতি ঘটছে।

লিবারেল ডেমোক্রেসির এ পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতরা আমার মতে এখনও অষ্টাদশ শতকে দাঁড়িয়েই বিশ্বটাকে অবলোকন করছেন। সেসময় উদার নৈতিকতাবাদকে তারা যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, ধর্মকে যেভাবে অবলোকন করেছেন এবং সমাজের যে রূপ তখন তাদের সামনে ছিল, এখনও তারা এ সব কিছুকে সেই দৃষ্টিতে দেখছেন। এখন প্রশ্ন হলো, বিশ্বের কাছে বিশেষ করে পাশ্চাত্য জনগণের কাছে কথিত ঐ উদার নৈতিকতাবাদ এবং ধর্ম কি সেই আগের অবস্থায় এখনও আছে? এর সহজ উত্তর, না সে অবস্থায় নেই। আসলে পাশ্চাত্যের ফুকুয়ামা টাইপ পণ্ডিতরা তাদের সমাজের দিকে তাকান না। তাকালেও দেখেন আকাশস্পর্শী প্রাসাদ, তার ভেতরের মানুষ কেমন তা দেখেন না। তাঁরা দেখেন পোশাকের চাকচিক্য, ফ্যামিলি বাজেট, বাজার দর, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তাঁরা উঁকি দেন না। উঁকি দিলে তাঁরা দেখতেন, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত গির্জা যে নির্যাতন করেছে তার সীমা ছিল মানুষের দেহ পর্যন্ত, কিন্তু তথাকথিত উদারনৈতিকতাবাদের নির্যাতন মানুষের হৃদয়-মনকেই নিঃশেষ করে দিয়েছে। উদার নৈতিকতাবাদ সৃষ্ট এক একটি মানুষ আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, শেকড়হীন জড় পদার্থ

www.amarboi.org

যেন তারা। তাদের বর্তমানটা হতাশায় ভরা, তাদের ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই। সব হারিয়ে তারা এখন অতীতমুখী। ব্যাস্তববাদী উদারনৈতিকতার শোষণে নিমজ্জিত থেকে অতীতের স্মৃতিচারণের মধ্যে আজ তারা সান্ত্বনা খুঁজছে। ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স মনিটর-এ 'One-man Search for values' শীর্ষক নিবন্ধে জেন ফিলিপ লিখছেন, "You hear a lot of talk about American values these days. A lot of reference to the 'good old days' when you could trust people, to that by gone era when you could rely on the quality of American products, look to the media for enriching entertainment, have friends over for a game of charads and lively conversation. 'People just don't care any more' is phrase as common as apple pie. 'People never think about anyone but themselves' or 'People don't even go out anymore they are all home, glued to the tube' are observations frequently heard in casual conversation" মিঃ জেন-ফিলিপ আমেরিকানদের মানস-সন্ধানে আমেরিকার পথে-প্রান্তরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন মানুষকে জীবন, জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে। উত্তর যা পেয়েছেন তা এই ঃ 'I don't know answer to that, no one's ever asked me before, how would I know?' আমেরিকান জীবন সম্পর্কে জেন ফিলিপ এর উপসংহার ঃ 'Americans are living in a society. Where people have stopped asking each other question that matter. Where days, and weeks can pass and even family member's don't know what each other is thinking or feeling. Where conversations about their beliefs, their dreams and their fears are preempted by a superficial pop culture. How do they form their conscience on social issues without mingling their thoughts with others, listening for distinctions, streching their opinion? How do they sustain their relationships when they bring so little of themselves to the table?

আমেরিকার এ জীবন চিত্র গোটা পশ্চিমের। বস্তুবাদী উদারনৈতিকতা মানুষের বহিরাঙ্গ পালিশ করে ভেতরের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। অর্থ-পরিচয়হীন জীবনের ভারে তারা আজ কুব্জ। তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ যেমন ঋণের ভার বাড়িয়ে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করছে, তেমনি পাশ্চাত্য মানুষ আজ তাদের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সমস্যার পাকে তলিয়ে যাচ্ছে। কুমারী মাতার উদ্বেগজনক হার কমাতে গিয়ে তারা স্কুলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণের দোকান খুলছে। হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার মোকাবিলা করতে গিয়ে

www.amarboi.org

তারা ড্রাগসেবী হয়ে নিজেদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এভাবে বস্তুবাদী উদারনৈতিকতা যখন পাশ্চাত্য মানবতাকে ধ্বংস করছে, যখন পাশ্চাত্যের মানুষ সিন্দাবাদের এ ভূতকে ঘাড় থেকে নামানোর পথ তালাশ করছে, তখন ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বস্তুবাদী উদারনৈতিকতা তথা লিবারেল ডেমোক্রেসিকে দুনিয়ার জন্য সর্বরোগ হরা মহৌষধ সাজাচ্ছেন। এই জন্যই বলছিলাম এঁরা অষ্টাদশ শতকে দাঁড়িয়েই আজও সবকিছু অবলোকন করেছেন।

তাঁরা যাই বলুন আসলেই বস্তুবাদী উদারনৈতিকতার দিন শেষ হয়ে গেছে ঠিক কম্যুনিজমের মতই। জাপানের কিয়োটস্থ 'ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর জাপানিজ স্টাডিজ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল এবং আজকের জাপানের সবচেয়ে সম্মানিত দার্শনিক তাকেশি উমেহারা পশ্চিমী উদারনৈতিকতাবাদের মৃত্যুপথ যাত্রার খবর দিয়ে বলছেন, "Modernism has already played itself out in principle. Accordingly, societies that have been built on modernism are destined to collapse. Indeed, the total failure of Marxism warped side current of modernist society was only the preecursor to the collapse of western liberalism, the main current of the modernity. Far from being the alternative to failed marxism and the reigning ideology at the end of history', liberalism will be next domino o fall. Modernism as world view is exhausted and now even constitutes a danger to mankind ..." অর্থাৎ 'আধুনিকতা নীতিগতভাবে ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ফলশ্রুতি হিসেবে আধুনিকতার উপর ভিত্তি করে যে সমাজ বিনির্মিত হয়েছে তারও ধ্বংসের আয়োজন সম্পূর্ণ। আধুনিক সমাজেরই একটা অংশ মার্ক্সবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা পশ্চিমী উদারনৈতিকতাবাদেরও মৃত্যু ঘণ্টা ধ্বনিত করেছে। কথিত 'ইতিহাসের সমাপ্তি পর্বে' ব্যর্থ মার্কসবাদ ও অন্যান্য বহমান আদর্শের বিকল্প হওয়ার অনুপযুক্ত উদারনৈতিকতাবাদের পতন পরবর্তী ইস্যু হিসেবে সামনে আসছে। বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে আধুনিকতাবাদ ফুরিয়ে গেছে এবং এমনকি এখন তা আজ মানবতার জন্য বিপজ্জনক।"

কম্যুনিজমের সাথে সাথে বস্তুবাদী উদারনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার এ ব্যর্থতা, পাশ্চাত্য সমাজের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি এবং সেই সাথে সাধারণভাবে ধর্মীয় আদর্শবাদের উত্থান প্রমাণ করছে বিশ্ব ব্যবস্থা এক বড় রকমের পালা বদলের মুখোমুখি। তথাকথিত উদারনৈতিকতাবাদ, অন্য কথায় ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষতাবদী গণতন্ত্র ও সমাজ চিন্তার অক্টোপাস থেকে মুক্তি লাভের জন্য মানবতা আজ আর্তনাদ করছে। এখন প্রশ্ন হলো, বিপজ্জনক এ মতবাদের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য কে এগিয়ে আসবে? কোন মতবাদ নেতৃত্ব দেবে সামনের পৃথিবীকে? এক কথায়

www.amarboi.org

এর উত্তরঃ পৃথিবীর সর্বশেষ খোদায়ী জীবন বিধান এবং আজকের পৃথিবীতে অক্ষতভাবে অবশিষ্ট একমাত্র ধর্ম ইসলামই যোগ্যতা রাখে এ সংকট থেকে মানবতাকে মুক্ত করার।

জাপানি দার্শনিক তাকেশী উমেহারাও বলছেন, 'প্রাচ্য দেশীয় কোন জীবন বিধানই পারে বিশ্ব-মানবতাকে রক্ষা করতে। তবে তাঁর মতে সে জীবন বিধানটি হলো কনফুসীয় ও বৌদ্ধ মতবাদপুষ্ট বিশেষ ধরনের সমন্বয়বাদী এক জাপানি ধারণা।' তিনি বলছেন, "The new principles of the coming post modern era will need to be drawn primarily from the experience of non-western cultures, especially ancient japanese civilization." কিন্তু দার্শনিক তাকেশী উমেহারা বস্তুবাদী উদারনৈতিকতাবাদ শোষিত আজকের মানবতার সমস্যাকে যতটা সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, ততটা সীমিত নয়। উদারনৈতিকতাবাদের বিকল্প হিসেবে মানবতার মুক্তির জন্য দরকার একটা পূর্ণাঙ্গ মতবাদের যা মানুষকে দেবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ আত্ম-পরিচয় সংকটের মত মৌলিক সমস্যার সমাধান। বৌদ্ধ ও কনফুসীয় ধর্মপুষ্ট কিছু সামাজিক বিধি পূর্ণাঙ্গ মতবাদের এ দাবি পূরণ করতে পারে না, পারে একমাত্র ইসলাম। এ সত্যের স্বীকৃতি এমনকি উদারনৈতিকতাবাদীরাও অনেকে দিচ্ছেন। Godfrey Hansen তার ' .Moslems and the modern world প্রবন্ধে লিখছেন, "Today Islam and the Modern western world confront and challenge each other, no other majore religion possess such challenge to the west. Not Christianity, which is a part of the western world and which has been eaten up from within by the acids of the modernity. Not Hinduism and Buddhism, because their rediation to the west has been and is on high ethereal plan. And not judaism, which is too small and tribal a faith. Not guru, no swami, no lama, no rabbi has had any impact on the west comparable to that exerted by the caliph, the Mahdi, and Ayatullah or by the that stereotype haunting the western imagination." অর্থাৎ ইসলাম ও আধুনিক পশ্চিমী দুনিয়া আজ পরস্পর মুখোমুখি এবং একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করছে। আর কোন ধর্মই পশ্চিমের প্রতি এমন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়নি। খ্রিস্টধর্ম কোন চ্যালেঞ্জ হয়নি, কারণ খ্রিস্টধর্ম নিজেই পশ্চিমী দুনিয়ার অংশ এবং আধুনিকতার গ্রাস তাকে ভেতর থেকেই শেষ করে ফেলেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মও চ্যালেঞ্জেই আসে না, কারণ তা এক ক্ষুদ্র গোত্রীয় ধর্ম। 'খলিফা', 'মাহদি', 'আয়াতুল্লাহ' প্রভৃতি শব্দ পশ্চিমী চিন্তাধারাকে যেভাবে আলোড়িত করে সে তুলনায় 'গুরু' 'স্বামী' লামা' 'রাব্বি' কোন গুরুত্বই বহন করে না।"

www.amarboi.org

আজকের বিশ্বের উদারনৈতিকতাবাদী শোষণের একমাত্র বিকল্প যে ইসলাম, তার কারণ উদারনৈতিকতাবাদ তার ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বংসকারী জীবাণু দিয়ে মানুষের দেহে যে ব্যাধির সৃষ্টি করেছে, তাকে শুধু ইসলামই সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারে। আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগে আজকের ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের দিকনির্দেশক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী লিখেছিলেন,

"Contemporary civilisation takes democracy to mean sovereignty of the people, that is the collective will of the people in their own area is absolute and independent. This will is not, in the final analysis, subservient to the law, but the law is subject to its desire. And the only duty of the government is that its administration should be utilised to fulfil the collective desires of the people. Now consider: first, secularism freed these people from the fear of God and the grip of eternal principles and turned them into uncontrolled worshippers of self. Then nationalism stupified them with the intoxicant of national selfishness, blind prejudice and national pride. And now this democracy gives total authority of law making to the desires of the unrestrained, intoxicated worshippers of the self and declares the achievement of the objectives desired by these people as a whole to be the only purpose of the government. The question is in what way will the condition of the independent sovereign nation be different from that of a hoodlum. Whatever a hoodlum would do on a small scale if he were independent and strong, would be done on a much larger scale by a nation of this type. Then if the world contains not merely one such nation but all the advanced nations have organized themselves on the lines of secularism, nationalism and democracy, is it surprising that the world resembles a wilderness in which wolves howl, hunt and kill? (Islami neizam aur maghribi la dini Jamhuriat' page 19,20)" মাওলানা মওদুদী এখানে গণতন্ত্রের নামে মানুষের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দেয়ার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, আজকের সভ্যতার ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ মানুষকে স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী এক অনিয়ন্ত্রিত শক্তিতে পরিণত করেছে, যার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ উচ্ছৃঙ্খল এক বন্য সমাজের পত্তন হওয়া।

www.amarboi.org

আজ বিশ্ব সমাজের যে চিত্র আমরা দেখছি তা মাওলানার এ কথার নিখুঁত প্রতিফলন। ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতায় দীক্ষিত এবং স্বার্থবাদী জাতীয়তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চিন্তায় উজ্জীবিত 'আধুনিক মানুষ' প্রকৃত অর্থে পশুতে পরিণত হয়েছে। মানুষ তার পরিচয় ভুলে গেছে। মানুষের এ পরিচয় সংকটই আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা, এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় ব্যাধি। এ ব্যাধির নিরাময় শুধু ইসলামেই রয়েছে। ইসলামের এই নিরাময় ব্যবস্থা আর কিছু নয় 'মানুষ কে' তা মানুষকে জানিয়ে দেয়া এবং মানুষ হিসেবে তার যে লক্ষ্য, সে লক্ষ্যে তাকে উজ্জীবিত করা। মানুষের এ পরিচয় এবং তার এ লক্ষ্যই তার জীবন দর্শন তথা সমস্ত কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। মাওলানা মওদুদী লিখছেন, "এ দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা কি? দুনিয়া বস্তুটা কি? এই দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? মানুষ এ দুনিয়াকে ভোগ ব্যবহার করবে কিভাবে?-জীবন দর্শন সম্পর্কিত এ প্রশ্নগুলো এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে মানব জীবনের তামাম ক্রিয়াকাণ্ডের ওপরেই এগুলো গভীরভাবে প্রভাবশীল। দুনিয়ায় মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? মানুষের এত ব্যস্ততা, এত প্রয়াস প্রচেষ্টা, এত শ্রম মেহনত, এত দ্বন্দ সংগ্রাম কিসের জন্য, কোন অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের ছুটে চলা উচিত? কোন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার জন্য আদম সন্তানের চেষ্টা সাধনা করা কর্তব্য? কোন পরিণতির কথা মানুষের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি প্রয়াস-প্রচেষ্টায় স্মরণ রাখা উচিত? এই লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষাগত প্রশ্নই মানুষের বাস্তব জীবন ধারাকে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে আর তার অনুরূপ কর্মপদ্ধতি ও কামিয়াবীর পন্থা জীবনে অবলম্বিত হয়ে থাকে।"

সুতরাং মানুষের পরিচয় এবং জীবনের লক্ষ্যগত সংকট দূর হলেই বস্তুবাদী উদারনৈতিকতা মানবতার দেহে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার নিরাময় হয়ে যাবে। ব্যাধিমুক্ত মানুষ তখন অবহিত হবে এই দুনিয়াটা আল্লাহর সাম্রাজ্য এবং তারই কুদরত ও শক্তিমত্তার প্রকাশ। এখানে মানব জাতি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত। এখানে মানুষের যা আছে, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে অর্পিত আমানত। এ আমানতের জন্য একদিন মানুষকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীনে তাঁর শেষ রাসূল মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে প্রেরিত আল কুরআনের আদেশ-নিষেধ মোতাবেক মানুষকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। এ মৌল শিক্ষা-প্রশিক্ষণই মানুষকে মানুষে পরিণত করবে এবং তাকে বর্তমান সভ্যতা সংকট থেকে মুক্ত করে তার ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করবে।

আজকের বিশ্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো পেটের সমস্যা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজিত বৈষম্য ও বঞ্চনার সমস্যা। কেউ থাকছে সাত তলায়, কেউ থাকছে গাছ তলায়, কেউ খাদ্য অপচয় করছে কাঁড়ি কাঁড়ি, কেউ থাকছে অভুক্ত-এই সমস্যা

www.amarboi.org

দুনিয়ায় আজ প্রকট। এই সমস্যা পুঁজিবাদের সৃষ্ট, কিন্তু সমাজবাদ বা কমিউনিজমেও এই সমস্যার কোন সমাধান নেই, তথাকথিত লিবারেল ডেমোক্রেসির কাছের তো নেই-ই। এ ক্ষেত্রেও দুনিয়ার মানুষের কাছে ইসলামই একমাত্র বিকল্প।

এই বিকল্প নিয়ে কয়েকটা কথা বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করতে চাই।

অত্যন্ত স্বাভাবিক পথে ইসলাম আজকের মানব সমাজে বিরাজিত অর্থনৈতিক বৈষম্য বঞ্চনা যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে। হালাল হারামের বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবৈধ পুঁজি ও সম্পদের উৎস বন্ধ করে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কমপক্ষে চল্লিশভাগ দূর করা যেতে পারে। কেউ একে আকাশচারী চিন্তা বলতে পারেন, কিন্তু বাস্তবেই এটা সম্ভব। এরপর অপরিহার্য জাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে বৈষম্যের আরও বিশভাগ দূর করা যেতে পারে। ধনীদের খরচের উপর ইসলাম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ইসলামি বিধান অনুসারে সম্পদ কেউ অব্যবহৃত কিংবা আংশিক ব্যবহৃত রাখতে পারবে না। অব্যবহৃত অথবা আংশিক ব্যবহারের কারণে হযরত বেলাল (রা)-এর বাগান হযরত ওমর (রা) বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। সম্পদ থাকলেই কেউ এর অপচয় করবে বা বিলাসিতায় ব্যয় করবে এ অধিকারও ইসলাম কাউকে দেয়নি। এ ধরনের কাজ যারা করে তাদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে। নিশ্চয় কোন মুমিনই শয়তানের ভাই হতে চাইবেন না। খরচের উপর এই সব নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালীদের হাতে সম্পদের অধিকতর সঞ্চয় ঘটবে। বিধান অনুসারে এই সম্পদ বিত্তশালীরা ফেলে রাখতে পারবে না, বিনিয়োগ করতে হবে। সম্পদের এই ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আয় বণ্টনের পরিধি বাড়বে। তাছাড়া শুধু বিনিয়োগ নয়, জমে উঠা সম্পদের একটা অংশ বিত্তশালীদের ফি-সাবিলিল্লাহ খাতেও ব্যয় করতে হবে। 'প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে কোন মুসলমান পেট পুরে খেতে পারে না' এই নীতি অনুসারে এবং "করজে হাসানা'র বিধান মতে বিত্তশালীদের হাত থেকে আরও একটা বড় অংশ বিত্তহীনদের হাতে চলে যাবে। এইভাবে খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, ফি-সাবিলিল্লাহ খাতে খরচ ও করজে হাসানার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বড় একটা অংশ, ধরা যাক সেটা ১০ ভাগ, কমানো যেতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি, বিধানগত উপায় এসব দায়িত্বানুভূতির দিকগুলো কাজে লাগিয়ে এইভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য আমরা ৩০ ভাগে নামিয়ে আনতে পারি। ইসলামি সমাজে এ বৈষম্যটুকুও শেষে থাকবে না। হযরত ওসমান (রাঃ) এর মতো জাহেলী যুগের অনেক ধনী ব্যক্তি ইসলামি সমাজে অবশেষে ধনী থাকতে পারেননি। আবার ইসলামি সমাজে গরীব থাকাও কঠিন। দেখা গেছে মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্র এক সময় জাকাত নেয়ার মত লোক ছিল না। মোট কথা ইসলামি সমাজে ধনী থাকা যেমন কঠিন গরিব থাকাও তেমনি কঠিন। এইভাবেই ইসলাম অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়ে অর্থনৈতিক বঞ্চনামুক্ত এক সুন্দর ও শান্তিময় সমাজের জন্ম দেয়।

www.amarboi.org

উপসংহারে বলতে চাই, মানব জীবন আজ বিশ্ব ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তথাকথিত ইউরোপীয় রেনেসাঁ ধর্মের বিকল্প হিসেবে যে মতবাদগুলোর জন্ম দিয়েছিল তার আজ অবসান ঘটছে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে যে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, যা গোটা দুনিয়াকেই গ্রাস করবে বলে এক সময় মনে হয়েছিল, সেই কমিউনিজম আজ তার স্বভূমিতেই বিধ্বস্ত। কমিউনিজমের যমজ ভাই পুঁজিবাদ অব্যাহত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েও নিজেকে আজ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ প্রমাণ করেছে। অন্যদিকে মুসলমানদের পতনের পর উপনিবেশবাদের যে কালোছায়া গোটা দুনিয়াকে গ্রাস করেছিল তার রাজনৈতিক রাহুগ্রাস থেকে পৃথিবী আজ মুক্ত। উপনিবেশবাদের প্রতিভূ হিসেবে দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন দুই জোটের ভাগ করে খাওয়ার ঠাণ্ডা যুদ্ধ পৃথিবীকে যন্ত্রণা দিয়ে এসেছে চারদশক ধরে। কিন্তু কমিউনিস্ট পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এই ঠাণ্ডা যুদ্ধেরও আজ অবসান ঘটিয়েছে। মস্কোসহ পশ্চিমী শক্তিগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আজ এককভাবে লাঠি ঘুরাচ্ছে দুনিয়ায়। তাদের লাঠি ধরা হাতে শক্তি আছে বটে, কিন্তু মাথা তাদের শূন্য, হৃদয় তাদের দেউলিয়া। কোন আদর্শের যৌক্তিক কোন বুনিয়াদ তাদের জীবনে আজ নেই। তারা যে উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও মুক্ত অর্থ নীতির শ্লোগান দেয়, তাকে নিদেনপক্ষে সরকার ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থার কাঠামো বলা যেতে পারে, জীবন নিয়ন্ত্রণকারী সার্বিক কোন আদর্শ তা নয়।

অতএব মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতনের পর পশ্চিমা যে মতবাদগুলো ইসলামের স্থান দখল করতে চেয়েছিল, সে সব মতবাদ আজ ব্যর্থতা বরণ করে পেছনে হটে যাচ্ছে। আজ আদর্শের ময়দান প্রকৃত অর্থে শূন্য। মহানবী (সঃ)-এর আদর্শের বিশ্বব্যাপী উত্থান আজ সময়ের ব্যাপার মাত্র। 'মৌলবাদ', 'মধ্যযুগীয়' ইত্যাদি বলে এর দিক থেকে কেউ চোখ বন্ধ করে রাখতে পারেন, তাতে এই বাস্তবতার কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের H. Haddad- এর মতো খ্রিস্টান চিন্তাবিদ পর্যন্ত আজ স্বীকার করছেন, "Thus Islam is posited as the only viable vision of a better world order. This (Islamic) religious literature is modern in idiom as as well content, it takes the twentieth century seriously. Those who denigrate reivalists and relegate them to the Dark Ages, the Middle Ages or the seventh century, are at best completely mising the dynamics of the relevance of religion for modern life, or at worst, purposefully ignor the new developments in the

www.amarboi.org

content and meaning of various Islamic doctrins." (Islamic Awakening' in Egypt, ASQ, Volume 9, Number 3; page 255) অর্থাৎ 'এইভাবে ইসলাম উৎকৃষ্টতর একক এক বিশ্ব ব্যবস্থার আস্থাশীল রূপরেখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইসলামি সাহিত্য ভাষা এবং বিষয় সবদিক থেকেই আধুনিক যা সাংঘাতিকভাবে বিশ শতকের। যারা ইসলামি পুনর্জাগরণবাদীদের গাল দেয় এবং তাদেরকে অন্ধকার যুগ, মধ্যযুগ অথবা সপ্ত শতকের মানুষ বলে অভিহিত করে, তারা আধুনিক জীবনে ধর্মের সাজুয্যতা ধরতে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হন অথবা ইসলামের বিভিন্ন মতবাদের অর্থ ও বিষয়ে যে উৎকর্ষতা এসেছে তা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই উপেক্ষা করেন।'

ইসলামের সত্য এইভাবে সূর্যের মত সকলের কাছে দেদীপ্যমান হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে উট পাখিদেরও চোখ খুলবে, কুম্ভকর্ণদেরও ঘুম ভাঙবে। শুধু ইসলামি দুনিয়া নয়, বিশ্বের সব স্থানে সব প্রান্তেই ইসলাম জীবন-রেনেসাঁর এক প্রচণ্ড গতির বিকাশমান শক্তি হিসবে আসন গাড়ছে। Robin Wright তার 'The Islamic Resurgence : A New Phase' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, "Muslim activism in politics is only one aspect of what is a world wide phenomenon. But because of its inherent mixture of religion and politics, Islam could well become one of the world's strongest ideological forces in the late twentieth century." মিঃ রবিন রাইট এখানে বিশ্বব্যাপী ইসলামের উত্থানকে আজকের স্বাভাবিক বিশ্ব প্রবণতার অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে স্বীকার করেছেন, ইসালামের এই উত্থান ঘটেছে তার ধর্ম ও রাজনীতির স্বাভাবিক ও অবিমিশ্র মতবাদিক শক্তির কারণেই। এই শক্তিই ইসলামের প্রাণ এবং এই ক্ষেত্রে ইসলামের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দুনিয়াতে নেই। এ কথাও তাদেরই স্বীকৃতি থেকে আসছে। ইসলামের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিই এখনি জগৎ জয় করবে, যাত্রা যার শুরু হয়েছে। বিশ্ব অপেক্ষা করছে সে, শুভ দিনের।

নব্বই দশকের মাঝামাঝি একটি সেমিনারের জন্য প্রবন্ধটি লিখিত ও গঠিত হয়।

www.amarboi.org

সন্ত্রাস-দুর্নীতির ইতিকথা

সন্ত্রাস-দুর্নীতি যত পুরানো, তার প্রতিকারের বিষয়টিও তত পুরানো। তবু পুরানো বিষয় নিয়ে আলোচনা এ জন্যই যে, মানুষের সমাজ সভ্যতার মত সন্ত্রাস-দুর্নীতিও বিবর্তনমুখী। আর সন্ত্রাস-দুর্নীতির মত তার প্রতিকারও ইভোলুশনারী এবং তাই হতে বাধ্য। কারণ প্রকৃতি, মানব সমাজ, সব ক্ষেত্রেই কিয়া-প্রতিক্রিয়া এক সাথেই কাজ করে থাকে। সন্ত্রাস দুর্নীতি নামক সমাজদেহের এই ব্যক্তিক বা সমষ্টিক ক্রিয়াটি সমাজ-সভ্যতার একটা মারাত্মক ব্যাধি। এই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হলো প্রতিকার নামক নিরাময়তা। ব্যাধির পাশে নিরাময়তা এক সাথেই অবস্থান করে। এই নিরাময়তা বা প্রতিকার কিন্তু ব্যাধি বা সন্ত্রাস-দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ নিশ্চিত করা নয়। আল্লাহর পরিকল্পনাও সম্ভবতঃ এটা নয়। কারণ তাহলে আইন-আদালতের প্রয়োজন হতো না এবং বেহেশতের পাশে দোজখের অবস্থানের কোন অর্থ থাকতো না। প্রতিটি ব্যক্তিক বা সমষ্টিক সন্ত্রাস-দুর্নীতির প্রতিকার হতে হবে এটাই লক্ষ্য। এই প্রতিকার যদি হয়, তাহলে অপরাধের মাত্রা কমে আসবে। এটাই স্বাভাবিক এবং আইন ও সুশাসনের এটাই কাম্য। এর বিপরীত হলো সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি বেড়ে যাওয়া বা না কমা। অথবা সন্ত্রাস, দুর্নীতির প্রতিকার কঠিন ও জটিল হয়ে পড়া। আজ আমাদের অবস্থা এই শেষোক্ত পর্যায়ের বলেই আমাদের এই আলোচনা। আলোচনার আরও একটা কারণ হলো, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অন্য কথায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিকেই আজ দেশের প্রধান সমস্যা বলে অভিহিত করা হচ্ছে। যতগুলো কারণে বিগত হাসিনা সরকারের পতন ঘটেছে, তার মধ্যে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিই ছিল সর্বাগ্রগণ্য বিষয়। সরকারের বদল হয়েছে, কিন্তু সন্ত্রাস-দুর্নীতি অবস্থার আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটেনি। তাই আলোচনার শুরুতেই সন্ত্রাস-দুর্নীতির সেদিন-এদিনকে আমরা সামনে আনতে চাই।

একথা ঠিক যে, সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস হিসাবেই দেখা দরকার। বেশি মন্দ কম মন্দ বলে এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু এর প্রকৃতি বা চরিত্র নির্ণয়ের সুযোগ অবশ্যই আছে। অথবা পাত্র ও উৎসভেদে এর ভূমিকা অবশ্যই বিশেষভাবে বিচার্য। এই দৃষ্টিতেই সন্ত্রাস ও দুর্নীতির সেকাল-একালকে আমাদের পরখ করা প্রয়োজন।

বিগত শেখ হাসিনা সরকারের আমলের সন্ত্রাস দুর্নীতি ও বর্তমান সময়ের সন্ত্রাস-দুর্নীতির পার্থক্য নিরূপণ এক বাক্যে এইভাবে করা যায় যে, শেখ হাসিনা সন্ত্রাস-দুর্নীতির সরকারীকরণ করেছিলেন, আর এখন সন্ত্রাস-দুর্নীতির আবার বেসরকারীকরণ হয়ে গেছে। সন্ত্রাস-দুর্নীতির সরকারীকরণ অর্থ হলো, সরকারী দলের দায়িত্বশীল,পাওয়ারফুল ও প্রভাবশালী লোকরা নিজ হাতে ও প্রকাশ্যে সন্ত্রাস পরিচালনা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থাকে এর সহায়ক শক্তিতে পরিণত করা। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ এটাই করেছিল। করেছিল কিভাবে তা প্রমাণের জন্য ফেনীর, লক্ষ্মীপুরের, নারায়ণগঞ্জের এবং ঢাকা ও অন্যান্য এলাকার আওয়ামী গড ফাদারের উপর

www.amarboi.org

আমরা দৃষ্টিপাত করতে পারি। এরা প্রত্যেকেই এদের স্ব স্ব জেলায় সন্ত্রাস-দুর্নীতির কিংডম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর নিজেরা সেজে বসেছিলেন সন্ত্রাস-দুর্নীতির রাজা। জেলাগুলোর পুলিশ ও প্রশাসন তাদের হুকুমের দাসে পরিণত হয়েছিল। পুলিশের মামলা নেয়া, মামলা পরিচালনা, তদন্ত করা ও ধরপাকড়ের স্বাধীন গতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আদালতে যাবার পথও সবার জন্য উন্মুক্ত ছিলনা। ফেনীর জেলা কোর্ট বার বার চেষ্টা করেও তাঁর ভবনে বিচার কাজ শুরু করতে পারেনি। জেলার বিচারালয় যদি পণবন্দী হয়ে পড়তে পারে, তাহলে সেখানকার মানুষের অবস্থা কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আওয়ামী গড ফাদাররা তাদের এলাকা ও এলাকার মানুষকে এক সময়ের রাজা-বাদশাদের মত পৈত্রিক সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল। ওদের হত্যা-নির্যাতনের প্রতিকার চাইবার, বিচার প্রার্থনার ক্ষমতা কারও ছিলনা। অবিবাহিত সুন্দরী তরুণী ও গৃহবধূ আছে এমন পরিবার নিরাপদ থাকেনি। ভয়ে অনেক পরিবারকে এলাকা ছাড়তে হয়েছে। প্রকাশ্যে ওদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ বাঁচেতে পারেনি, যেমন বাঁচতে পারেনি লক্ষ্মীপুরের এ্যাডভোকট নুরুল ইসলাম ভয় ও আতঙ্কে স্থানীয় সাংবাদিকদের কলম ছিল বন্ধ। লক্ষ্মীপুরের গড ফাদারের উক্তি ছিল ঃ 'তার বিরুদ্ধে লিখতে গেলে হাত পা গুড়িয়ে দেয়া হবে।' লক্ষ্মীপুরের ডিসি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন, "আমার চাকরি জীবনে এরকম ভয়াবহ অবস্থা দেখিনি।" ঠিক আবু তাহেরের মতই নরসিংদী জেলার গডফাদার বলেছিলেন, "যারা আমার কথা শুনবেনা, বিরোধিতা করবে, হ্যাগো ঠ্যাং আমি ভাইঙ্গা ফালামু। কোর্টে যাইবা? তার আগেই তো কাম শেষ।" পাট শিল্পের নারায়ণগঞ্জের গড ফাদারের বাহিনী বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল, মারমুখী ও বিধ্বংসী। আর ফেনীকে 'ভয় ও আতংকের' নগরীতে পরিণত করা হয়েছিল। ফেনীর মত প্রতিটি শহরেই গড়ে উঠেছিল আওয়ামী গডফাদারদের রাজ্য। ময়মনসিংহের আওয়ামী এমপি সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর একটি দৈনিক লিখেছিল, "একজন গোলন্দাজের জিম্মী ৪ লাখ গফরগাঁওবাসী।" এরকম হাজারো গোলন্দাজ সৃষ্টি করেছিল আওয়ামী লীগ যাদের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির সরকারীকরণ হয়েছিল। দেশের রাজধানী থেকে তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা দিয়েছে সন্ত্রাসের এই রাজাদের। লক্ষ্মীপুরের এ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম খুন হওয়ার পর লক্ষ্মীপুরের আবু তাহেরের বিরুদ্ধে যাখন দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠলো, তখন শেখ হাসিনা প্রতিবাদ করে বললেন, 'শুধু কেন একজনকে নিয়ে লেখা হচ্ছে।' আর জয়নাল হাজারীর সন্ত্রাসের কিংডম নিয়ে তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্গবোধ করতেন এবং বোধ হয় তিনি চেয়েছিলেন মানুষের জীবন, সম্পদ, ইজ্জত-আবরু সবকিছু তার দলীয় গডফাদারদের আয়ত্তে আনতে। যেসব শহরে ও এলাকায় অন্যান্য দল শক্তিশালী ছিল, সেসব এলাকা ছাড়া গোটা দেশই সন্ত্রাস-দুর্নীতি কবলিত হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য কারণের সাথে এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যও মানুষ ভোট দিয়ে দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী করছিল চার দলীয় জোটকে।

www.amarboi.org

চার দলীয় জোটকে বিপুলভাবে বিজয়ী করার মাধ্যমে দেশের মানুষ সন্ত্রাস ও দুর্নীতির কবল থেকে মুক্তি লাভের যে আশা করেছিল, সে আশা এখনও শতভাগ পূরণ হয়নি। তবে তাদের জন্য একটি খুশির বিষয় হলো, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির পট পরিবর্তন ঘটেছে। আওয়ামী লীগ চলে যাবার সাথে সাথে সন্ত্রাস-দুর্নীতির সরকারিকরণ অবস্থার বিলুপ্তি ঘটেছে। জোট সরকারের শাসনে রাজধানীসহ দেশের কোন জেলাতেই কোন গডফাদার, সরকারি দল থেকে সৃষ্টি হয়নি। দুর্নীতি এখনও আছে কিন্তু কোন গড ফাদারকে দেখা যাচ্ছেনা, যারা তাদের ছেলে-সন্তান ও বাহিনী নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনকে আজ্ঞাবহ বানিয়ে প্রকাশ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। কুষ্টিয়া এলাকার একজন প্রতিমন্ত্রীর একজন ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। তাকে সংগে সংগেই গ্রেফতার করা হয়। গত বছর ১৬ অক্টোবর থেকে এ বছর ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত যে যৌথ অভিযান চলে, তাতে গ্রেফতারের অধিকাংশই প্রধান শাসক দল থেকে হয়েছে। বুয়েটে ছাত্রদের গোলাগুলিতে একজন ছাত্রী মারা যায়। এর জন্য দায়ী ছিল ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা। দ্রুত বিচার আইনে তাদের বিচার ও শাস্তি দেয়া হয়েছে। ঢাকা থেকে নির্বাচিত সরকারী দলের একজন এমপি'কে গ্রেপ্তার করা হয় একটি অভিযোগে। সন্ত্রাস ও অপরাধী দমনে সরকারি আন্তরিকতার আরেকটি প্রমাণ এত দ্রুত বিচার আইন ও র‍্যার বাহিনীর নিরাপক্ষ অভিয়ান। আওয়ামী আমলের মত দুর্নীতির সরকারিকরণ থাকলে শাসক দলের উপর এইভাবে আইন কার্যকরি হতে পারতনা, আওয়ামী লীগ আমলে পারেনি। কিন্তু আমি একথা বলছিনা যে, শাসক দল থেকে দুর্নীতি হচ্ছেনা। রাজধানীসহ দেশের জেলা-উপজেলায় অন্যান্যদের সাথে শাসক দলেরও হাজারো সদস্য নানা রকম সন্ত্রাস-দুর্নীতিতে জড়িত আছেন বা থাকতে পারেন। কিন্তু তাদের প্রতি সরকারী লোকদের সাহায্য প্রকাশ্য নয়। কোথাও প্রকাশ হয়ে পড়লে তা লুকাবারই চেষ্টা হচ্ছে, বুক ফুলিয়ে তাকে সমর্থন দেয়া হচ্ছেনা। আওয়ামী লীগের ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নারায়ণগঞ্জের মত আজ কোথাও সন্ত্রাসের মুক্ত এলাকা গড়ে উঠেছে, এমন কোন খবর এখনও পাওয়া যায়নি। সন্ত্রাস-দুর্নীতির সরকারিকরণ না হবারই এটা প্রমাণ। সন্ত্রাসের সরকারিকরণ এখন নেই এবং সন্ত্রাসের স্বাধীন কিংডম এখন কোথাও দেখা যাচ্ছেনা । তবে সন্ত্রাসের রাজারা না থাকলেও মনে হচ্ছে রাজার পাইক-পেয়াদারা মাঠে-ময়দানে খুবই সক্রিয়। তাদের সাথে অবশ্যই যুক্ত হয়েছে নব্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত নব্য পাইক-পেয়াদারা। নতুন-পুরাতনের এই সম্মিলিত আগ্রাসনে দেশের আইন-শৃঙ্খলা অবস্থা এক সময় উদ্বেগজনক অবস্থায় উপনীত হয়। এ অবস্থা শামাল দেয়ার জন্যই প্রথমে র‍্যাট, এবং পরেন 'র‍্যাব' গঠন করে সরকার। র‍্যাব এর পক্ষপাতহীন সন্ত্রাস দমন অভিযান সফল হচ্ছে। সন্ত্রাসের মতই দুর্নীতি গ্রাস করে ফেলেছে আমাদের সমাজকে। ঘুষ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজী, ফাইলবাজী ইত্যাদি মানব জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিসহ। জোট সরকার সন্ত্রাস দমনে যতটা তৎপর, দুর্নীতি দমনে তাদেরকে ততটা তৎপর দেখা যাচ্ছেনা। অপারেশন ক্লিনহার্টসহ পরবর্তী অভিযানের সবগুলোই ছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

www.amarboi.org

গঠিত 'র‍্যাট' ও 'র‍্যাব' এর মত বিশেষ বাহিনীগুলোও সন্ত্রাস দমন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্যই । দুর্নীতি দমনের প্রচলিত আইন দুর্নীতি দমনে কার্যকরী হচ্ছে না। এই ব্যর্থতাই আজ দুর্নীতিকে করে তুলেছে সর্বব্যাপী।

সন্ত্রাস-দুর্নীতির কারণ সন্ধানের আগে আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, দুর্নীতি, দুরবস্থা, অপরাধ প্রবণতা, দায়িত্বহীনতা, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী সম্পর্কে বিখ্যাত লোকদের কয়েকটি উক্তি এখানে তুলে ধরতে চাই।

- সাম্প্রতিক কালের একটি চাঞ্চল্যকর কেস হলো ইটিভি মামলা। এই কেসে প্রমাণ হয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও আমলারা জালিয়াতি, দুর্নীতি ও অনাচার-এর ক্ষেত্রে কত নিচে নামতে পারেন। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্ট তার রায়ে বলেছে, "সবকিছু বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইটিভি'কে লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম হয়েছে এবং লাইসেন্স গ্রহণের প্রতিটি স্তরে গোপন সমঝোতা হয়েছে। এ ছাড়া কিভাবে আইনকে পাশ কাটিয়ে নির্বাহী ক্ষমতাধারীরা দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে সেটাও ফুটে উঠেছে। এটাও প্রতীয়মান হয়েছে যে, আমলারা জনদায়িত্ব থেকে কিভাবে তাদের হাতকে দূরে রেখে আইনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা না রেখে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছেন। -- এ মামলায় যা কিছু ঘটেছে তা প্রকাশিত হলে সরকার এবং জনগণের চোখ খুলবে যে, নির্বাহী ক্ষমতা কত পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।"

দ্বিতীয় উক্তিটি আমাদের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দিন সাহেবের। এরশাদ সরকার পদত্যাগ করলে প্রধান বিচারপতি হিসাবে তিনি অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। তিনি ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করান। ১৯৯৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়নে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তার তত্ত্বাবধানে ২০০১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে 'জাতির সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করা'র অভিযোগ আনেন এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে কিছু কুৎসিত মন্তব্য করেন। প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষে পদ থেকে সরে যাবার পর স্বল্পভাষী এই সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধান বিচারপতি শেখ হাসিনার জবাব হিসাবে যা বলেন তা আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবং দেশের সন্ত্রাস-দুর্নীতির মৌলিক কারণ নিরূপণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দুই পৃষ্ঠার এক আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদলিপিতে বলেন,"বিগত কয়েক মাস যাবৎ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও অন্যরা (কয়েকজন আওয়ামী কলামিষ্ট) আমার সম্পর্কে স্পর্শকাতর মন্তব্য করে আসছেন এবং আমার ভূমিকা সম্পর্কে বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছেন।...... আওয়ামী লীগ সভানেত্রী (বর্তমানে বিরোধীদলীয় নেত্রী) বলেছেন, প্রেসিডেন্ট (সাহাবুদ্দিন) বাঙালি জাতির সাথে বিশ্বস ভঙ্গ করেছেন।' তিনি একথা বলে কি বুঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। আওয়ামী লীগ আমাকে বিশ্বাস করে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করেছিল, কিন্তু আমি তাদের সে আস্থা রাখিনি। আমি কি এমন কোন মুচলেকা দিয়েছিলাম যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত করতে

www.amarboi.org

হবে? শেখ হাসিনা নির্বাচনের কয়েকদিন আগে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আমি প্রেসিডেন্ট থাকায় তার সরকার মেয়াদ পূর্ণ করতে পেরেছে। নির্বাচনের পর হাসিনা নাটকীয়ভাবে মত পরিবর্তন করে ফেললেন। আমাকে বিশ্বাস ঘাতক বলে অভিহিত করা হলো। আওয়ামী লীগ নেতাদের একটা গ্রুপ নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করতে এবং প্রেসিডেন্টের তত্ত্বাবধানে নতুন করে নির্বাচন দিতে আমাকে অনুরোধ জানাল। আমি তাদের অনুরোধে সাড়া দেইনি। তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সবকিছু করা হলে আমি একজন ফেরেশতা। আর তা করা না হলে আমি শয়তান---।"

তৃতীয় বক্তব্যটি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই দলের দুই সেক্রেটারী জেনারেলের। ২০০৩ সালের ৫ জুন 'জাতীয় নীতি পর্যালোচনা ফোরাম'-এর এক আলোচনা সভায় বিএনপি'র সেক্রেটারী জেনারেল ও এলজিআরডি মন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান ভূইয়া ও আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল জলীল দেশের আইন-শৃঙ্খলার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। কতগুলো বিষয়ে দু'জনের শব্দ ও বাক্য গঠনে কিছু পার্থক্য থাকলেও বক্তব্য এক ছিল। দু'জনের একমত হওয়া বিষয়কে এইভাবে তুলে ধরা যায় ঃ "দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে আগে রাজনৈতিক দলকে গডফাদার মুক্ত হতে হবে। সন্ত্রাসী আর গডফাদাররা কোনদিন রাজনৈতিক দলের উপকারে আসেনি বা আসবেও না, বরং দলের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। রাজনীতি এখন দুর্বৃত্তায়নের কবলে। রাজনীতি ও সংসদ টাকাওয়ালারা আর আমলারা দখল করে নিচ্ছে। এতে প্রকৃত রাজনীতিবিদরা পেছনের কাতারে চলে যাচ্ছে। সন্ত্রাসী ও গডফাদারদের রাজনৈতিক দল থেকে বহিষ্কারের পরস্পর অঙ্গীকার করতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, বহিষ্কার করলে কেউ কোন সন্ত্রাসীকে জায়গা দেবেন না। রাজনীতিবিদরাই রাজনীতির ক্ষতি করছে। রাজনীতিবিদদেরকে অবশ্যই দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে।"

উপর্যুক্ত তিনটি বক্তব্যকে মর্যাদা, গুরুত্ব ও দায়িত্বশীলাতার দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় আত্মস্বীকৃতি (National Confession) হিসাবে আমরা অভিহিত করতে পারি। এ বক্তব্য তিনটির মধ্য দিয়ে জাতির দুর্দশা-দুর্ভাগ্য যেন রোদন করে উঠেছে, চিহ্নিতও করেছে দেশের ক্রবর্ধমান সন্ত্রাস-দুর্নীতির কারণ। চিহ্নিত এই কারণগুলো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

(ক) দেশের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা সীমাহীন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া। ইটিভি মামলার রায়ে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী ও সিনিয়র মন্ত্রী তাঁর পছন্দের লোকদের স্বার্থে দেশের আইনকে নগ্নভাবে পদদলিত করেছেন, জাতীয় সংস্থা বিটিভি'র কোটি কোটি টাকার ক্ষতি করেছেন অবলীলাক্রমে এবং সেই সাথে জাতীয় নিরাপত্তাকে খেয়াল খুশির বস্তুতে পরিণত করেছেন।

www.amarboi.org

(খ) এক শ্রেণীর আমলারা উপরের ইচ্ছা ও নিজেদের স্বার্থে অবিশ্বাসরকম জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া। ইটিভি'র রায়ে আরো দেখা যাচ্ছে, দেশের এক শ্রেণীর শীর্ষ আমলা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ইচ্ছা পূরণ এবং মহল বিশেষকে অবৈধ সুবিধা দানের মাধ্যমে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সরকারি দলিল ও সিদ্ধান্তের পরিবর্তন পরিবর্ধনের মত যে কোন জাল-জালিয়াতি করতে পারেন।

(গ) আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার মত শীর্ষ রাজনীতিকরা চান ক্ষমতা, গণতন্ত্র নয়। দেশের একজন শীর্ষ রাজনীতিক বিরোধী দলীয় নেত্রী, আওয়ামী লীগ প্রধান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেখা যাচ্ছে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকে প্রেসিডেন্ট করেছিলেন তার কাছ থেকে দলীয় সুবিধা নেয়া এবং সবশেষে নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার সহায়তা পাওয়ার লক্ষ্যে। দু'হাজার এক সালের সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনকে প্রেসিডেন্টকে দিয়ে বাতিল করিয়ে ম্যানজেড নির্বাচনের মধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চেয়েছিল আওয়ামী লীগ।

(ঘ) শেখ হাসিনার মত শীর্ষ রাজনীতিকদের কাছে ভালো-মন্দের মানদণ্ড হলো তাদের স্বার্থ। তাদের এ মানসিকতার কারণেই সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন এর মত লোকও শেখ হাসিনার কাছে শয়তান হয়েছেন।

(ঙ) সব দলেই বিশেষ করে বড় দলগুলোতে প্রতিযোগিতা করে সন্ত্রাসী পালন করা হচ্ছে।

(চ) রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে। টাকাওয়ালারা টাকার পাহাড় গড়ার জন্য রাজনীতি ও সংসদ দখল করে নিচ্ছে।

(ছ) রাজনৈতিক সরকার ক্রিমিনাল রাজনীতিকদের শাস্তি দিতে ভয় পান অথবা নিরাপদ বোধ করেননা। এ জন্যই দেখা যাচ্ছে খুনিরা প্রভাবশালী রাজনৈতিক বলয়ের লোক হলে তদন্তের আড়ালে সে খুন চাপা পড়ে যায়। অবশ্য দ্রুত বিচার আইনে কিছু ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্রিমিনালদের ক্ষেত্রে এটুকুও করা হচ্ছেনা। জোট সরকারের শ্বেতপত্রে দুর্নীতির যে ভয়াবহ চিত্র আঁকা হয়েছে এবং রাজনীতিক-দুর্নীতিবাজদের মুখোস যেভাবে খুলে দেয়া হয়েছে সেভাবে কিন্তু তাদের বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছেনা। দু'বছরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মাত্র একটি মামলার চার্জশীট হয়েছে। এভাবে এগুলো শ্বেতপত্রে উল্লিখিত দুর্নীতির বিচার করতে কয়েক দশক লাগবে। প্রকৃতপক্ষে এটা বিচার এড়ানোরই একটা প্রক্রিয়া। এ প্রেক্ষিতে জোট সরকার কর্তৃক স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন' গঠন প্রশংসনীয় কাজ হয়েছে। এতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে।

www.amarboi.org

উল্লিখিত ৭টি বিষয়, যেমন দেশের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা সীমাহীন দুর্নীতিতে জড়িয়া পড়া, একশ্রেণীর আমলারা উপরের ইচ্ছা ও নিজেদের স্বার্থে অবিশ্বাস রকম জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া, শেখ হাসিনার মত শীর্ষ রাজনীতিকরা গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে ক্ষমতা দললে সচেষ্ট হওয়া, শেখ হাসিনার মত শীর্ষ রাজনীতিকদের কাছে তাদের স্বার্থ ভাল-মন্দের মানদণ্ড হওয়া, রাজনৈতিক দলে আশ্রয় পাওয়া এবং নীতি আদর্শহীন একশ্রেণীর টাকাওয়ালার মাধ্যমে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন হওয়া, ইত্যাদি আমাদের এ পর্যন্ত চলে আসা দুর্ভাগ্য-দুর্দাশার কারণ। আর বর্তমানে চলা সন্ত্রাস দুর্নীতির মৌল হলো, রাজনৈতিক সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের বিচারের সম্মুখীন করতে ভয় পাওয়া বা সংকোচ করা, দলকে সন্ত্রাসী এবং যারা নীতি ও দেশপ্রেমের বদলে টাকার জন্য রাজনীতি করে, তাদের কবল থেকে মুক্ত করতে না পারা।

পুলিশ ও লোয়ার লেবেলের আমলাদেরকেও সন্ত্রাস-দুর্নীতির জন্য দায়ী করা হয়। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের দেশ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন থেকে মুক্ত হলে এবং যারা দেশ ও জাতিকে ভালোবেসে রাজনীতি করেন, তারা পুরো রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে যেতে পারলে পুলিশ ও আমলারা আপনাতেই ঠিক হয়ে যাবে। আজ সন্ত্রাস-দুর্নীতির যে মহামারী, তার বিস্তার ঘটেছে উপর থেকে, নিচ থেকে নয়।

সন্ত্রাস-দুর্নীতির গোটা ব্যাপারটাই মানব মনের সাথে যুক্ত একটি বিষয়। মানুষের হাত দুর্নীতিগ্রস্ত ও সন্ত্রাসী হবার আগে তার মন সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই মানুষের মনকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত করার মাধ্যমেই সমাজকে সন্ত্রাস -দুর্নীতির সয়লাব থেকে রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু এর কোন ব্যবস্থা আমাদের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রে নেই। উপরন্তু মানুষের মনকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দেবার জন্য আমাদের মিডিয়া, শিক্ষা-নীতি ও পরিবেশ এবং চলমান সেকুলার জীবনধারা একযোগে কাজ করছে। মানুষ আল্লাহর নীতি বিধান মুক্ত হতে গিয়ে শয়তানি নীতি-বিধানের হাতে আজ বন্দী হয়ে পড়েছে। এর ফলেই ইটিভির দুর্নীতি সম্ভব হয়েছে এবং সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনা একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও একটি বড় রাজনৈতিক দলের প্রধান হয়েও তাঁর পক্ষে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটি নির্বাচন বাতিল করার জন্য প্রেসিডেন্টকে চাপ দিতে পারা। যিনি তার অবৈধ চাপে সম্মত না হওয়া একজন প্রেসিডেন্টকে বিশ্বাসঘাতক বলতে পারেন, তিনি পরাজয়ের হিংসায় অন্ধ হয়ে একটি নির্বাচিত সরকারকে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করার জন্য তার দলের হাজার হাজার কর্মী ও সন্ত্রাসীকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমূলক অপকর্মে ঠেলে দেবেন তা খুবই একটা সাধারণ লজিক। আজ হত্যা, সন্ত্রাস, ডাকাতি ইত্যাদির চরিত্র দেখলে এই লজিকটাই নিরেট সত্য হিসেবে সামনে এসে যায়।

উপরে সন্ত্রাস দুর্নীতির যে কারণ আলোচা কর হয়েছে, তার মধ্যে সন্ত্রাস-দুর্নীতির প্রতিকারও নিহিত রয়েছে। সন্ত্রাস দুর্নীতির কারণ দূর হলে সন্ত্রাস দুর্নীতিও দূর হয়ে যাবে। কারণের নিরিখে সন্ত্রাস দুর্নীতির প্রতিকার নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

www.amarboi.org

(এক) দেশের রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। দেশের রাজনীতি থেকে সন্ত্রাসীদের সমূল অস্তিত্ব উপড়ে ফেলতে হবে। টাকা বানাবার জন্য যে টাকাওয়ালারা রাজনীতিকে তাদের লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেছেন, সে টাকা টাকাওয়ালাদের রাজনীতি থেকে ছেটে ফেলতে হবে। দেশের রাজনীতিকে পরিশুদ্ধকরণের এই কাজ খুব কঠিন, কিন্তু খুবই সহজ হতে পারে যদি রাজনীতিকরা পরিশুদ্ধ হন।

(দুই) কিন্তু সমস্যা হলো, রাজনীতিকরা পরিশুদ্ধ হবার কাজ রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করার চেয়ে বহু বেশী কঠিন। রাজনীতিকরা পরিশুদ্ধ হতে হলে নিম্নলিখিত সংস্কারে তাদের রাজি হতে হবে ঃ

(ক) রাজনীতিকদেরকে ক্ষমতার লোভ থেকে পরিশুদ্ধ হতে হবে। তাদের মধ্যে এই মনোভাব তৈরি হতে হবে যে, তারা দেশ ও দশের সেবার জন্য রাজনীতি করছেন। রাজনীতিকদের মধ্যে এই মনোভাব তৈরি হওয়ার প্রমাণ হলো যে, সে ভোট নেয়ার জন্য সন্ত্রাস করবে না, টাকাও খরচ করবে না। অর্থাৎ সে জনগণের রায় ও ইচ্ছার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করবে। জনগণ তার সেবা চাইলে তাকে ভোট দেবে, না চাইলে ভোট দেবে না। জনগণ যে রায়ই দিবে রাজনীতিকরা তাকে সম্মান করবে। শেখ হাসিনার মন যদি এই ধরনের গণতান্ত্রিক হতো, পরিশুদ্ধ হতো, তাহলে তিনি প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনকে নির্বাচন বাতিলের জন্য চাপ দেয়ার মত অপরাধ করতেন না এবং তাকে বিশ্বাসঘাতকও বলতেন না। এই সাথে তিনি নির্বাচিত সরকারকে সম্মান করতেন এবং এই সরকারকে সন্ত্রাস দুর্নীতির মাধ্যমে বিবৃত-ব্যতিব্যস্ত করার বদলে সার্বিক সহযোগিতা দান করতেন।

(খ) রাজনীতিকরা নিজেদের মধ্যে এই নীতিবোধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর তাদের স্ব স্ব দলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গ্রুপিং করে, টাকা খরচ করে, বল প্রয়োগ করে এবং দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করে দলের পদ দখল থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে। তার মধ্যে এই নীতিবোধও সৃষ্টি করতে হবে যে, দলের ভোটাররা তাকে যদি যোগ্যতা ও জনসেবায় সর্বাগ্রগণ্য মনে করে, তাহলে দল পরিচালনার দায়িত্ব তাকেই দান করবে, যদি না করে তাহলে যাকে তারা দল পরিচালনার দায়িত্ব দেবে তাকেই সহযোগিতা করতে তাকে রাজি থাকতে হবে।

(গ) রাজনৈতিক দলগুলোতে এভাবে যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়, তাহলে দেশে গণতন্ত্র আপনাতেই প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। তখন দেশে নির্বাচন হবে সুষ্ঠু, নির্বাচনের পরিবেশ হবে শান্তিপূর্ণ। কোন দলই সন্ত্রাস করবে না, সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করার তাই প্রয়োজন হবে না। ফলে সন্ত্রাসীও তৈরি হবে না এবং তৈরি হওয়া সন্ত্রাসীরা আশ্রয়-প্রশ্রয়ের অভাবে হয় ভাল হয়ে যাবে, নয়তো জেলে গিয়ে শাস্তি ভোগ করবে। এই গণতান্ত্রিক পরিবেশে যে দলই নির্বাচিত হোক অন্যদলগুলো তাকে সম্মান করবে ও সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

www.amarboi.org

(তিন) রাজনীতিকরা এইভাবে পরিশুদ্ধ হলে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এইভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে এবং দেশে এইভাবে গণতান্ত্রিক পরিবেশে সৃষ্টি হলে বৈধ নির্বাচন বাতিল না করার জন্য প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনকে আর বিশ্বাসঘাতক হতে হবে না, যে দলই নির্বাচিত হোক শেখ হাসিনা তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে মেনে নেবেন। শেখ হাসিনার মত রাজনীতিকরা ইটিভি'র মত দুর্নীতিও আর কোন দিন করবেন না এবং ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতির শ্বেত পত্রও আর কোন দিন প্রকাশ করার প্রয়োজন পড়বে না। রাজনীতিক শেখ হাসিনারা এইভাবে ভালো হয়ে গেলে আমলা ও পুলিশের মধ্যেকার দুর্নীতির মড়ক তখন ভালো হওয়ার প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হবে।

(চার) রাজনীতিক, রাজনৈতিক দল ও দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের এই যে আইডিয়াল অবস্থার কথা আমি বলছি, এটা অবশ্যই অধিকাংশের কাছে একটা 'ইউটোপিয়ান' বা আকাশচারী চিন্তা বলে মনে হবে। কিন্তু এই আইডিয়াল অবস্থা আমি বলব অসম্ভব নয়। একে সম্ভব করার জন্য মাত্র দু'টি কাজ করতে হবে। একটা হবে আশু করণীয়, দ্বিতীয়টা হবে দীর্ঘ মেয়াদী।

(ক) আশু করণীয়ট হলো এ পর্যন্ত সংঘটিত ও দায়েরকৃত সকল অপরাধ ও মামলার দ্রুত ও সুবিচার নিশ্চিত করতে হবে এবং রাজনৈতিক খেয়াল-খুশির কাঁধে সওয়ার হয়ে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগের যে ঘটনা হরতাল ও মিছিলের সময়ে ঘটে তাকেও কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ধরে তার বিচার ও শাস্তি বিধান নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতিবাজ বা অপরাধী ব্যক্তি পুলিশ, আমলা বা রাজনীতিক যেই হোন তাকে গ্রেফতার ও বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিচার ব্যবস্থার আমূল সংশোধন প্রয়োজন। অতি দ্রুত বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। দ্রুত বিচারকালীন সময়ে অপরাধ ও অবস্থাভেদে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে অজামিন যোগ্যভাবে জুডিশিয়াল কাস্টোডিতে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(খ) দীর্ঘ মেয়াদী দ্বিতীয় করণীয় বিষয়টা হলো মানুষের মন ও মননের পরিশুদ্ধি। এর আগে আমি বলেছি সন্ত্রাস হাত করে না, সন্ত্রাসী হয় আগে মন। অপরাধমূলক কাজ মানুষ করে তার মন অপরাধী হয়ে উঠার পর। মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, চিন্তা যদি তার পবিত্র থাকে, তাহলে তার সব কাজ ও আচরণও পবিত্র হবে। মনকে পবিত্র রাখতে হলে বিবেকের রায়কে শাণিত ও শক্তিশালী করতে হবে। বিবেকের অপরোক্ষ ও অনির্দিষ্ট গতিকে প্রত্যক্ষ, সুনির্দিষ্ট, সার্বিক ও চিরকল্যাণমুখী করার জন্য তাকে স্রষ্টার আনুগত্যের অধীনে আনতে হবে। তার সামনে থাকবে ভালো কাজের নির্দেশ ও মন্দকাজের নিষেধের অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধকে সদা জাগরুক রাখবে তার প্রত্যেকটি কাজের জন্য পরকালে জবাবদিহিতার ভয় এবং 'অনন্ত জান্নাত কিংবা অনন্ত

www.amarboi.org

জাহান্নামের পরিণাম চিন্তা। ইসলামের এই জীবন পদ্ধতিই রাজনীতিক, রাজনৈতিক দল ও দেশের সার্বিক পরিবেশেকে 'আইডিয়াল অবস্থা'য় পৌছানোর ইউটোপিয়ান বা আকাশচারী চিন্তাকে বাস্তব রূপ দিতে পারে। সপ্তম শতাব্দীতে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে পৃথিবী এই বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেছে, যখন খাজাঞ্চীখানা অর্থে ভর্তি থাকলেও রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করেছেন ও শীতে কষ্ট পেয়েছেন, যখন রাষ্ট্রপ্রধান ব্যক্তিগত কাজে এমনকি রাষ্ট্রের বাতি ব্যবহার করতেন না, যখন রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় দ্বারা তাড়িত হয়ে নিজের পিঠে আটার বস্তা বহন করে অভুক্তদের বাড়িতে পৌছাতেন, যখন রাষ্ট্রপ্রধান সাক্ষীর অভাবে বিচারে পরাজিত হয়ে নিজেব জিনিসের ন্যায্য দাবি ত্যাগ করে আদালত থেকে ফেরত আসতেন এবং যখন গভীর রাতে জেগে উঠে রাষ্ট্রপ্রধান কোথাও কোন কুকুর অভুক্ত থাকলো কিনা, কোথাও কোন ঘোড়া রাস্তা অসমান থাকায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো কিনা- এই ভয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার আতঙ্কে রোদন করতেন। এই অপরূপ ব্যবহারকে ইসলাম আবার বাস্তব রূপ দিতে পারে। শুধু প্রয়োজন মানুষের মনের মানবিক ও কল্যাণমুখী পরিবর্তন।

সবশেষে বলব, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির অস্তিত্ব ও বিস্তার মানসিক বিষয়। লোভ এর উৎস, স্বেচ্ছাচারিতা এর বাহন। মনের লোভ ও স্বেচ্ছাচারিতা দমনের জন্য উপর্যুক্ত মানসিক চিকিৎসাই মুখ্যত প্রয়োজন। তবে আশু ব্যবস্থাও অপরিহার্য। সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমূলক প্রতিটি অপরাধের করতে হবে আশু বিচার এবং এই বিচার থেকে প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী থেকে পিয়ন এবং কোটিপতি থেকে কুড়ে ঘরবাসী কেউ রক্ষা পাবেনা তা নিশ্চিত করতে হবে। এই বিচার যেমন ঘটে যাওয়া অপরাধের প্রতিকার করবে, তেমনি প্রতিরোধ করবে অপরাধের বিস্তারকে। এইভাবে বিচার ব্যবস্থা অপরাধের মুখে লাগাম পরাবে। আর মানসিক চিকিৎসা মানুষের মন থেকে করবে অপরাধের মূলোচ্ছেদ। আপসোস, আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থা থেকেও না থাকার মত। আমাদের দেশে অপরাধের শ্বেতপত্র প্রকাশ হয়, কিন্তু সে অপরাধগুলোর বিচার সম্ভব হয়না। আর মানুষের মন থেকে অপরাধচিন্তা নির্মূলের আদর্শিক শিক্ষা ও মটিভেশনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তো নেই-ই নেই বটে, কিন্তু হবেনা এ হতাশা অবশ্যই পোষণ করিনা। দেয়ালে পিঠ আমাদের ঠেকে যাচ্ছে। ঘুরে আমাদের দাঁড়তেই হবে। শিষ্টের পালনের জন্য দুষ্টের দমনে বজ্রকঠোর হওয়াসহ স্বজাতির স্ব-আদর্শে আমাদের ফিরে আসতেই হবে।

www.amarboi.org

দিকে দিকে পুনঃজ্বলিয়া উঠিছে

তুরস্কের সুলতান দিগ্বীজয়ী সুলাইমানের মৃত্যু (১৫৫৬ খ্রিঃ) এবং লোপাস্তোর নৌযুদ্ধে তুর্কি নৌবহরের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বে মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক তুর্কি খেলাফতের পতন পর্ব শুরু হয়। পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম শাসন শক্তির প্রতীক ছিল মোগল সাম্রাজ্য। ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের তিরোধানের মধ্য দিয়ে তারও পতন শুরু হয়ে যায়। ১৭৫৭ সালে হিমালয়ান উপমহাদেশে শুরু হয় ব্রিটিশ শাসন। উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম শাসনের শক্ত ঘাঁটি মিসর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে চলে যায় ১৮১২ সালে। তারও অনেক আগে ১৭৫০ সালের মধ্যেই মুসলিম দুনিয়ার পূর্ব প্রান্তের শক্ত দরওয়াজা ইন্দোনেশিয়া উপনিবেশিক শক্তির হাতে চলে যায়। এক কথায় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের প্রারম্ভকালের মধ্যেই প্রায় গোটা ইসলামী দুনিয়া ভূখণ্ডিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতার গাঢ় তিমিরে ঢাকা পড়ে যায়। ভূখণ্ডিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে তাদের ওপর জেঁকে বসে সাংস্কৃতিক দাসত্বের কাল থাবা। একজন সমীক্ষকের ভাষায়, "The invaders took the task of 'Westernizing' us. The Pseudo Vlamas they planted in our religious centres, the agents they employed in the universities, government, educational institutions, and publishing houses, and the missionaries and the orientalists who worked in the service of the imperialist forces, put their energies in order to distort the noble teachings of Islam." ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করার তাদের এ সম্মিলিত প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাভী তাঁর 'Islamic Awakening between extremism and Rejection' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "পূর্ণাঙ্গ, ভারসাম্যময় ও সুবিচারপূর্ণ বিধান হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম স্বদেশেই নির্বাসিত হয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্র পরিচালনা, মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক তথা সর্বক্ষেত্রে ইসলাম অপসারিত। ইসলামকে শরিয়ত ছাড়া দ্বীন, রাষ্ট্র ছাড়া ধর্ম এবং কর্তৃত্ব ছাড়া আইনের কিতাবে পর্যবসিত করা হয়েছে।" ইসলামী দুনিয়ার এ অবস্থা সামনে রেখেই 'The Return of Islam' নিবন্ধে Bernard Lewis রাসূলুল্লাহ (স) এর 'আল-লাত' ও 'আল-ওজ্জা'র মত মূর্তি উৎখাতের সংগ্রামের দিকে ইঙ্গিত করে বিদ্রূপের সাথে লিখেছেন, "এখনও মুসলমানরা সংগ্রাম করছে, তবে সেটা 'আল-লাত', 'আল-ওজ্জা'র মত মূর্তি বিদায়ের জন্য নয় বরং 'রাষ্ট্র', 'জাতি' ও 'বর্ণ' এর মত নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই।" মুসলমানদের এ অবস্থা

www.amarboi.org

দেখে Bernard Lewis এর মতো অনেকেই বিদ্রূপের হাসি হেসে উপসংহার টেনেছেন যে, ইসলামের প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের সকলের অনুমান উপসংহার মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ইসলাম তার শক্তিমত্তা প্রমাণ করেছে। পতনের পঙ্ক থেকে মুসলমানদের উত্থানের শক্তি হিসেবে ইসলাম সূর্য শিখার মত জেগে উঠেছে অন্ধকারের বুক চিরে। ইসলামের অপরাজেয় শক্তি- সঞ্জীবিত মুসলমানদের বেপরোয়া উত্থানের সূর্য শিখা শুধু ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ায় নয়, শুধু বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান নয়, প্রজ্জ্বলিত হয়েছে প্রতিটি মুসলিম দেশে- গোটা বিশ্বে। শুধু উত্থান নয়, যে পশ্চিম মনে করেছিল ইসলামকে তারা শেষ করে দিয়েছে সেই পশ্চিমের জন্যই ইসলাম আজ একক শক্তিশালী এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। Godfreys Jansen তাঁর 'International Islam' শীর্ষক আলোচনায় 'Moslems and the Modern World' নিবন্ধে স্বীকার করেছেন, "Today Islam and the Modern Western World confront and challenge each other. No other majore religion possess such a challenge to the west. Not christianity, which is a part of the western World and which has been eaten up from within by the acids of the modernity. Not Hinduism and Buddhism, because their radiation to the west has been and is on high ethereal plan. And not Judaism, which is too small and tribal a faith. Not guru, no swami, no lama, no rabbi has had any impact on the west comparable to that exerted by the Chaliph, the Mahdi, and the Ayatullah, or by the that stereotype haunting the western imagination, "The Mullah" Leading "The Jihad" (The Economist, January 3, 1981) অর্থাৎ ইসলাম ও আধুনিক পশ্চিম দুনিয়া আজ পরস্পর মুখোমুখি এবং একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করছে। আর কোন ধর্মই পশ্চিমের প্রতি এমন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়নি। খ্রিস্টধর্ম কোন চ্যালেঞ্জ হয়নি কারণ খ্রিস্টধর্ম নিজেই পশ্চিমী দুনিয়ার অংশ এবং আধুনিকতার গ্রাস তাকে ভেতর থেকেই শেষ করে ফেলেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মও চ্যালেঞ্জ নয়, কারণ পশ্চিমের কাছে ওগুলোর ভাবমূর্তি আকাশচারী সংস্কার চিন্তার বেশি কিছু নয়। আর ইহুদি ধর্মতো চ্যালেঞ্জে আসেই না, কারণ তা এক ক্ষুদ্র গোত্রীয় ধর্ম। পশ্চিমা দুনিয়ার ওপর 'খলিফা' 'মাহদি' 'আয়াতুল্লাহ' নামের যে প্রভাব অথবা 'মোল্লাদের' পরিচালিত 'জিহাদ' পশ্চিমী চিন্তাধারাকে যেভাবে আলোড়িত করে সে তুলনায় 'গুরু' 'স্বামী' 'লামা' 'রাব্বি' কোন গুরুত্বই বহন করে না পশ্চিমী দুনিয়ায়।

www.amarboi.org

মুসলিম দুনিয়ায় রাজনৈতিক পতনের সাথে সাথেই ইসলামের এই উত্থান শুরু হয়। আমাদের হিমালয়ান উপমহাদেশ যখন সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশের গ্রাসে চলে যাচ্ছিল, তখনই সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর জিহাদ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে, তিতুমীরের এবং হাজী শরীয়তুল্লার মুক্তি আন্দোলন এ সময়েই শুরু হয়। ইসলামী দুনিয়ার রাজনৈতিক পতন ঘটেছিল শাসক মহলের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্যুতির কারণেই। পরাধীনতার অন্ধকার যখন নেমে এল, তখন শাসক মহল নয়, ইসলামী জনতার চত্বর থেকেই এল প্রতিরোধ। প্রতিটি মুসলিম দেশে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, হাজী শরিয়তুল্লাহ, তিতুমীরের মত ইসলামী জননেতাগণ ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন। এই প্রতিরোধই উত্তরকালে পরিণত হলো জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। গোটা ইসলামী দুনিয়ায় প্রতিটি মুসলিম দেশে ইসলাম এবং ইসলামী জননেতাগণই মানুষের মুক্তির চেতনাকে প্রজ্বলিত করেছে এবং এগিয়ে নিয়েছে মুক্তি সংগ্রামকে সাফল্যের সিংহদ্বারে। ইন্দোনেশিয়ায় মোহাম্মাদিয়া আন্দোলন, ভারতে মুজাহিদ আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান, মুসলিম লীগের আন্দোলন, লিবিয়ায় সেনুসি ও ওমর মোখতারের (রহঃ) আন্দোলন, আরব উপদ্বীপে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদীর (রহ) এর আন্দোলন, সেনেগ্যাল ও নাইজারে ওমর ইবনে সাঈদ (রহ) এর আন্দোলন, নাইজেরিয়ায় ওসমান দাম ফোদিও (রহ) এর আন্দোলন, সুদানে মুহাম্মদ আহমাদ আল-মাহদির আন্দোলন, ককেশিয়ায় ইমাম শামিমের আন্দোলন, আলজেরিয়ায় আব্দুল কাদিরের আন্দোলন, মরক্কোর আব্দুল করিম রিফের আন্দোলন এবং সোমালিল্যান্ডে মুহাম্মাদ আব্দুল্লার আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার উত্থান ঘটিয়ে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দ্বীপশিখা আবার প্রজ্জ্বলিত করে। কিন্তু স্বাধীনতা যখন এল, তখন ঔপনিবেশিকরা তা তুলে দিল তাদের বৃত্তিভোগী অথবা বেতনভোগী অথবা শিক্ষা-সংস্কৃতি গলাধঃকরণকারী অনুগামীদের হাতে। যারা মুখে ইসলামের শ্লোগান দিলেও উত্তরকালে হয়ে দাঁড়াল 'নব্য ঔপনিবেশিক'। যাদের হাতে প্রতারিত হলো দেশ ও জনতা। ইন্দোনেশিয়ায় ডঃ সুকর্ণ, হিমালয়ান উপমহাদেশে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ, মিসরে বাদশাহ ফারুক এবং নাসের, আলজেরিয়ায় বেনবেল্লা ও হুয়ারী বুনেদিন, তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের মত প্রতিটি নব্যস্বাধীন মুসলিম দেশের নব্যশাসকরা ইসলামের সাথে, মুসলমানদের সাথে এবং তাদের প্রতিশ্রুতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে স্বাধীনতা এসেও তা ফলপ্রসূ হলো না। স্বাধীনতা তার জনগণকে নিজ মেরুদণ্ডের ওপর দাঁড় করাতে পারলো না। স্বাধীন হয়েও জনগণকে শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা ও আদর্শের ক্ষেত্রে পরাধীনতার শৃঙ্খল বয়েই চলতে হলো।

www.amarboi.org

এ পটভূমিতেই প্রতিটি মুসলিম দেশে ইসলামী জনতার কাতার থেকে জোরদার হয়ে মাথা তুলেছে ইসলামী আন্দোলন। ইন্দোনেশিয়ায় মোহাম্মদিয়া আন্দোলন ও মাসুমি পার্টি, মালয়েশিয়ায় পাস ও আবিম, বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান-কাশ্মীর-শ্রীলংকায় জামায়াতে ইসলামী, আরব দেশগুলোতে ইখওয়ানুল মুসলিমুন, আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট, আফগানিস্তানের হেজবে ইসলামী ও জমিয়তে ইসলামী, তিউনিশিয়ায় আল নাহাদা, তুরস্কের ট্রুথ পার্টি ইত্যাদি এই ইসলামী আন্দোলনের সুবিশাল কাফেলার কয়েকটি নাম। এই কাফেলা সংগ্রাম করছে দেশ ও জনতার প্রকৃত মুক্তির জন্য। প্রথম স্বাধীনতা দেশের ভৌগোলিক স্বাধীনতা এনেছে, ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করেছে কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিরংকুশ হয়নি- অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাতো আসেইনি। ইসলামী আন্দোলন দ্বিতীয় মুক্তি, দ্বিতীয় স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করছে, সেই সংগ্রামের মাধ্যমেই আসবে ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আসবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আজাদী। ইসলামী আন্দোলন মুসলিম দেশগুলোর এবং ইসলামী জনতার স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচার আজ একমাত্র অবলম্বন।

এই বাস্তবতা যেহেতু সবার কাছেই পরিষ্কার সাবেক ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছে যারা এখনও শোষণ করছে মুসলিম দেশগুলোকে, পরিষ্কার ঔপনিবেশিকদের ধ্বংসাবশেষ সেকুলার মুসলিম শাসকদের কাছে, যাদের তরফ থেকে ইসলামী আন্দোলন আজ প্রবল বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ায় 'মাসুমি' পঞ্চাশের দশকে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, আজও তার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়নি। উপরন্তু বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করে ইসলামী আন্দোলনের রাজনৈতিক উত্থানকে বাধাপ্রাপ্ত করা হচ্ছে সেখানে। তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনকে কয়েকবার নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে এবং তার স্বাভাবিক চলার পথে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিউনিশিয়ায় ইসলামী আন্দোলন 'মুভমেন্ট অব ইসলামিক টেনডেনসি' অব্যাহত জেল-জুলুমের শিকার হয়ে এসেছে। সম্প্রতি তাকে নাম পাল্টাতে বাধ্য করা হয়েছে। তিউনিশিয়ার 'মুভমেন্ট অব ইসলামিক টেনডেনসি' এখন 'আল-নাহাদা' নাম নিয়ে আন্দোলন করছে। আলজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা আজ সকলের সামনে। মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমুনকে পঞ্চাশের দশকে বেআইনী করা হয়েছে। শীর্ষ কয়েকজন নেতার ফাঁসি দেয়া হয়েছে, জেল-জুলুমের শিকার হয়েছে হাজার হাজার কর্মী ও নেতা। সেখানে ইসলামী আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্য হেন কাজ নেই যা করা হয়নি। মিসরের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ইসলামী আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্য কতদূর নেমেছিল তার একটা সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ম্যাসাচুসেটস' বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Yvonne Y. Haddod তাঁর 'Islamic Awakening in Egypt' নিবন্ধে ১৯৮৫

www.amarboi.org

সালের একটা চিত্র এইভাবে এঁকেছেন, "In July of 1985 President Mubarak ordered the removal of all religion proclamation from public places. Overnight they disappeared. The government press explained that it was becoming a provocation and thus might lead to secterian division. Police at road blocks stopped cars and fined drivers for even carrying a dangling picture of a saint, an amulet, or a chain of prayer beads around the rear view mirror or on the dash board. The penalty for such demonstration of religions affiliation was the suspension of the car's registration for a year." অর্থাৎ ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক সকল প্রকাশ্য স্থান থেকে ধর্মীয় বাণীসমূহ অপসারণের নির্দেশ দিলেন। রাতারাতিই সেগুলো সরিয়ে ফেলা হলো। সরকারি সংবাদ মাধ্যম এই পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলল, ঐ বাণীসমূহ উস্কানিমূলক যা সাম্প্রদায়িক বিভক্তি ডেকে আনতে পারে। মোড়ে মোড়ে গাড়ি থামানো হতো এবং ড্রাইভারদেরকে এমনকি পীর-দরবেশ ধর্ম নেতাদের ছবি ঝুলিয়ে রাখা, কবচ রাখা, গাড়ির রিয়ার ভিউ আয়নায় তসবি ঝুলিয়ে রাখার জন্যও জরিমানা করা হতো। এই ধরনের ধর্মানুরুক্তি বা ধর্মপ্রীতি প্রদর্শনের শাস্তিস্বরূপ এক বছরের জন্য গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হতো।

কিন্তু এত কিছুর পরেও মিসরে ইসলামী আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়নি বরং মানুষের কাছে তার আবেদন আরও গভীরতর হয়েছে, তার প্রভাব আরও বিস্তৃতই হয়েছে। 'Carnegie Endowment for International Peace' এর সিনিয়র এ্যাসোসিয়েট Robin Wright তাঁর 'The Islamic Resurgence : A New Phase?' নিবন্ধে লিখেছেন, "Majore developments in 1987 indicated that the Islamic resurgence has taken deep root in the Middle-East with unprecedented impact in modern times. Its current depth and breadth, particularly in states long known for their stability and moderation, also indicate that Islam is almost certain to be the single most energetic force in the region for the foreseeable future ...... In Egypt's April election the Muslim brotherhood became the largest legal opposition force." অর্থাৎ "১৯৮৭ সালের প্রধান ঘটনাবলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণের শিকড় অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। মধ্যপ্রাচ্যের এমনকি স্থিতিশীল ও প্রগতিশীল

www.amarboi.org

দেশগুলোতেও ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের গভীরতা ও বিস্তার এ কথারই প্রমাণ দিচ্ছে যে, আগামীতে এ অঞ্চলে ইসলাম নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত শক্তিমান একক এক শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। মিসরে এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইখওয়ানুল মুসলিমুন সবচেয়ে বৃহৎ বৈধ বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।" উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে ইখওয়ানুল মুসলিমুনকে সরকার স্বাধীনভাবে এবং স্বাভাবিক কাজকর্মও করতে দেয়নি। নির্বাচনের আগে তাদের প্রায় তিন হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করে রাখা হয় এবং নির্বাচনের ফলাফলকে সরকার নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এরপরেও এই রেজাল্ট হয়েছে। শত বাধা সত্ত্বেও মিসরে যেমন ইসলামী আন্দোলনের বিস্তার ঘটছে, তেমন ঘটনা অন্যান্য মুসলিম দেশেও আমরা দেখছি। আলজেরিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের গতিরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে বহুদিন থেকে। আলজেরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাস করতো বামপন্থীরা, সন্ত্রাসের শিকার হতো ইসলামপন্থী ছাত্ররা, আবার উল্টো জেল-জুলুমের শিকারও হতো এই মজলুমরাই। ১৯৮৭ সালে ইসলামী আন্দোলনের ১৮৭ জন কর্মীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয় এবং শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন তাতে আরও গতিমানই হয়েছে। ১৯৯১ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট শতকরা ৮০ ভাগ আসন লাভ করে। এই নির্বাচনে বিজয়ের পরে ফ্রন্টের সকল শীর্ষনেতাকে এবং হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারও শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। এই নির্যাতন ও দমন নীতির পরেও এবং সকল শীর্ষনেতা ও অসংখ্য কর্মী জেলে থাকা সত্ত্বেও গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট ২৩১টি আসনের মধ্যে ১৮৮টি আসন লাভ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৯টি আসনের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল গত জানুয়ারি মাসে। নিশ্চিতভাবে এ নির্বাচনেও ইসলামী স্যালভেশন ফ্রন্টই বিজয়ী হতো। এই অবস্থা আঁচ করে সমগ্র নির্বাচনই বাতিল করে দেয়া হয়েছে এবং ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টের ওপর জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়েছে। ফ্রন্টকে নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। কিন্তু এসব পদক্ষেপ দ্বারা আলজেরিয়ায় ইসলামী আন্দোলনকে আরও জনপ্রিয়, আরও শক্তিশালীই করা হচ্ছে। তুরস্কেও ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করার এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ চালিয়ে যেতে না দেয়ার অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানকার সরকার। তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনকে কিছুদিন আগে তৃতীয় বার নাম পরিবর্তনে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের নতুন নাম হয়েছে 'ট্রুথ' পার্টি। এ নাম নিয়ে নির্বাচনে নেমেও এ দলটি সাম্প্রতিক নির্বাচন ১৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে, সরকার গঠনকারী দল পেয়েছে ৩০ শতাংশের মত। সমীক্ষকদের ভাষায় ইসলামী আন্দোলন সেখানে আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হয়েছে। অন্যান্য মুসলিম দেশেও এই

www.amarboi.org

একই অবস্থা। আফগানিস্তানে ৯ বছরব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তারা সোভিয়েত পরাশক্তিকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী আন্দোলন ক্রমবর্ধমান হারে তারুণ্যকে আকৃষ্ট করছে এবং যৌবন শক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামী হাজারো অপপ্রচার, বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও গত বছরের সাধারণ নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তির বিচারে তৃতীয় বৃহত্তম স্থানে উন্নীত হওয়া তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিতবহ। মালয়েশিয়ায় এই সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বলতর। ইন্দোনেশিয়ার তরুণরাও পিছিয়ে নেই। সরকারি দমননীতির কারণে সেখানে একটা আপাত নিস্তরঙ্গতা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ভেতরে ইসলামী জাগরণের অগ্নিশিখা সর্বব্যাপী ও দীপ্ততরই হয়ে উঠছে।

এক কথায় গোটা ইসলামী দুনিয়ায় ইসলামী আন্দোলন সকালের নতুন সূর্যশিখার মত দীপ্ত। দিনের আবর্তনের মত দিন যতই যাচ্ছে এই সূর্যশিখা ততই দীপ্ততর হয়ে উঠছে এবং তার প্রভাবে অন্ধকার হচ্ছে বিদূরিত। বিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত ইসলামের ঘাড়ে চড়ে জাতীয়তাবাদ মুসলিম দেশগুলোকে মুক্ত করেছে, এনেছে ভৌগোলিক স্বাধীনতা। বাকি আছে ঔপনিবেশিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষাদর্শের কবল থেকে মুসলমানদের মুক্ত করে তাদেরকে প্রকৃত স্বাধীন করার কাজ। এ দায়িত্ব ইসলামের। মুসলিম দুনিয়ার সর্বত্র ইসলামী আন্দোলন এ দায়িত্বই পালন করছে। এই আন্দোলনকে থামিয়ে দেবার সাধ্য আজ কারও নেই।

'মৌলবাদ', 'মধ্যযুগীয়' ইত্যাদি বলে উটপাখির মত কেউ এর দিক থেকে চোখ বন্ধ করে রাখতে পারেন তাতে এই বাস্তবতার কোন ব্যত্যয় ঘটবেনা। এ অন্ধরা চোখ বন্ধ করে সত্যকেই অস্বীকার করতে চায়। Yvonne H. Haddad -এর মত খ্রিস্টান চিন্তাবিদ পর্যন্ত আজ স্বীকার করছেন, "Thus Islam in posited as the only viable vision of a better world order. This (Islamic) religions literature is modern in idiom as well content, it takes the twentieth century seriously. Those who denigrate revivalists and relegate them to the Dark ages, the Middle Ages or the seventh century are at best completely missing the dynamics of the relevance of religion for modern life, or at worst, purposefully ignoring the new developments in the content and meaning of various Islamic doctrins" (Islamic Awakening' in Egypt ASQ, Volume 9 Number 3; Page 255) অর্থাৎ 'এইভাবে ইসলাম উৎকৃষ্টতর একক এক বিশ্ব ব্যবস্থার আস্থাশীল রূপরেখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইসলামী সাহিত্য, ভাষা এবং বিষয় সব দিক থেকেই আধুনিক যা

www.amarboi.org

সাংঘাতিকভাবে বিশ শতকের। যারা ইসলামী পুনর্জাগরণবাদীদের গাল দেয় এবং তাদেরকে অন্ধকার যুগ, মধ্যযুগ অথবা সাত শতকের মানুষ বলে অভিহিত করে তারা আধুনিক জীবনে ধর্মের সাযুজ্যতা ধরতে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হন অথবা ইসলামের বিভিন্ন মতবাদের অর্থ ও বিষয়ে যে উৎকর্ষতা এসেছে তা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই উপেক্ষা করেন।' সন্দেহ নেই ইসলামের সত্য এইভাবেই সূর্যের মত সকলের কাছে দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে। উটপাখিদেরও চোখ খুলবে, কুম্ভকর্ণদেরও ঘুম ভাঙবে।

শুধু ইসলামী দুনিয়া নয়, বিশ্বের সব স্থানে সব প্রান্তেই ইসলাম জীবন-রেনেসাঁর, প্রচণ্ড গতির এক বিকাশমান শক্তি হিসেবে আসন গাড়ছে। Robin Wright তাঁর 'The Islamic Ressurgence: A New Phase' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, "Muslim activism in politics is only one aspect of what is a world wide phenomenon. But because of its inherent mixture of religion and politics, Islam could well become one of the world's strongest ideological forces in the late twentieth century." মিঃ রবিন রাইট এখানে বিশ্বব্যাপী ইসলামের উত্থানকে আজকের স্বাভাবিক বিশ্ব প্রবণতার অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই সাথে স্বীকার করেছেন, ইসলামের এই উত্থান ঘটছে তার ধর্ম ও রাজনীতির স্বাভাবিক ও অবিমিশ্র মতবাদিক শক্তির কারণেই। এই শক্তিই ইসলামের প্রাণ এবং এই ক্ষেত্রে ইসলামের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দুনিয়াতে নেই। একথাও তারাই স্বীকার করেন। তাঁদের একজন Godfrey Jansen কি বলেছেন, প্রবন্ধের শুরুতেই তা তুলে ধরেছি। ইসলামের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিই একদিন জগৎ জয় করবে, যার যাত্রা শুরু হয়েছে।

 www.amarboi.org

সিপাহী বিপ্লবোত্তর মুসলিম রাজনীতি

১৮৫৭ সাল ব্রিটিশ-ভারতীয় রাজনীতির একটা টার্নিং পয়েন্ট। এই বছর ভারত শাসনকারী ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় সৈন্যের ব্যারাকসহ ভারতবর্ষের এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিপ্লব, অন্য কথায় প্রবল এক জন-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই জন অভ্যুত্থানকে আমাদের অনেক ইতিহাসকার 'প্রথম আযাদী আন্দোলন' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আমাদের মতে ইতিহাসের সাথে এমন বে-ঐতিহাসিকের মত কাণ্ড আর কিছুই হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পলাশী যুদ্ধের পর আযাদী হারা মুসলমানরা যখনই তাদের পরাধীন অবস্থার কথা অনুভব করেন তখন থেকেই তাদের আযাদী আন্দোলনের শুরু। ১৭৬৪ সালে বক্সারের রণাঙ্গনে অঙ্কুরেই নির্বাণ লাভ করে, তবু তাকে স্বাধীনতা প্রচেষ্টা না বললে ভুল হবে। তবে প্রতিরোধ ও আযাদী আন্দোলনের প্রকৃত আগুন জ্বলে ওঠে মুসলিম জনগণের কাতার থেকেই। তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজনেতা অর্থাৎ আলিম সমাজই এ সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। পলাশীর যুদ্ধের মাত্র ৬ বছর পরে ফকির আন্দোলনের নেতা মজনু শাহের বাহিনীর সাথে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নবাবের অনেক পলাতক সৈন্য এবং স্বাধীনতাকামী মানুষ ফকির মজনু শাহ্‌র পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। প্রায় তিন দশক ধরে বাংলার এক বিরাট অঞ্চলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। এদের সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে পড়ার পরে পরেই আমরা হাজী শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী প্রমুখ মুসলিম জননেতাকে ব্যাপক এবং প্রবল আযাদী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে দেখি। এদের সকলেরই সংগ্রাম সাধনার উৎস ছিল শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং তাঁর পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভীর শিক্ষা ও সংস্কার পরিকল্পনা। বস্তুত তিতুমীরের নারকেলবাড়িয়া এবং সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বালাকোটের মত দেশের অসংখ্য স্থানে তাঁরা উনিশ শতকের শুরু থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে রক্তলেখা ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেন, তারই একটা দৃশ্য ১৮৫৭ সালের সিপাহী আযাদী সংগ্রাম। তাই বলছিলাম, ১৮৫৭ সালের আযাদী সংগ্রাম প্রথম আযাদী সংগ্রাম নয়, সংগ্রামের অনেক দৃশ্যের মধ্যে একটা অবিস্মরণীয় দৃশ্যমাত্র। বলেছি, এই দৃশ্য ১৮৫৭ সালের আযাদী সংগ্রামের এই ঘটনা, ব্রিটিশ ভারতীয় রাজনীতির একটা টার্নিং পয়েন্ট। ১৭৫৭ সালের পর থেকে চলে আসা রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস যেন একটা বড় মোড় পরিবর্তন করে এখানে এসে। সমাজের সম্মুখ সারিতে কিছু চরিত্র বদল হয়, কিছু রূপ পরিবর্তন ঘটে। ঐতিহ্যিক সংগ্রামী চেতনা এখানে এসে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের পর যে মৌল রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তা এই ঃ

www.amarboi.org

ক. ব্রিটিশ-ভারতের শাসনভার কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে হস্তান্তর।

খ. ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু বাবু শ্রেণীর মাধ্যমে হিন্দু জাতীয় চেতনার উত্থান।

গ. মুসলিম সংগ্রামী শক্তির ধ্বংসস্তূপ থেকে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম আপসকামী শক্তির উদ্ভব।

এই রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো সামনে রাখলেই ১৮৫৭ সাল উত্তর মুসলিম রাজনীতির চরিত্র আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমে ধরা যাক, ভারতের কর্তৃত্ব কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজের হাতে যাওয়ার বিষয়টা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতের দখলপর্ব সমাপ্ত করার পর ক্ষমতা হস্তান্তরের এই অভিনয় সংঘটিত হয় ১৮৫৮ সালে। বাংলাদেশ পদানত করার সময় ক্লাইভ মহীশুর, হায়দ্রাবাদ, মারাঠা ও দিল্লীকে বশে আনার সময় ওয়েলেসলী ও কর্নওয়ালিস এবং সিন্ধুসহ পশ্চিম ভারত দখলে আনার জন্য ইংরেজ গভর্নর নেপিনার ষড়যন্ত্র ও পশুশক্তি বলে যে পাপের পাহাড় রচনা করেছিলেন যার বিরুদ্ধে সিপাহী জনতার একটা মরিয়া প্রতিক্রিয়া ছিল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, সে পাপকেই ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা ব্রিটিশরাজ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে চেয়েছিলেন। এই ক্ষমতা হস্তান্তরের মূলে আর যত কারণই থাকুক, সব দোষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঘাড়ে চাপিয়ে ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ সরকার ও জাতিকে নির্দোষ সাজানোর লক্ষ্যই ছিল মুখ্য। এই অস্ত্র তাদের বৃথা যায়নি। অন্তত স্তাবকরা নতুন ব্রিটিশ রাজের পক্ষে ওকালতি করার বিরাট সুযোগ পেয়েছিল। আর ব্রিটিশ সরকারও নতুন করে যাত্রা শুরুর যে সুযোগ থাকে, তা পুরোপুরি নিয়েছিল। বলাবাহুল্য, এই কৌশল প্রতিক্রিয়াকে ভিন্নমুখী করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি মজবুত করার পক্ষেই সহায়ক হয়েছিল। লক্ষণীয়, ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্রতিরোধের যে বহ্নিশিখা ইংরেজ শাসনকে নিরন্তর পুড়িয়েছে, পরবর্তী ৯০ বছর তাকে আমরা অনুপস্থিত দেখি। 'রাজানুগত প্রজাদের দাবি আদায়ের যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হয়েছে বটে, কিন্তু নারকেলবাড়িয়া ও বালাকোটের শহীদানদের মত উন্নতশির স্বাধীনতা সংগ্রামীর জ্বালানো বহ্নিশিখায় জ্বলতে হয়নি ব্রিটিশরাজকে। ১৮৫৭ সালের পর উইলিয়াম হাণ্টারের পর্যালোচনা এবং লর্ড মেকলের পরিকল্পনা অনুসরণ করে ব্রিটিশ রাজ আপসমূলক রাজনীতির যে বীজ বপন করেছিলেন, তারই পুরস্কার ছিল এটা। ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে এই আপসের রাজনীতির যারা উপকরণ হয়েছিলেন তাঁদের ইতিহাসই পরবর্তীকালের রাজনীতি। আমরা এখন সেই রাজনীতির আলোচনায় আসছি।

www.amarboi.org

এ পর্যায়ে প্রথমে আসে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু বাবু শ্রেণীর কথা। কিন্তু এ সম্পর্কে বলার আগে পলাশী উত্তর হিন্দু রাজনীতি সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ভারতে ব্রিটিশ শাসন অধিকাংশ হিন্দু নেতার কাছে প্রভু পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মুসলিম শাসনে তারা আশাতিরিক্ত ভালো ব্যবহারই পেয়েছে- একথা গুণীজনদের মুখ থেকেই শুনুন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাজা রামমোহন রায় বলেছেন, "মুসলিম শাসনে এ দেশের হিন্দু অধিবাসীরা মুসলমানদের মতই সকল প্রকার রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। রাষ্ট্রের উচ্চতম পদ, সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব, প্রাদেশিক শাসন ক্ষমতা, সম্মানিত মন্ত্রীর আসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে ধর্ম কিংবা জন্মস্থান কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতো না। হিন্দুরা ভূমি মঞ্জুরি লাভ করত, খাজনা মওকুফ পেত এবং উচ্চ বেতন ছাড়াও অফিস সংলগ্ন ভূমি ব্যবহারের দেদার সুযোগ তাদের ছিল।" (Memorial to the supreme court in Calcutta, 1823) কিন্তু মুসলিম শাসকদের এই ভালো ব্যবহারের কোন প্রকার স্বীকৃতি পলাশী উত্তর হিন্দুদের ব্যবহারে মেলেনি। এই সময় তাদের রাজনীতির সারকথা ছিল নতুন প্রভুদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে দিয়ে এবং তাদের সাহায্য নিয়ে পুরাতন প্রভু মুসলমানদেরকে যত পারা যায় নির্যাতন-নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট করে ফেলা। হিন্দুরা ইংরেজ প্রেমে এতখানিই অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে, বালাকোট ও নারকেলবাড়িয়ায় ভারতের মুসলমানরা যখন ইংরেজের হাতে জীবন দিচ্ছে, তখন তারা বলছে, "আমাদের যদি বলা হয় ব্রিটিশ কিংবা কার শাসন তোমরা চাও? উত্তরে আমরা এক বাক্যেই বলব- ব্রিটিশ শাসন। এমনকি হিন্দু শাসনও নয়।" (Daily 'reference' of the Hon'ble Prosonar Kumar Tagore, July, 1831) ১৮৫৭ সালে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ইংরেজের কামানের গোলায় জীবন দিচ্ছিল, তখন হিন্দু পত্রিকা লিখেছে, "আমরা পরমেশ্বরের সমীপে সর্বদা প্রার্থনা করি, পুরুষানুক্রমে যেন ইংরেজাধিকারে থাকিতে পারি; ভারত ভূমি কত পুণ্য করিয়াছিলেন এই কারণে ইংরেজ স্বামী পাইয়াছেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত যেন ইংরেজ ভুপালদিগের মুখের পান হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন।" (সংবাদ ভাস্কর, ২০ জুন, ১৮৫৭) স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে হিন্দু পত্রিকাগুলো কি দৃষ্টিতে দেখেছে, বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি কি নিষ্ঠুর মনোভাব প্রকাশ করেছে, তার অনেক দৃষ্টান্তের একটা এখানে তুলে ধরছি। ১৮৫৭ সালের ১৮ ও ২০ জুনের 'সংবাদ ভাস্কর' লেখে, "আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, অযোধ্যা, লাহোর প্রদেশীয় ভাস্কর পাঠক মহাশয়রা এই বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং পাঠ করিয়া বিদ্রোহীদের আড্ডায় আড্ডায় ইহা রাষ্ট্র করিয়া দিবেন, সিপাহীরা জানুক ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সিপাহী ধরা আরম্ভ করিয়াছেন, আর বিদ্রোহী সিপাহী সকল শোন শোন, তোদের সর্বনাশ উপস্থিত হইল, যদি কল্যাণ চাহিস তবে এখনও ব্রিটিশ পদানত হইয়া প্রার্থনা কর- ক্ষমা করুন। ---- গত বুধবার বেলা দুই

www.amarboi.org

প্রহর দুই ঘণ্টাকালে সৈন্য পরিপূর্ণ এক জাহাজ উত্তর দিক হইতে আসিয়া কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণাংশে লাগিল। সে সময় উক্ত জাহাজ অতি সুদৃশ্য দৃষ্ট হইল, গোরা সৈন্যরা পাঁচশ' সিপাহীকে হাতে হাতকড়া পায়ে বেড়ী দিয়া লইয়া আসিয়াছে, গভর্নমেন্ট সিপাহীদিগের প্রতি যে প্রকার ক্রোধ করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে বলিদান দিবেন ইহাই জ্ঞানগ্রাহ্য হইতেছে। কালিঘাটে বহুকাল নরবলি হয় নাই। আমাদিগের রাজেশ্বর যদি হিন্দু হইতেন তবে এই সকল নরবলি দ্বারা জগদম্বার তৃপ্তি করিতেন।" বস্তুত হিন্দুদের পলাশী উত্তর রাজনীতিই ছিল ইংরেজ তোষণ ও মুসলমানদের বিরোধিতা। ইংরেজদের নিকট এর পুরস্কারও তারা লাভ করে। পলাশী যুদ্ধের একশ' বছরের মধ্যে সহায়-সম্পদে সমৃদ্ধ মুসলমানরা কাঠুরে ও ভিস্তিওয়ালার জাতিতে পরিণত হয়। আর তাদের হস্তচ্যুত সম্পদের বৃহত্তর অংশই প্রতিবেশী হিন্দুদের হাতে গিয়ে জমা হয়। এই সম্পদ ভোগের চৌহদ্দিতেই হিন্দু বাবু শ্রেণীর জন্ম এবং তাদের জাতীয়তাবাদী উত্থানের মূলে আরেকটি উপসর্গ কাজ করেছে।

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশরাজ ভারতের শাসনভার হাতে নেয়ার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে ভারতের শাসনকার্যে সংশ্লিষ্ট করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। শাসন কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষিত ভারতবাসীকে ধীরে ধীরে সুযোগ দেয়ার কাজও শুরু করা হয়। হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল বলেই এই সুযোগ ষোল আনা তাদেরই ভাগ্যে জুটতে থাকে। এভাবে ইংরেজি শিক্ষিত এক হিন্দু বা শ্রেণীর বিকাশ ঘটে যাদের রাজভক্তি ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু সেই সাথে তাদের মধ্যে জাতীয় অধিকার চেতনারও বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৮৫৭ সালের পূর্বে যেখানে হিন্দুরা ইংরেজদের স্তর ও বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া স্বার্থ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল, সেখানে ১৮৫৭ সালের পূর্ব ইংরেজদের স্তর গাথা থাকল কিন্তু আগের সেই বিচ্ছিন্ন স্বার্থ চিন্তাটা জাতীয় স্বার্থ চিন্তায় রূপ পরিগ্রহ করল। ব্রিটিশ প্রশাসনে অংশ ও মর্যাদা নিয়েই এই চিন্তার শুরু। ১৮৫৮ সালের রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় সরকারি চাকরিতে ভারতীয়দেরকে যে সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কথা বলা হয়, তা ১৮৬১ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এ্যাক্টে পরিণত হয়। কিন্তু ইংরেজরা এই এ্যাক্ট অনুসারে ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধা দিত না। বিশেষ করে সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ তারা এড়িয়ে চলত। এই সময়ের একটা ঘটনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আন্দোলনে রূপ নেয়। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হন। কিন্তু তাঁকে তালিকা থেকে বাদ দেবার চেষ্টা করা হয়। পরে মহারাণীর খাস বিচারালয়ের হস্তক্ষেপে তাঁর চাকরি দেয়া হয়। কিন্তু স্যার সুরেন্দ্রনাথকে চাকরি দিয়েও বরখাস্ত করা হয়। চাকরি বঞ্চিত স্যার সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয়দের পক্ষ থেকে আন্দোলনে নামেন এবং "ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ-ভারতে হিন্দুদের এটাই

www.amarboi.org

প্রথম প্রতিবাদমূলক একটি গণ-প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তারও জন্ম আবার অনুগত প্রজা হিসেবে চাকরির অধিকার আদায়ের জন্যই। উত্তরকালে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'আর্মস এ্যাক্ট', 'ভার্নেকুলার প্রেস এ্যাক্ট' প্রভৃতির মত বিভিন্ন ধরনের শাসনতান্ত্রিক অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়। এই আন্দোলনেরই এক পর্যায়ে ১৮৮৫ সালে এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম নামে একজন প্রাক্তন ইংরেজ সিভিল সার্জেন্ট-এর উদ্যোগে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল, রাজানুগত ভারতবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা থেকে দেশকে রক্ষা করা। পরে গভর্নর জেনারেল ডাফরিনের পরামর্শক্রমেই কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় কংগ্রেস মুখ্যত ব্রিটিশ আগ্রহেই দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। কংগ্রেস মহলে ব্রিটিশ পদ, পদবি ও খেতাবের ছড়াছড়ি পড়ে যায়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, যাকে সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, তাঁকেও 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইতিহাস এ ব্যাপারে একমত যে, রাজানুগত ইংরেজি শিক্ষিত এই বাবু শ্রেণীই জনগণের উত্থান চেতনার বাগডোরা হাতে রেখে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নাম করে ভারতীয়দের অসন্তোষ উত্তেজনা দুই যুগেরও বেশীকাল ঠেকিয়ে রাখে এবং এভাবে এই সংস্থা, ঐতিহাসিকদের ভাষায়, "বিদেশী প্রভুদের স্বার্থে একটি ঘা-চোষক গদি"র কাজ করে যায়। বিশ শতকের শুরুর দিকে কংগ্রেস গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের নেতৃত্বে মধ্যপন্থী এবং বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখের নেতৃত্বে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী- এই দুই উপধারায় বিভক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। বলা যায়, এ পর্যায়ে এসেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস তথা হিন্দু রাজনীতি নতুন এক মোড় পরিবর্তন করে, যা ১৮৫৭ সাল-উত্তর মুসলিম রাজনীতিকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে।

১৮৫৭ সাল-উত্তর মুসলিম রাজনীতির যে শিরোনাম আমরা দিয়েছি তা হলো, মুসলিম সংগ্রামী শক্তির ধ্বংসস্তূপ থেকে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম আপসকামী শক্তির উত্থান। পলাশী প্রান্তরে মুসলিম রাজশক্তির ভাগ্য বিপর্যয়ের পর মুসলিম সমাজনেতা তথা আলেম সমাজ স্বাধীনতা সংগ্রামের যে আপসহীন পতাকা উত্তোলন করেন, ১৮৫৭ সালে ইংরেজরা তাকেই সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়ার চেষ্টা করে। ১৮৭১ সালে ভারতীয় রাজনীতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে স্যার উইলিয়াম হাণ্টার লেখেন, "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারত গভর্নমেন্ট যদি পূর্ব থেকেই ষড়যন্ত্র আইনের ৩নং ধারা অনুযায়ী ভারতের আলেমদের কঠোর হস্তে শাসন করতো তাহলে ভারত গভর্নমেন্টকে মুজাহিদ আলেমদের আক্রমণের ফলে এত দুঃখ ভোগ করতে হতো না। কতিপয় আলেমকে গ্রেফতার করা হলে আম্বালা ঘাঁটিতে আমাদের এক সহস্র সৈন্য হতাহত হতো না এবং লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড অর্থ বেঁচে যেত। এমনকি উক্ত লড়াই এর পরও যদি কঠোর হস্তে

www.amarboi.org

আলেমদেরকে দমন করা হতো, তবে অন্ততপক্ষে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কালাপাহাড় অভিযান হতে রক্ষা পাওয়ার আশা ছিল।" উইলিয়াম হান্টার এখানে আলেমদের কঠোর হস্তে দমন না করায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, ইংরেজরা তাদের সাধ্য অনুসারে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে কোন কঠোরতাই বাদ রাখেনি। কাফির বিদ্রোহকে তারা কঠোর হাতেই দমন করেছে। তিতুমীর ও হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র সংগ্রামকেও দমন করার জন্য হেন নির্মমতা নেই যা ইংরেজরা অবলম্বন করেনি। সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্তৃত সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর স্বাধীনতা সংগ্রামকেও শত রকম নির্যাতনের মাধ্যমে নাস্তানুবাদ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এত করেও আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করা যায়নি।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হবার পর যে হত্যালীলা শুরু হয় তারও বড় শিকার হয়ে দাঁড়ায় আলেম সমাজ। বিপ্লব পরবর্তীকালে শত শত আলেম শাহাদাত বরণ করেন। শুধু ফাঁসিতেই শাহাদাত বরণ করেন প্রায় সাতশ' আলেম। মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী, মওলানা ইয়াহইয়া আলী, মওলানা আবু জাফর থানেশ্বরী, মওলানা মুফতি এনায়েত আলী প্রমুখ শত শত আলেমকে আন্দোলনে নির্বাসন দেয়া হয়। এক কথায় মুসলিম সংগ্রামী শক্তিকে সেদিন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা চলে। সেদিনের দিল্লীর বিবরণ দিতে গিয়ে কবি গালিব লিখেছেন, "মুসলমানদের অবস্থা দেখে কাঁদবে এমন একজন মুসলমানও দিল্লীতে অবশিষ্ট ছিল না।" আর মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী তাঁর আত্মকথায় লেখেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে প্রমাণ হলেই কোন হিন্দুকে ধরা হোত কিন্তু পালাতে পারেনি এমন কোন মুসলমান সেদিন বাঁচেনি।"

ভারতবর্ষব্যাপী এই গণহত্যার পরও মুসলমানদের সংগ্রামী শক্তির অস্তিত্ব টিকে থাকে। সিপাহী বিপ্লবোত্তর রাজনীতিতে এদের ভূমিকা একেবারে গৌণ নয়। ১৮৫৭ সালের আযাদী সংগ্রামের সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম ইয়াগিস্তানে বালাকোটের ধ্বংসাবশিষ্ট বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ মওলানা বেলায়েত আলীর ভাই মওলানা এনায়েত আলী। আর ভারতের অভ্যন্তরে এ আন্দোলন সংগঠনের কঠিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন মওলানা ইয়াহইয়া আলী, যিনি সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠনের কাজেও অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিপ্লব পরবর্তী কঠিন নির্মূল অভিযানের পরও সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর বিপ্লবী আন্দোলনের কাজ মওলানা আবদুল্লাহ, মওলানা আবদুল করিম ও মওলানা নেয়ামতুল্লাহ প্রমুখের মত সংগ্রামী আলেমের নেতৃত্বে সামনে এগিয়ে চলে, যা ছিল মানুষের কাছে সংগ্রাম ও প্রতিবাদী চিন্তার প্রতীক হিসেবে অনুপ্রেরণার উৎস। এরই পাশাপাশি ১৮৫৭ সালের সংগ্রামী আলেমদের আরেকটি দল দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে

www.amarboi.org

মুসলমানদের অন্তরে বিপ্লবের স্ফুলিংগ অনির্বাণ রাখার কাজে ব্রতী হন। সিপাহী বিপ্লবের দিল্লী ফ্রন্টের অন্যতম সংগঠক হাজী এবাদুল্লাহ গ্রেফতারের কঠিন পরওয়ানা এড়িয়ে মক্কায় হিজরত করেন এবং সেখান থেকেই তিনি আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। দিল্লী যুদ্ধে আহত মওলানা কাশেম নানতুবীর মাথার উপরও গ্রেফতারি পরওয়ানা ঝুলছিল। তিনিও বেরিয়ে এলেন দিল্লী থেকে। মওলানা কাশেম নানতুবীই ১৮৬৬ সালে দিল্লীস্থ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর রহিমিয়া মাদ্রাসার অনুকরণে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। উল্লেখ্য, মওলানা কাশেম নানতুবীর নিকট মওলানা মামলুকুল আলী ছিলেন বালাকোট-পরবর্তী বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা শাহ ইসহাকের কেন্দ্রীয় বিপ্লবী পরিষদের সদস্য। আরো উল্লেখ্য, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রথম প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব যিনি নেন তিনি এই মওলানা মামলুকুল আলীর পুত্র মওলানা ইয়াকুব। এভাবে দেওবন্দ মাদ্রাসা দিল্লীর রহিমিয়া মাদ্রাসার মতই বিপ্লবী মুজাহিদ তৈরির আরেক কারখানায় পরিণত হয়। উত্তরকালে এই মাদ্রাসা থেকে যারা বেরিয়ে আসেন তারা মুসলমানদের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সব রকমের তৎপরতাসহ দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'অসহযোগ আন্দোলন', 'খিলাফত আন্দোলন' এবং 'দেশ বিভাগের আন্দোলন' -এ অমূল্য ভূমিকা পালন করেন।

কিন্তু স্বীকার করতেই হবে সিপাহী বিপ্লবোত্তর মুসলিম রাজনীতিতে আপসহীন মুজাহিদদের এই সংগ্রামী কাফেলা সামনের কাতার থেকে ধীরে ধীরে পেছনের কাতারে সরে যায়। সামনে এসে দাঁড়ায় মুসলিম রাজনীতির আপসকামী এক ধারা। এই আপমকামী ধারার অগ্রপথিক ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রশাসনের সাবেক ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারপতি মওলানা আবদুল লতিফ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাবেক মুন্সেফ স্যার খেতাবপ্রাপ্ত সৈয়দ আহমদ খান এবং ব্রিটিশ বিচার বিভাগের কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী। তাঁরা মুসলিম সমাজের সমস্যাকে ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবলোকন করেন। তদানীন্তন পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁরা মনে করেন, সহযোগিতার মাধ্যমেই মুসলিম জাতিকে তাদের অধিকার আদায় করতে হবে। সহযোগিতার মাধ্যমেই ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে জাতীয় স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্রে হিন্দুরা বহুদূর এগিয়ে গেছে, এটা লক্ষ্য করেই তাঁরা জাতির জন্য এই চিন্তা করেন। নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং সৈয়দ আমীর আলী তিনজনই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, ভারতে আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকতে হলে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। বস্তুত ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত নওয়াব আবদুল লতিফের 'ক্যালকাটা মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত স্যার সৈয়দ আহমদ খানের 'গাজীপুর ট্রান্সলেশন সোসাইটি' যা পরে 'আলিগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি' নাম পরিগ্রহ করে এবং ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত

www.amarboi.org

সৈয়দ আমীর আলীর 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের একই লক্ষ্যে কাজ করেছে। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের 'আলীগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি' ১৮৭৫ সালে 'আলিগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে' রূপলাভ করে। সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তার সাথে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও নওয়াব আবদুল লতিফের চিন্তার কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সৈয়দ আমীর আলীর চেষ্টা ছিল, নৈতিক পুনর্গঠন ও অবিরাম রাজনৈতিক চেষ্টার মাধ্যমেই ভারতীয় মুসলমানদের যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়ার প্রতি সরকারের স্বীকৃতি আদায় করা। কিন্তু নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আহমদ খান চাইতেন, মুসলমানদের সংঘাতের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করে সামাজিকভাবে তাদের যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠা করা। যাহোক, তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় মুসলমানদের বৈষয়িক উপকার অবশ্যই হলো। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আহমদ খান ও সৈয়দ আমীর আলী কোলকাতায় মিলিত হন এবং একই কর্মপন্থা অনুসরণ করতে একমত হন। ১৮৮৫ সালে তাঁদের অব্যাহত দাবি দাওয়ার অধিকাংশই ব্রিটিশ সরকার মেনে নেয়। এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত এবং চাকরি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত হয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে অগ্রগতি অর্জনের ১৮৫৭ সাল-উত্তর এই চিন্তা ১৮৫৭ সাল-পূর্ব একশ' বছরের মুসলিম রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তবু সময়ের প্রেক্ষাপটে এবং হিন্দুদের উন্নতি-উত্থানের পটভূমিতে এই চিন্তাই ক্রমশ প্রসার লাভ করতে থাকে। এর ফলে ইংরেজি শিক্ষিত রাজানুগত নতুন এক মুসলিম শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। একমাত্র জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে পার্থক্য ছাড়া নব উত্থিত হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর সাথে এদের তেমন পার্থক্য ছিল না। মূলত এদের হাতেই হিন্দুদের উগ্র জাতীয়তাবাদী বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সময়ের অপরিহার্য প্রয়োজনকে সামনে রেখে ১৯০৬ সালে মুসলমানদের জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। স্যার সুরেন্দ্রনাথের হিন্দু জাতীয় চেতনা যেমন ছিল, নওয়াব সলিমুল্লাহও তেমনি জাতীয় চেতনা নিয়ে মুসলিম লীগের পত্তন করেন। এভাবে ১৮৫৭ সালের পর মুসলিম রাজনীতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ইসলামী জিন্দেগীর পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ মুসলমানদের স্বাধীনতা অর্জন ছিল এর মূল কথা। কিন্তু ব্রিটিশের সাথে আপসকামিতার পথ ধরে পরে যে জাতীয় আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল মুসলিম লীগের মাধ্যমে, তার মূল কথা ছিল জাতীয় স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধান। ব্রিটিশ রাজের অনুগত প্রজা হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতির জন্য ন্যায্য অধিকার আদায়ই ছিল এর লক্ষ্য। অবশ্য এই একই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেস যেমন পরে

www.amarboi.org

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্লাটফর্মে পরিণত হয়, তেমনি মুসলিম লীগও ভারতীয় মুসলমানদের আজাদী সংগ্রামের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

আমরা আগেই বলেছি, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনীতিতে একটা বড় ধরনের মোড় পরিবর্তন ঘটে, যেমনিভাবে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ উনিশ শতকের রাজনীতিতে একটা মাইলস্টোন প্রমাণিত হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসন কার্যের সুবিধার জন্যই ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে আলাদা প্রদেশ গঠন করে। এতে মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই লাভবান হয়। পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের এই লাভ হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। মুসলিমবিদ্বেষী হিন্দু রাজনীতি যেখানে মুসলমানদের এদেশে বাস করার অধিকারই স্বীকার করতে চায় না, সেখানে মুসলমানদের জন্য এই লাভটা তারা বরদাশত করতে পারবে কেমন করে? এখানে স্মর্তব্য, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সংকীর্ণ পরিসরে হিন্দুদের পুনরুত্থান আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। স্বামী দয়ানন্দের 'আর্য সমাজ' ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। 'ভারত শুধু ভারতীয়দের জন্য'- এটা ছিল তাদের প্রধান শ্লোগান। তারা ভারতীয় বলতে কেবল হিন্দুদেরকেই বুঝাত। স্বামী দয়ানন্দ ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলমানকে এদেশের সন্তান হিসেবে গণ্য করতেও অস্বীকার করেন। তাঁর শুদ্ধি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের অহিন্দুদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা। ১৮৮৩ সালে দয়ানন্দ মারা যান। কিন্তু বালগংগাধর তিলক, লালাহংসরাজ, লালা লাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ কংগ্রেস নেতা দয়ানন্দের আন্দোলন আরো দক্ষতার সাথে সামনে এগিয়ে নেন। এরই পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দও রামকৃষ্ণ মিশনকে এক চরমপন্থী হিন্দু সংস্কার সংস্থায় রূপান্তরিত করেন। এভাবে হিন্দু স্বার্থ কংগ্রেসেরও স্বার্থ হয়ে দাঁড়ায়। এমন একটা পরিবেশেই বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেয়া হয়। কোলকাতাকে কেন্দ্র করে হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। কংগ্রেস নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে। সকল হিন্দু নেতাই এর সাথে যোগ দিলেন। এমনকি উদারপন্থী গোপালকৃষ্ণ গোখেলও বাদ থাকলেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের শুভেচ্ছাপুষ্ট 'অনুশীলন সমিতি' বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ১৯০৬ সালের দিকে পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। কংগ্রেস সাংগঠনিকভাবে এর সাথে জড়িত হয়ে পড়ায় সমগ্র দেশের পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য অগ্নিগর্ভ হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের সার্বিক মারমুখো এই পরিস্থিতিতেই মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার উপায় হিসেবে নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে আয়োজিত নওয়াব ভিখারুল মূলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঢাকা বৈঠকে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু স্যার সলিমুল্লাহর ব্যাকুলতা এবং মুসলিম লীগের চেষ্টা কোনই কাজে এলো না। ব্রিটিশরাজ

www.amarboi.org

হিন্দুদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করল এবং ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশরাজ স্বয়ং দিল্লী এসে বঙ্গভঙ্গ রহিত করার ঘোষণা দিলেন। এই সালে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভগ্নহৃদয় স্যার সলিমুল্লাহকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করা হলো। যাহোক এ ঘটনা হিন্দু-মুসলিম দুই জাতিকে পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং কংগ্রেস সম্পর্কে কংগ্রেসপ্রেমিক মুসলমানদেরও মোহ ভঙ্গ ঘটায়। এ সময় সৈয়দ আমির আলীর আহ্বানে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। একটা ক্ষেত্রে মুসলমানরা এ সময় একটি বিজয় লাভ করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী হিন্দু আন্দোলন যখন আকাশ-বাতাস বিষিয়ে তুলছিল, সেই সময় বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের পক্ষ থেকে সৈয়দ আমির আলীর নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন ভারত-সচিব লর্ড মর্লের সাথে দেখা করে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা আদায় করেন। মুসলমানদের পৃথক জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতি হিসেবে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম রাজনীতির আধুনিক পর্বে এই যে দুই স্বতন্ত্র যাত্রা শুরু হলো, তাই ১৯৪৭ সালে দুই জাতির জন্য দুটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি সৃষ্টি করে। মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে ইংরেজি শিক্ষা সৃষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রধান ভূমিকায় থাকেন বটে, কিন্তু তারা যে শক্তি ও ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করেন, তার ষোল আনা নির্মাতাই ছিলেন ১৮৫৭ সালের পর রাজনীতির ক্ষেত্রে পেছনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ানো মুসলিম জননেতা আলেম সমাজ। এই উপমহাদেশে লক্ষ লক্ষ আলেম নীরবে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন, তা যদি সংগৃহীত হয় তাহলে জানা যাবে তাঁদের অবদান কত বড়, কত মহৎ। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই মুসলিম সমাজকে এবং সেই সাথে আপসকামী মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদেরকে হিন্দু ষড়যন্ত্রের গ্রাসে পরিণত হবার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তবে একথা ঠিক, সিপাহী বিপ্লব-উত্তর রাজনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিন্দু জাতিসত্তার মারমুখো পুনরুত্থান। মুসলমানদের আপসহীন সংগ্রামী শক্তির পেছনে সরে যাওয়া এবং নব উত্থিত মুসলিম আপোষকামী শক্তির সহজাত দুর্বলতার অনুকূল ভূমিতেই এই হিন্দু পুনরুত্থান শক্তির চারা গাছ গজিয়েছিল। সে চারা গাছ আজ মহীরুহ। ১৮৫৭ সালের পর আমাদের আপসকামীদের সেই যে অনুগ্রহ ভিক্ষা শুরু হয়েছিল, বলা যায়, তা আজ এক জাতীয় রূপ পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও পরবর্তী ৯০ বছরের মুসলিম রাজনীতি একটা ফল দিয়েছে, কিন্তু তা স্মৃতিকে বেদনার্তই করে। ১৯০ বছরের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের চাওয়া আমাদের এই পাওয়ার মধ্যে মিলে না। পুরো সেই পাওয়ার তৃপ্তি অতৃপ্তই রয়ে গেছে।

www.amarboi.org

মুসলিম সংহতি-আন্দোলন

মুসলিম জাতির পরিচয় সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুসলিম জাতিকে দুনিয়ার সব মানুষের জন্য তার নির্দেশিত ও পছন্দনীয় জীবন যাপনের সাক্ষী হিসেবে এবং সর্বোত্তম জাতি হিসেবে দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের জন্য পাঠিয়েছেন। এই ভাগ্যবান জাতিরই সংহতি আন্দোলন এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি সম্পর্কেই আমি বলছি। সংহতি আন্দোলনের প্রশ্ন কখন আসে? সংহতি যখন থাকে না তখন। সংহতি যে আজ নেই তা কাউকেই বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ শুধু সংহতি নেই নয়, প্রায় অর্ধশত খণ্ডে বিভক্ত মুসলিম বিশ্ব আজ নানা প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত। সংহতি আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলার আগে আল্লাহ মনোনীত সর্বোত্তম এই জাতি কিভাবে এ অবস্থায় পৌঁছল সেই দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক ইতিহাসের দিকে কিঞ্চিৎ নজর ফেরানো দরকার। খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগ শেষ হবার পর রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে খিলাফত ব্যবস্থার বদলে প্রকৃত অর্থে মুলুকিয়াত বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। নামে কিন্তু তা খিলাফতই থাকল। মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের চত্বর থেকে এটাই প্রথম বড় ধরনের পদস্খলন। আকিদা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত এই পদস্খলন রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার পথ খুলে দিল। এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে থাকল ওপর থেকে নিচের দিকে। অধঃপতন হয়ে উঠতে লাগল সর্বব্যাপী।

মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর এর এমন এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হলো যা পরিণামে ইসলামের বিশ্ব সয়লাবি অগ্রযাত্রাকেই স্তব্ধ করে দিল। ইতিহাস সাক্ষী, বাগদাদের পতনের পর ইসলামের ভৌগোলিক বিস্তারও বন্ধ হয়ে যায়। ইতিহাসের আরো সাক্ষ্য ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের যে পতন তা হালাকু খানের কাছে ঘটেনি, ঘটেছে নিজেদের অনৈক্য ও পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের কাছে। বাগদাদের পতন ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় ইসলামের অগ্রগতিই শুধু বন্ধ করে দিল না, মুসলমানদের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাও কোথায় যেন হারিয়ে গেল। গোটা বিশ্বে ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়ার মত জীবন্ত ও গতিশীল কোন আন্দোলনের ক্ষেত্রে গতিহীন কোন অবস্থা থাকতে পারে না। এ কারণে মুসলিম জাতীয় জীবন ও তার অগ্রগতি হারিয়ে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। সুতরাং যেদিন সে তার অগ্রগতি হারাল, সেদিন থেকেই তার পতন শুরু হলো। বাগদাদের পতনের পরপরই সিসিলিসহ ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য দ্বীপ থেকে মুসলমানদের বহিষ্কৃত হতে হলো। আর ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই গৌরবোজ্জ্বল মুসলিম সভ্যতার পাদপীঠ স্পেন থেকে মুসলমানরা উৎখাত হয়ে গেল।

www.amarboi.org

১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী সুলতান সোলায়মানের মৃত্যু ঘটার পর ওসমানীয় খিলাফতের পতন ঘটতে থাকে এবং ১৯২৯ সালে কামাল আতাতুর্কের হাতে খিলাফতের উৎখাত ঘটার মাধ্যমে এই পতন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। মুসলিম বিশ্বের যে ক্ষীণ কেন্দ্রটুকু এতদিন টিকে ছিল তাও এইভাবে শেষ হয়ে গেল এবং মুসলিম বিশ্বের অবস্থা এর পর সুতা ছেঁড়া মালার মত হয়ে দাঁড়াল। মুসলিম বিশ্ব খণ্ড-বিখণ্ড ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পূর্ণ হয়ে গেল। এখানে উল্লেখ্য, ওসমানীয় খিলাফতের যখন পতন ঘটেছিল এবং উত্তর আফ্রিকা এবং পূর্ব এশিয়ার মুসলিম রাজ্যগুলো দ্বন্দ্ব-সংঘাতে যখন দুর্বল হয়ে পড়ছিল, তখন ইউরোপে খ্রিস্টান শক্তি জ্ঞান ও শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল। ১৯২১ সালে ওসমানীয় খিলাফতের যখন পতন ঘটল, তখন দেখা গেল গুটিকয়েক ছাড়া স্বাধীন মুসলিম দেশ আর অবশিষ্ট নেই। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শক্তিরও দিন ফুরালো। একে একে মুসলিম দেশগুলো স্বাধীন হলো। দেশ স্বাধীন হলো বটে, কিন্তু মুসলিম জাতীয় জীবন স্বাধীন হতে পারলো না। ভাষা অথবা আঞ্চলিক দিক থেকে জাতীয় রাষ্ট্রের তারা মালিক হলো, কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের যে বিকৃতির কারণে তাদের অধঃপতন, পরিশেষে পরাধীনতা এসেছিল সে বিকৃতি অনেক ক্ষেত্রে আরও গভীরতর হলো। নব্য স্বাধীন অধিকাংশ মুসলিম দেশে যারা ক্ষমতায় বসল, তারা ঔপনিবেশিক শাসকদের ধ্যান-ধারণারই সৃষ্টি। সুতরাং ক্ষমতার হাতবদল ছাড়া মৌলিক কোন পরিবর্তন এলো না। যে বিভেদ-বিদ্বেষ আগে ছিল, সেটাই আবার অন্য নামে অন্য রংয়ে আসন গেড়ে বসল। মুসলিম বিশ্বের এই অধঃপতিত দশাই আমরা আজ অবলোকন করছি।

এবার অধঃপতিত এই মুসলিম বিশ্বের সংহতির আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। আগেই বলেছি, খোলাফায়ে রাশেদীনের পর শাসক মহলে ক্রমবর্ধমান যে পদস্খলন সূচিত হয়, তা-ই ওপর থেকে নিচের দিকে সংক্রমিত হয়ে অনৈক্য ও বিভেদ-বিদ্বেষকে বল্গাহীন করে তোলে। এই অধঃপতনের যাত্রা যখন থেকে শুরু প্রায় তখন থেকেই শুরু সংহতি আন্দোলন। এই সংহতি আন্দোলনকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। তার একটি মুসলিম সমাজ ও সরকারের সংস্কার আন্দোলন, অপরটি মুসলিম বিশ্বের আন্তঃরাষ্ট্র ঐক্যের আন্দোলন। মুসলিম সমাজ ও সরকারের সংস্থার আন্দোলনকে আবার দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। তার একটি হলো একক বা ব্যক্তি পর্যায়ের অন্যটি প্রাতিষ্ঠানিক। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ঐক্যের প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলন যেহেতু মুসলিম সমাজ ও সরকারের সংস্কার আন্দোলনেরই একটি দল এবং সেহেতু সংস্কার আন্দোলন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য আন্দোলনের চেয়ে প্রায় ১২শ' বছরের বড়, তাই প্রথমে সংস্কার আন্দোলন থেকেই আমরা আলোচনা শুরু করছি।

www.amarboi.org

একক বা ব্যক্তি পর্যায়ের সংস্কার আন্দোলন ঃ

খোলাফায়ে রাশেদিনের পর উমাইয়া বংশের খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের সময় খিলাফত ব্যবস্থা একবার বিদ্যুৎ চমকের মত সোনালী যুগের রূপ পরিগ্রহ করার পর আবার তা অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সেই অন্ধকারে আলোকবর্তিকার মত কয়েকজন জগদ্বিখ্যাত মুসলিম সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে চার ইমাম হযরত ইমাম আবু হানিফা (র), হযরত ইমাম মালিক (র), হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সংস্কার আন্দোলনের কাল খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীর শুরু থেকে ৯ম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তাঁদের আন্দোলনের শক্তিমত্তার পরবর্তী সাত-আট শতাব্দী পর্যন্ত মুজতাহিদ সৃষ্টি করতে থাকে। তাঁরা মুসলিম সমাজের অধঃগতির পটভূমিতে দ্বীনের মূল নীতির ভিত্তিতে শরীয়তের কাঠামোকে পরিপূর্ণভাবে শাসককুল ও মুসলিম সমাজের সামনে নিয়ে আসেন। পদস্খলিত ও আদর্শ বিচ্যুত তদানীন্তন খিলাফত ব্যবস্থার সাথে নিঃসম্পর্ক থেকে, শাসককুলের সবরকম অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত হয়ে এবং তাঁদের মোকাবিলা করে তাঁরা হককে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেন। এই দুঃসাহসিক কাজে তারা অপরিসীম দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করেন। ইমাম আবু হানিফা (র) উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় খলিফাদের আমলেই বেত্রদণ্ড ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। এমনকি অবশেষে তাঁকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়। ইমাম মালিক (র) কে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুরের আমলে বেত্রদণ্ড দেয়া হয় এবং তাঁকে এমন ভীষণভাবে পিছমোড়া করে বাঁধা হয় যে, তাঁর দুটি হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ওপর আব্বাসীয় খলিফা মামুন, মোতাসিব ও ওয়াসিক তিনজনের আমলেই অবিরাম নির্যাতন চালানো হয়। বলা হয়ে থাকে, তাঁর ওপর এত মারপিট হয় যে, হাতীও সে মারার পর জীবিত থাকতে পারতো না। চার ইমামের এই সংস্কার আন্দোলন তদানীন্তন শাসন ব্যবস্থাকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়, কিন্তু মুসলিম সমাজের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহান নেয়ামত হিসেবে তা কাজ করতে থাকে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মৃত্যুর দুশ' বছর পর ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইমাম গাজ্জালীর জন্ম হয়। তিনিও ১১১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক বিরাট সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। মুসলিম সমাজের অনৈক্যের উৎস জাহেলিয়াত কবলিত শাসক গোষ্ঠীর তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। খলিফা নামীয় বাদশাহ'র মুখের ওপরে তিনি বলেন, "স্বর্ণ অলংকারের ভারে তোমার ঘোড়ার পিঠ ভাঙ্গেনি তো কি হয়েছে, অনাহার-অর্ধাহারে মুসলমানদের পিঠতো ভেঙ্গেছে।" তিনি ঘোষণা করেন, "আমাদের জমানার সুলতানদের সমস্ত বা অধিকাংশ সম্পদ হারাম। এই সুলতানদের নিজেদের চেহারা

www.amarboi.org

অন্যকে না দেখানো উচিত এবং অন্যদের চেহারা না দেখা উচিত। এদের (শাসকদের) সাথে কোন সম্পর্ক না রাখা এবং এদের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের ভক্তদের দূরে অবস্থান করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য।' ইমাম গাজ্জালীর ব্যাকুল প্রত্যাশা ছিল পৃথিবীর যে কোন এলাকাতেই হোক না কেন নির্ভেজাল ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। ইমাম গাজ্জালীর মৃত্যুর ১৫১ বছর পর ১২৬২ খ্রিস্টাব্দে অকুতোভয় সংগ্রামী সংস্কারক ইবনে তাইমিয়ার জন্ম হয়। তিনি যখন জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলন করে মুসলিম সমাজের দিকে চাইলেন, তখন বাগদাদের পতন ঘটে গেছে। চরিত্রহীন মুসলিম শাসককুল তখন ভাসমান পানার মত এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজ বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত অবশ অচেতন। মিসর ও সিরিয়ার মত যে গুটি কয়েক দেশ তাতারিদের ধ্বংস লীলা থেকে বাঁচতে পেরেছিল, সেখানেও কোন ইসলাম ছিল না, ছিল চেঙ্গেসী স্বেচ্ছাচারিতা। এই কালো অমানিশার মধ্যেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার ক্ষুরধার লেখনি, গভীর প্রজ্ঞা ও তেজস্বিনী বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কখনো কোন বৃহত্তর শক্তিকে তিনি ভয় করেননি। বহুবার তাকে কারারুদ্ধ হতে হয় এবং কারাগারেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া মুসলিম শাসককুলকে সংশোধন ও ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি বটে, কিন্তু মুসলিম উম্মাহকে সামনে এগিয়ে চলার অত্যন্ত মজবুত পথ তিনি রচনা করে যান।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি মোগল ভারতে আরেকজন মহান সংস্কারকের জন্ম হয়। তিনি শায়েখ আহম্মদ সরহিন্দী। মুজাদ্দিদে আলফেসানী নামেই তিনি বেশি পরিচিত। রাষ্ট্রীয় সংশোধনের ক্ষেত্রে তিনি ইবনে ইমাম তাইমিয়ার মতই সংগ্রাম করেন। দশ বছর তাকে মোগল জেলে কাটাতে হয়। প্রকৃতপক্ষে তার সাহসী সংগ্রামই সম্রাট আকবর প্রবর্তিত ভয়াবহ এক জাহেলিয়াতের কবল থেকে ভারতের মুসলমানদের রক্ষা করে এবং আলমগীর আওরঙ্গজেবের মত একজন দরবেশ সম্রাটের জন্ম হয়। শায়খ আহমদ সরহিন্দীর পর ভারতে ও মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। মুসলিম সংস্কার আন্দোলনের এ প্রাতিষ্ঠানিক রূপের দিকেই এখন দৃষ্টিপাত করা যাক। তবে তার আগে বিশ্ব মুসলিম সংহতির আরেকজন সিংহপুরুষ জামালুদ্দিন আফগানী সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। বিশ্ব মুসলিম সংহতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে একজন মহান দিকপাল ছিলেন জামালুদ্দীন আফগানী। ইসলাম সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান, মুসলিম উম্মাহর প্রতি তার অপরিসীম মমতা ৩১ বছর বয়সে তাঁকে দেশ ছাড়া করে। তিনি ছিলেন শক্তিশালী গ্রন্থকার, বিজ্ঞ শিক্ষক, অনলবর্ষী বক্তা এবং তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি লিখেন, "একমাত্র ইসলামই মুসলিম সমাজের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও জাতীয় শক্তি নিশ্চিত করতে পারে এবং ধর্মহীনতা ও

www.amarboi.org

বস্তুবাদই অবনতি ও ধ্বংসের কারণ।" তিনি মুসলিম জাগরণ ও ঐক্যের মিশন নিয়ে তাঁর গোটা জীবনটাই মুসলিম দেশসমূহে ঘুরে বেড়ান। তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারত, মিসর, আরব, তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান সর্বত্র। তিনি ইউরোপ রাশিয়াতেও গেছেন। সচেতন মুসলমানরা তার জন্য পাগল ছিল। কিন্তু আত্মচিন্তায় বিভোর মুসলিম ও ঔপনিবেশিকরা তার বিশ্ব ইসলামী সংহতি চিন্তাকে বরদাশত করেননি। বিতাড়িত হয়েছেন তিনি এক দেশ থেকে আরেক দেশে। অবশেষে তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের 'স্বর্ণ পিঞ্জরে' নজরবন্দী থাকা অবস্থায়ই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। দৃশ্যত ব্যর্থতা নিয়েই তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। কিন্তু মিশন তার ব্যর্থ যায়নি। তার বিশ্ব মুসলিম সংহতি চিন্তা পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং আজকের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ইসলামী ঐক্য তার স্বপ্নকেই সার্থক করেছে। উনিশ শতকের গোটা শেষার্ধটাই ছিল এই মহান সংস্কারকের কার্যকাল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার আন্দোলন ঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মৃত্যুর ৩৭৬ বছর পর এবং শায়খ আহমদ সরহিন্দীর মৃত্যুর ৭৯ বছর পর পবিত্র আরব ভূমি ও ভারতে দুই মহান সংস্কারকের জন্ম হয়। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে একই বছরে ভারতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র) এবং আরবে শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অসমাপ্ত কাজকেই তারা পূর্ণতর করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাদের হাতে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন প্রথমবারের মত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী মুসলিম সমাজের সার্বিক অধঃগতি রোধের উপায় হিসেবে ইসলামী খিলাফতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একদিকে বিশাল ইসলামী বুনিয়াদ রচনা করেন, অন্যদিকে দিল্লীর রহিমিয়া মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিও গড়ে তোলেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল শহীদ পরিচালিত ভারতের মুজাহিদ আন্দোলন শাহ সাহেবের এই প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত মুজাহিদ আন্দোলন ভারতে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। অপরদিকে আরবে শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর আন্দোলন বিদআত ও জাহিলিয়াতের কবল থেকে নির্ভেজাল তৌহিদবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটায়। আমীর মুহাম্মদ বিন সউদ এবং তার উত্তরসূরি আব্দুল আযিয বিন সউদ এর রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাবার কারণে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর আন্দোলন অন্তত আরব উপদ্বীপে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে যায়। আজও এই আন্দোলন সেখানে ধিকিধিকি জ্বলছে। অতীতের যে সকল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের চেয়ে মুসলিম সমাজের রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ক্ষেত্রে এ দুই আন্দোলন অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে।

www.amarboi.org

শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব (র)-এর ওহাবী আন্দোলন এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র) এর মুজাহিদ আন্দোলন এর পটভূমিতে বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আরও দুটি আন্দোলন জন্মলাভ করে। এ দুটি আন্দোলনের একটি হাসানুল বান্না প্রতিষ্ঠিত ইখওয়ানুল মুসলিমুন, অন্যটি মওলানা আবুল আলা মওদুদী (র) প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী ইখওয়ানুল মুসলিমুন ১৯২৮ সালের আগস্টে মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ সালের আগস্টে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাই এ দুটি আন্দোলনের লক্ষ্য। এ দুটি আন্দোলন বিভিন্ন মুসলিম দেশসহ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে বেসরকারি প্লাটফরম থেকে বিশ্বব্যাপী মুসলিম সংহতির বুনিয়াদ রচনা করছে। এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ দুটি আন্দোলনের সাথে তুরস্কের মিল্লি সালামত পার্টি, আফগানিস্তানের হিজবে ইসলামী, তিউনিসিয়ার হারকাতুল ইত্তেহাদুল ইসলামী, সেনেগাল ও জাম্বিয়ার হিজবুল্লাহ পার্টিসহ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার ইসলামী আন্দোলন অমূল্য অবদান রাখছে। প্রকৃতপক্ষে এসব আন্দোলনের একটা ফল হিসেবেই মুসলিম বিশ্বভিত্তিক মুসলিম সংহতির প্রতিষ্ঠান রাবেতাত আল-আলম আল-ইসলামির জন্ম হয়েছে। অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স বা ওআইসি'র জন্মও হয়েছে এই পটভূমিতেই। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য সংগঠন হিসেবে ওআইসি'কে নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব। তার আগে বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত রাবেতার মত বিশ্ব ভিত্তিক ইসলামী সংহতির আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা যাক।

বিশ্ব-ভিত্তিক মুসলিম সংহতির আন্দোলন বিশ্ব-ভিত্তিক মুসলিম সংহতির আন্দোলন হিসেবে রাবেতায়ে আলম আল-ইসলামীর আলোচনার আগে এ ধরনের আরেকটি সংগঠন মোতামার আল আলম আল-ইসলামী সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। ফিলিস্তিনের গ্রাণ্ড মুফতি আমিন আল হোসাইনীর নেতৃত্বে বাদশাহ আবদুল আজিজের আহ্বানে মোতামারের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মক্কা শরীফে ১৯২৬ সালে। বিশ্ব মুসলিম সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং তাকে শক্তিশালী করাই ছিল এ সম্মেলনের মূল সুর। মোতামারের পরবর্তী সম্মেলন বসে ১৯৩৯ সালে জেরুজালেমে। দীর্ঘদিন পরে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৪৯ সালে করাচী সম্মেলনের মাধ্যমে মোতামারকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এ আন্দোলন তার সীমিত পরিষদ নিয়ে এখনও কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের মে মাসে পবিত্র মক্কা মোকাররমায় রাবেতাত আল আলম আল ইসলামীর প্রতিষ্ঠা হয়। মুসলিম দেশসমূহের ৫৮ জন নেতৃস্থানীয় চিন্তানায়ককে নিয়ে প্রথম সাংগঠনিক পরিষদ গঠিত হয়। রাবেতা পাঁচটি লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ শুরু করে। এ পাঁচটি লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে ইসলামের বাণী ও শিক্ষা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া, ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করা, মুসলিম সংখ্যালঘু

www.amarboi.org

এবং নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য কাজ করা, ইসলাম প্রচার এবং ঐক্য-সংহতি রক্ষায় মুসলিম সমাজকে সাহায্য করা প্রভৃতি। এই লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে রাবেতা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়ন এবং সমন্বয় ও সাহায্যকারী ইসলামিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও সংহতকরণে সাহায্য করে আসছে। বলা যায়, রাবেতার উদ্যোগ ও সাহায্যের ফলেই আফ্রিকার মুসলমানদের জন্য আফ্রিকান ইসলামিক কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল এবং উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার জন্য পৃথক পৃথক ইসলামিক কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানদের জন্যও রাবেতাগুলোর প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তার কিছুটা বুঝা যাবে। মুসলিম বিশ্বের আন্তঃরাষ্ট্র সংহতি বিধানের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির পরিধি ধীরে ধীরে বাড়ছে। সামনের দিনগুলোতে 'মুসলিম কমন মার্কেট', 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল জয়েন্ট ভেঞ্চার', 'ইউনিফরমিটি এন্ড কো-অপারেশন ইন কাস্টমস এন্ড এলাইড ম্যাটারস' গ্যাস পাওয়ার ব্যাংক', 'কারেন্সী ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন' প্রভৃতি ক্ষেত্রে সক্রিয় উদ্যোগ নেয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে। মুসলিম সংহতির ক্ষেত্রে ওআইসি'র এই প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতিকে নিঃসন্দেহেই বিস্ময়কর ব্যাখ্যা দেয়া যায়।

আকিদা-বিশ্বাসগত মৌল যে অধঃগতির কারণে মুসলমানদের সংহতি ও স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে, আনন্দের কথা সে মৌল বিষয়ের দিকেও ওআইসি'র দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত 'মক্কা ঘোষণা' এবং চতুর্দশ ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত ইসলামী মানবাধিকার সম্পর্কিত ঢাকা ঘোষণা খুবই উল্লেখযোগ্য। মক্কা ঘোষণায় ঐতিহাসিক দলিলে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানগণ তাদের বিশ্বাসের নবায়ন করেছেন। তাদের যার অতীত যেমনই হোক, তাঁরা নতুন করে ঘোষণা করেছেন ঃ

১। আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাহ অর্থাৎ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান।

২। এ জীবন বিধানই মুসলিম জীবন ও মুসলিম জাতির জীবনের নিরাপত্তা, সংহতি ও সমৃদ্ধির উৎস।

৩। প্রতিটি মুসলমানকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে।

৪। ইসলামের সাথে যারাই বেইমানী করবে তারা হবে দুষ্কৃতকারী।

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানগণ বিশ্বের ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামের পুনর্জাগরণকারী মুসলিম জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন। এর মাধ্যমে ইসলামের পুনর্জাগরণকামীদের ওপর এতদিন ধরে আরোপিত গোড়া, ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল হবার অভিযোগ তার সরকারিভাবেই ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। রাষ্ট্রপ্রধানগণ ইসলামী আদর্শে Strict adherence -এর কথাই বলেছেন,

www.amarboi.org

ইসলামী আন্দোলনকারীরাও এই Strict adherence -এর কথাই বলেন। ইসলামের পুনর্জাগরণকামী বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের সাথে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের মতের এই সম্মেলনই তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের ঐতিহাসিক কীর্তি। এ মাসেই মরক্কোর ক্যাসাব্লাংকায় চতুর্থ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মুসলিম উম্মার প্রত্যাশা মক্কা ঘোষণাকে সামনে রেখে বিশ্ব মুসলিম সংহতির অগ্রযাত্রাকে সত্যিকার অর্থেই গতিদান করা হবে।

আমি আগেই বলে এসেছি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সংহতি আন্দোলন ওআইসি মুসলিম জনগণের কাতার থেকে আসা ইসলামী সংস্থার আন্দোলনেরই একটা ফল। সুতরাং আজকের ইসলামী আন্দোলনগুলোর ব্যাপকতা ও শক্তিমত্তার ওপরই ওআইসি'র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অনাগত ভবিষ্যৎটাকে আমি আঁকতে চাই এইভাবে, জনগণের ইসলামী আন্দোলন একদিকে অধিকতর শক্তিশালী ও ব্যাপকতর হতে থাকবে। অন্যদিকে এরই চাপে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন ওআইসিও ইসলামের নিকটতর হয়ে উঠবে। এইভাবে ভবিষ্যতের কোন এক শুভদিনে এক পয়েন্টে এসে ইসলামী আন্দোলন ও রাষ্ট্র ক্ষমতা এক হয়ে যাবে এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী খিলাফতের বুনিয়াদ রচিত হবে। মুসলিম সংহতির আজকের প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি নিঃসন্দেহে এই চূড়ান্ত লক্ষ্য সামনে রেখেই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় অগ্রসর হয়ে চলছে। মুসলিম উম্মাহ আগ্রহে অপেক্ষা করছে সেই শুভ দিনের। আমি আমার এই নিবন্ধে এই প্রার্থনা দিয়েই শেষ করছি মুসলিম উম্মাহ এবং ইসলামী আন্দোলনের এই সংহতি প্রচেষ্টাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করুন।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় বঙ্গ বিভাগ

১৯০৫ সালে ভাগ হয়ে যাওয়া বাংলা জোড়া লেগেছিল ৭ বছর পর ১৯১১ সালের শেষ দিনটিতে এসে। তারপর বাংলা বিভাগের কথা প্রথম উচ্চারিত হলো ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের কণ্ঠে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই এপ্রিল মিশন এক দরকষাকষি বৈঠকে বসেছিল জিন্নার সাথে। তারা বলেছিল, পাকিস্তানের জন্য দাবীকৃত পুরো এলাকা এবং পুরো স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এই দুই জিনিস জিন্নাহ এক সাথে কিছুতেই পাবেন না। হয় সর্বভারতীয় ইউনিয়নের অধীনে দাবীকৃত পুরো এলাকা নিয়ে পাকিস্তান ফেডারেশন গঠনে রাজী হতে হবে, নয়তো খণ্ডিত বাংলা ও পাঞ্জাব নিয়ে খণ্ডিত পাকিস্তানে তাকে রাজী হতে হবে, যা হবে পুরো স্বাধীন ও সার্বভৌম। জিন্নাহ তখন পুরো স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বদলে সর্বভারতীয় ইউনিয়নের অধীনে পাকিস্তান ফেডারেশন গঠনকেই পছন্দ করেছিলেন, তবু বাংলা ভাগে তিনি রাজী হননি।[১] কিন্তু জিন্নাহ রাজী না হলেও বাংলা বিভাগের দাবী উঠল কংগ্রেস ও হিন্দু এলিটদের তরফ থেকে ১৯৪৭ সালের শুরু থেকে। অথচ এই কংগ্রেস এবং এই হিন্দু এলিটরা ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ হলে স্বরাজ ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশকে বঙ্গভঙ্গ রহিত করতে বাধ্য করেছিল। কারণটা পরিষ্কার। বৃটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু এলিটদের জমিদারী পূর্ববঙ্গকে পায়ের তলায় রাখা এবং তার উপর শাসন শোষণ কায়েম রাখার জন্য অখণ্ড বাংলার তখন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বৃটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন পরিবেশে এই শোষণ শাসন সম্ভব নয় বলে এবং অখণ্ড বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে সেই কংগ্রেস ও হিন্দু এলিটরা বাংলা ভাগে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। খণ্ডিত পাকিস্তান টিকবেনা -এ ধারণাও তাদের বাংলা বিভাগ দাবীর একটা মৌল কারণ হিসেবে কাজ করে। শরৎ বসু ও কিরণ শংকরের মত দু' একজন হিন্দু নেতা অখণ্ড বাংলার পক্ষে কাজ করেছেন। তাই কারও সাহায্য সহযোগিতা তাঁরা পাননি। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে অখণ্ড বাংলা প্রশ্নে কোন মতানৈক্য ছিল না। কিছুটা মতবিরোধ ছিল 'বাংলা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, না অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পাকিস্তানের অংশ হবে' -এই প্রশ্ন নিয়ে। বলা যায়, অখণ্ড ভারত ও ভারত বিভাগ প্রশ্ন নিয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে যে দ্বন্দের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই দ্বন্দ্বই হিন্দুরা মিনি আকারে সৃষ্টি করেছিল বাংলা প্রদেশে। ফল হিসেবে ভারত বিভাগের মতই বাংলা বিভাগ হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলার ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৩টিতে জয়ী হবার পর কংগ্রেস এবং বাংলার হিন্দু এলিটরা দেওয়ালের এ লিখন পড়ল যে বাংলার মুসলিম জনগণের উপর হিন্দু আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে গেছে। এরপর বাংলাসহ ভারতে একটি মুসলিম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি

১। 'The Great Divide', S. V. Hudson, page 139.

www.amarboi.org

যখন ১৯৪৭ সালের শুরু থেকে একটা অদম্য রূপ পরিগ্রহ করল, তখন বাংলার হিন্দু এলিটরা এবং তাদের সংগঠনগুলো বাংলা ভাগের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠল। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস নেতা ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, বাংলার গভর্নর ফ্রেডারিক বারোজ -এর সাথে দেখা করে এক বিবৃতিতে বললেন, ভারত যদি ভাগ হয়, তাহলে বাংলাও ভাগ করে হিন্দু সংখ্যাগুরু অঞ্চল আলাদা করতে হবে।[২] এর পক্ষকাল পরে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী বাংলা বিভাগ দাবী করে বিবৃতি দিলেন।[৩] ২৯ মার্চ, ১৯৪৭ বাংলার রাজা-মহারাজাগণ মিলিত হলেন কোলকাতায়। যাদের মধ্যে ছিলেন কাশিম বাজারের মহারাজা শিরীষচন্দ্র নন্দী, বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহাতব, মহারাজা প্রবোধচন্দ্র ঠাকুর, মহারাজা কুমার সীতাংশু কান্ত আচার্য চৌধুরী প্রমুখ। তারা বাংলা বিভাগের পক্ষে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করলেন।[৪] তারকেশ্বরে বাংলা প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ১৯৪৭ সালের ৫ এপ্রিল। সম্মেলন শ্যামা প্রসাদকে বাংলায় পৃথক হিন্দু আবাসভূমি গড়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব দান করল এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ৩০ জুনের মধ্যে এই লক্ষ্যে ১ লাখ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হবে।[৫] মুসলমানদের মধ্যে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। বাংলার প্রধানমন্ত্রী মুসলিম লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী ৮ ও ৯ এপ্রিল পরপর দুইটি বক্তব্য দিলেন। বাংলা-ভাগ দাবীর তীব্র প্রতিবাদ করে। বললেন, আমি অখণ্ড ও বৃহত্তর বাংলার পক্ষে।[৬] ঠিক এপ্রিলের এই ৯ তারিখেই বাংলার ভূমি ও জেলমন্ত্রী মুসলিম লীগ নেতা ফজলুর রহমান অখণ্ড ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার দাবী করে বললেন যে, এটা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি হিন্দুরা এভাবে থাকতে না চায় তাহলে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশ, যা হবে কায়েদে আযমের পরিকল্পনা অনুসারে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র, ছেড়ে দিয়ে গোটা ভারত তারা নিয়ে নিক। লোক বিনিময়ের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধান করা যাবে।[৭] মন্ত্রী ফজলুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা দাবী করার একদিন পর ১১ই এপ্রিলে বাংলা থেকে কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের ১১ জন হিন্দু সদস্য ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট

২। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 8.

৩। Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 8 (সিরাজ উদ্দীন হোসেন দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক ছিলেন। তার গ্রন্থটি ১৯৭০ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়)।

৪। 'অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৩৪।

৫। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 9.

৬। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 10.

৭। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 11.

www.amarboi.org

ব্যাটেনের কাছে বাংলার পশ্চিম ও উত্তর অংশে দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ দাবী করে স্মারকলিপি পেশ করলেন।[৮]

একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয়, বাংলার ভূমি ও জেল মন্ত্রী ফজলুর রহমানই প্রকাশ্যে প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার দাবী করলেন। ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দুই অংশে দুইটি স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমির কথা বলা হয়েছিল। পরে ১৯৪৬ সালের কনভেনশনে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব সংশোধন করে একক একটি মুসলিম আবাসভূমির প্রস্তাব করে। পরবর্তীকালে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটি গ্রুপ বাংলাকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাখার পক্ষে মত পোষণ করতে থাকেন। এমনকি দিল্লী কনভেনশনে ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে একক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যিনি প্রস্তাবক ছিলেন, সেই সোহরাওয়ার্দী ও পরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের কথা বলেন। যা হোক, মন্ত্রী ফজলুর রহমান এই গ্রুপেরই একজন এবং তিনিই সর্বপ্রথম অখণ্ড স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলার দাবী ঘোষণা করলেন। বিস্ময়ের ব্যাপারে দিল্লী প্রস্তাব অনুসারে লীগ সভাপতি মিঃ জিন্নাহ এর প্রতিবাদ করার কথা ছিল, কিন্তু এর প্রতিবাদ না করে এর প্রতি সমর্থনই দান করলেন। এপ্রিলের শেষ দিকে জিন্নাহ পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের সরকার গঠন প্রশ্ন নিয়ে মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে দেখা করেছিলেন। পাঞ্জাব নিয়ে আলোচনাকালে মাউন্ট ব্যাটেন কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই জিন্নাহকে বললেন, "সুরাবর্দী (সোহরাওয়ার্দী) এবং তার বন্ধুরা 'স্বাধীন বাংলা' গঠন করার চেষ্টা করছে। 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা' সম্বন্ধে আপনার কি মত? অবশ্যি স্বাধীন বাংলা পাকিস্তানের বাইরে থাকবে।" এর জবাবে জিন্নাহ কোন সংকোচ না করে বললেন যে, 'বাংলা স্বাধীন হলে আমি খুশী হব। কলকাতা ছাড়া বাংলার মূল্য নেই। তারা (বাঙ্গালীরা) যদি একত্র থাকে এবং অখণ্ড বাংলা গঠন করে, তাহলে তারা নিশ্চয় আমাদের সাথে সদ্ভাব রাখবে।' মাউন্ট ব্যাটেন জিন্নাহকে বললেন, সুরাবর্দী বলেছেন যে বাংলা স্বাধীন এবং অখণ্ড পৃথক দেশ হিসেবে কমনওয়েলথের ভেতর থাকতে চায়।' জিন্নাহ জবাব দিলেন, 'নিশ্চয় আমিও পাকিস্তানকে কমনওয়েলথের ভেতর রাখতে চাই।"[৯] এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলা সম্পর্কে জিন্নার চিন্তার সুন্দর, সরল ও সহজ অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাঁর এই চিন্তা সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, "বাংলা অবিভক্ত, অখণ্ড দেশ হিসেবে থাকবে এ কথা জিন্নাহ বিশ্বাস করেছিলেন। এই ব্যাপারে তার সহকর্মী লিয়াকত আলী খানও জিন্নার সঙ্গে একমত ছিলেন। লিয়াকত আলী ভাইসরয়ের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী এরিক মিসয়াভিলকে বলেছিলেন যে, তিনি বাংলা ভাগ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন না। কারণ তিনি জানেন বাংলাকে ভাগ করা হবে না, হয়তো বাংলা এক পৃথক দেশ হবে। .... জিন্নাহ শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলেন যে বাংলা এবং পাঞ্জাবকে অখণ্ড রাখতে

৮। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 12.

৯। 'স্বাধীনতার অজানা কথা বিক্রমাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৬৮, ২৬৯ ফ্যাক্টস আর ফ্রাক্টস, ওয়ালী খান, পৃষ্ঠা ১১৬, 'দি গ্রেট ডিভাইড' এস, ভি, হডসন, পৃষ্ঠা ২৪৬।

www.amarboi.org

তিনি পারবেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অংশকেও তিনি 'অখণ্ড পাঞ্জাব' হিসাবে পাবেন এবং বাংলা হবে এক 'স্বাধীন অখণ্ড দেশ'।[১০]

কিন্তু কায়েদে আযম জিন্নার এ বিশ্বাস বাস্তবায়িত হয়নি। বাস্তবায়িত হয়নি কারণ হিন্দু ভারতের কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মত সংগঠনগুলো এবং বাংলার হিন্দু এলিটরা তা হতে দেয়নি। এমনকি যেসব হিন্দু এলিটকে উদার, মানবতাবাদী এবং বাংলার জনগণের বন্ধু বলে আমরা জানি, তারাও সেদিন চরম হিন্দুবাদী ও ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালের ২২শে এপ্রিল হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেস নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ দিল্লীতে একটা মিটিং ডাকেন। এ মিটিং-এ ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ ভাষণে সাম্প্রদায়িকতার খতিয়ান হাজির করে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।[১১] আর এক গুচ্ছ হিন্দু ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানী, যাদের মধ্যে ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. শিশির কুমার মিত্র ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রিটিশ ভারত-সচিব লিষ্টওয়েলের কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় বলেন, 'দাঙ্গাজনিত জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাহীনতার কারণে বাংলার শিক্ষা, বাণিজ্য এবং শিল্প প্রায় ধ্বংসের পথে। বাংলার সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পূর্ণ অক্ষম। অসাম্প্রদায়িক সরকারের অধীনে জীবনের নিরাপত্তা এবং শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার অব্যাহত উন্নতির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অবিলম্বে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবী জানাচ্ছি। এটা নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে পশ্চিম বাংলার প্রাণ কোলকাতার বিকাশে সাহায্য করবে।"[১২] হিন্দু মহাসভার মত কংগ্রেসও মরিয়া হয়ে ওঠে বাংলা বিভাগের জন্য। বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাংলা বিভাগ দাবী করে একটি স্মারকলিপি ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৭ ভাইসরয়, নেহেরু ও প্যাটেলের কাছে পাঠায় এবং ৩০ এপ্রিল তারিখে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কালিপদ মুখোপাধ্যায় বাংলা বিভাগের পক্ষে তদ্বির করার জন্য দিল্লী যান।[১৩] এই ৩০শে এপ্রিল তারিখেই বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স তার এক বৈঠকে বাংলা বিভাগ দাবি করে। এ সভায় এন, আর, সরকার অখণ্ড বাংলার প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করে জিন্নাহ ও সোহরাওয়ার্দীর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'বাংলার হিন্দুগণ হিন্দু প্রধান অঞ্চল (কোলকাতাসহ) নিয়ে আলাদা একটি প্রদেশ গঠন করবে যা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিট হবে।[১৪] এই সময় আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলুই আসামকে বাংলার থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবী করে এবং বাংলার অখণ্ড স্বাধীনতার বিরোধিতা করে গান্ধীর কাছে নিম্নলিখিত এস, ও, এস, পাঠান ঃ 'বাংলাকে যদি স্বাধীন রাষ্ট্রত্তের অনুমতি দেওয়া হয়,

---

১০। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৬৯।

১১। 'অখণ্ড বাঙ্গার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭২।

১২। 'অখণ্ড বাঙ্গার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭২।

১৩। 'অখণ্ড বাঙ্গার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭১।

১৪। 'অখণ্ড বাঙ্গার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭১।

www.amarboi.org

তাহলে আসাম কেন্দ্র (দিল্লী) থেকে এবং অন্যান্য সম্মতিদানকারী প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সমুদ্রে তার কোন নির্গমন পথ থাকবে না, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকেই আক্রমণের শিকার হবে। ইউনিয়নের (ভারত রাষ্ট্রের) সাথে আসামকে যোগাযোগ রাখতেই হবে ...... সমুদ্রে নির্গমন পথ তাকে পেতেই হবে।[১৫] ১লা জুন, ১৯৪৭, ভারত বিভাগের যখন চূড়ান্ত মুহূর্ত, কোলকাতায় কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, নিউবেঙ্গল এ্যাসোসিয়েশন ও অল ইণ্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস'- একসাথে একটা জঙ্গী সমাবেশের আয়োজন করল। সমাবেশ হিন্দু প্রধান প্রদেশ গঠনের দাবী তুলল। এ সমাবেশে নেতৃত্ব দান করেছিলেন বাংলার খ্যাতিমান ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার। আর কোলকাতায় হিন্দু মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো এক বাক্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠনের জন্য জনমত তৈরি করছিল।[১৬]

এক কথায় বাংলার সকল হিন্দু দল ও সংগঠন একযোগে অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলার বিরোধিতা করে বাংলা বিভাগ দাবী করল। এর মধ্যে শরৎ বসু, কিরণ শংকরের মত দু'একজন হিন্দু ব্যক্তিত্ব মাত্র অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলার পক্ষে কাজ করেছিলেন। তাও কতকটা আধা-গোপন ভাবে। প্রকাশ্যে সভা-মিছিল এঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রকাশ্যে বিবৃতিও তারা কম দিয়েছেন। তাদের কাজটা অনেকটা লবী ওয়ার্কের মত ছিল। এ লবী করে তারা বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কিংবা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতা- কারোরই সমর্থন আদায় করতে পারেননি। এদের কাজও শুরু হয় বিতর্ক শুরু হবার অনেক পরে বাংলার সোদপুরে গান্ধী এলে শরত বসু তাঁর সাথে দেখা করলেন। এটা ৯ মে, ১৯৪৭, এর ঘটনা। এসময় গান্ধীর সাথে অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলার প্রশ্ন নিয়ে আরো অনেকেই দেখা করেন। এর মধ্যে ১০ মে শরত বসু ও আবুল হাশিম, ১১ই মে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও ভূমিমন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং ১২ মে অর্থমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী ও আবুল হাশিম গান্ধীর সাথে আলোচনা করেন। গভীর আবেগ নিয়েই শরত বাবুরা গান্ধীর সাথে দেখা করেছিলেন। কিন্তু ফল হয়েছিল শূন্য। গান্ধী বাংলা বিভাগের পক্ষে বা বিপক্ষে তার মত গোপন করে বলেছিলেন যে, দেশ (বাংলা) ভাগ হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় তার জন্য দায়ী থাকবেন এবং সব চেয়ে বেশী দায়ী থাকবেন বাংলার মুসলিম লীগ সরকার। ..... এক সময় বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সংঘবদ্ধ হয়ে বাংলার একতা রক্ষার উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জনকে তার মতো পাল্টাতে বাধ্য করেছিল। ...... সোহরাওয়ার্দী যদি বাংলা ও বাঙ্গালির প্রতি গভীর ভালবাসা আপন অন্তরে ধারণ করে থাকেন, তাহলে তার বক্তব্য অবশ্যই হিন্দু মনকে আনন্দিত ও আশ্বস্ত করবে। কারণ হিন্দু মনকে আজ ভীতি ও সন্দেহ আচ্ছন্ন করে আছে।[১৭] এখানে এই বক্তব্যে গান্ধী তার মত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না করলেও হিন্দুদের বাংলা বিভাগের যুক্তি যে সমর্থন করেন, সে বিষয় মোটেই

১৫। 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ, সিদ্দিকী, বার-এট-ল, পৃষ্ঠা ১৪৭।

১৬। 'অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭৩।

১৭। 'অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৬১।

www.amarboi.org

অস্পষ্ট নয়। এই সময়ের আলোচনা কালে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম গান্ধীকে জানিয়েছিলেন, 'হাজার মাইল দূর থেকে পাকিস্তান আমাদের শাসন করবে তা আমাদের জন্য ঘৃণার ব্যাপার।' এর উত্তরে গান্ধী আবুল হাশিমকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'পাকিস্তান যদি ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাজ্য গঠনের আহবান জানায় তবে কি স্বাধীন বাংলাদেশ তা প্রত্যাখ্যান করবে?' এরন উত্তর আবুল হাশিম দিতে পারেননি, চুপ করে ছিলেন। গান্ধী দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি যে বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলছেন,' তার মূল উৎস উপনিষদে, বর্তমানকালে রবীন্দ্রনাথ তাকে শুধু বঙ্গদেশীয় নয়, সর্বভারতীয় রূপে প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ কি স্বেচ্ছায় ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য আহবান জানাবে?' আবুল হাশিম এবারও চুপ করে ছিলেন।[১৮] গান্ধীর এ দুটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বাংলা সম্পর্কে হিন্দুদের চিন্তাধারার গোটাটাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। হিন্দুরা অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলা সমর্থন করতে পারেনি কারণ তারা নিশ্চিত ছিল সংখ্যাগুরু মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলা আসলে হবে মুসলিম বাংলা এবং তার আত্মিক যোগ-সূত্র থাকবে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথেই। গান্ধীর দ্বিতীয় প্রশ্নটাও এই কথাই বলেছে, কিন্তু অন্যভাবে। বাংলার মুসলমানরা বাঙালি হতে পারবে না, তারা মুসলমানই থাকবে। কারণ বাঙালি হতে হলে তাদেরকে হিন্দু উপনিষদ গ্রহণ করতে হবে এবং গঠন করতে হবে ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্র। এটা মুসলমানরা পারবে না। পারবেনা যে আবুল হাশিমের নীরবতাই তার প্রমাণ। আবুল হাশিম নীরব ছিলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। গান্ধী সোহরাওয়ার্দীকে বাংলায় সংঘটিত প্রতিটি মৃত্যুর জন্য দায়ী করলে সোহরাওয়ার্দী সমস্ত গোলযোগের স্রষ্টা হিসেবে গান্ধীকেই দায়ী করেন এবং পরে বাইরে এসে বলেন, 'কি অদ্ভুত লোক! কি বলছেন তাতে তাঁর কোন পরোয়া নেই।'[১৯]

শরত বসুও গান্ধীর সাথে আলোচনায় কোন সুবিধা করতে পারলেন না। পরে ১২ মে তিনি নিজ উদ্যোগেই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলায় ছয়দফা নীতিমালা ঘোষণা করলেন। নীতিগুলো হলো ঃ (১) বাংলা হবে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, (২) প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র প্রণীত হবার পর আইনসভার নির্বাচন হবে এবং নির্বাচন হবে যুক্ত নির্বাচন ভিত্তিক, (৩) বাংলার আইনসভা ঠিক করবে অবশিষ্ট ভারতের সাথে তাদের কি সম্পর্ক হবে, (৪) বর্তমান মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা বাতিল হবে এবং অবিলম্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে, (৫) বাংলার প্রশাসন বাঙ্গালিদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং হিন্দু ও মুসলমানের অংশ হবে সমান সমান, (৬) কংগ্রেস থেকে ৩০ এবং মুসলিম লীগ থেকে ৩১ জন সদস্য নিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সংস্থা গঠিত হবে।[২০]

১৮। 'অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৬১, ১৬২।

১৯। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by pyarelal, vol-II

২০। 'অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৬২, ১৬৩।

www.amarboi.org

শরতবাবু তার এই নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ২০ মে, ১৯৪৭ তাঁর বাসভবনে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। এই আলোচনায় অংশ নিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মুহাম্মদ আলী (বগুড়া), মন্ত্রী ফজলুর রহমান, কিরণ শংকর রায়, সত্যরঞ্জন বকশী এবং শরতবাবু নিজে। আলোচনা শেষে শরতবাবুর নীতিমালা সামনে রেখে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার জন্য নতুন একটা ফর্মুলা তৈরি হলো। বলা হলো ঃ (১) বাংলা হবে একটা স্বাধীন দেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের বাকি অংশের সাথে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। (২) হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের আসন সংখ্যা সংরক্ষণ করে যুক্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে মুক্ত বাংলায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। জনসংখ্যা অনুপাতে হিন্দু ও তপশীলি সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন সংখ্যা বন্টন করা হবে অথবা তারা নিজেরা যেভাবে মনে করে। নির্বাচন হবে বিতরণমুখী, সংখ্যাধিক্যমুখী নয়। যদি প্রার্থী তার নিজস্ব সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পান এবং অন্য সম্প্রদায়ের ২৫% ভোট পান, তাহলে তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে। যদি কোন প্রার্থী এরূপ শর্তপূরণে ব্যর্থ হয়ে শুধুমাত্র তার সম্প্রদায়ের ব্যাপক ভোট লাভ করেন, তাহলে তাকেও নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে। (৩) স্বাধীন বাংলার এরূপ প্রস্তাব মহামান্য রাজা মেনে নিয়েছেন বা বাংলা ভাগ করা হবে না এরূপ ঘোষণা তিনি করলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং সে স্থলে একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা সমান সংখ্যক (প্রধানমন্ত্রী বাদে) হিন্দু মুসলিম (তপসিলীসহ) সদস্য নিয়ে গঠন করা হবে। এই মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন একজন হিন্দু (৪) নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠন না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু (তপসিলীসহ) ও মুসলিমদের মধ্যে থেকে পুলিশ ও মিলিটারিসহ চাকরিতে সমান সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হবে। (৫) ৩০ জন সদস্য নিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী গণপরিষদ গঠন করা হবে যার ১৬ জন সদস্য হবেন মুসলমান এবং ১৪ জন হবেন হিন্দু।[২১]

এ ফর্মুলা প্রণীত হবার পর শরৎ বাবু এ বিষয়টি প্রথমেই জানালেন গান্ধীকে একটা চিঠির মাধ্যমে। এখানে লক্ষণীয়, শরত বাবু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করছেন না, যোগাযোগ করছেন গান্ধীর সাথে যিনি তখন কংগ্রেসের দায়িত্বে ছিলেন না এবং তখনকার চলমান ঘটনা প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাথেও শরতবাবুর আনুষ্ঠানিক আলোচনার কোন খবর পাওয়া যায়নি। যা হোক, শরত বাবু ২৩শে মে ১৯৪৭, গান্ধীকে যে চিঠি লিখলেন তাতে বলা হলো, "গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় (২০ শে মে) আমার বাড়িতে একটা আলোচনা সভা হয় আমরা পরীক্ষামূলক একটা প্রস্তাবে রাজি হয়েছি, এর সাথে তার একটা কপি আপনার বিবেচনার জন্য পাঠানো হলো। সত্যায়িত করার জন্য অন্যদের উপস্থিতিতে এতে আবুল হাশিম ও আমি দস্তখত করি। অবশ্য অনুমোদনের জন্য এ প্রস্তাবকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সামনে পেশ করতে হবে। যদি আপনার সাহায্য, উপদেশ ও নির্দেশে

২১। 'অখণ্ড বাঙলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৬৪, ১৬৫।

www.amarboi.org

দুটি প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলক এগ্রিমেন্টের ভিত্তিতে একটা চূড়ান্ত মতৈক্যে পৌঁছাতে পারে, তাহলে আমরা বাংলার সঙ্গে আসামের সমস্যার সমাধান করতে পারবো।[২২]

পরদিন অর্থাৎ ২৪ মে তারিখে গান্ধী এর জবাব দিলেন। লিখলেন, "খসড়াটিতে প্রতিশ্রুতিমূলক এমন কিছু নেই যাতে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা কিছু করা যাবে না। সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে থাকতে হবে অন্ততঃপক্ষে হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন। এই স্বীকৃতিও তাতে থাকা উচিত। বাংলার রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিধৃত এক অভিন্ন সংস্কৃতি, মূল যার নিহিত আছে উপনিষদের দর্শনে।"[২৩]

লক্ষণীয়, গান্ধী এই চিঠিতে নতুন কিছু বললেন না। কোলকাতায় সোদপুরে তিনি সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিমকে যে কথা বলেছিলেন সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। অর্থাৎ বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগুরুত্বের পাশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তাহীনতা এবং বাংলার মুসলমান কর্তৃক বাংলার অভিন্ন সংস্কৃতি হিসেবে হিন্দু উপনিষদকে গ্রহণ করার প্রশ্নই আবার গান্ধী তুললেন। আর বোধ হয় তিনি চেয়েছিলেন এ দুটির মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র সৃষ্টি করতে। যেমন, মুসলমানরা বাংলার অভিন্ন সংস্কৃতি হিসেবে যদি হিন্দু উপনিষদকে গ্রহণ করে, তাহলেই হিন্দু সংখ্যালঘুরা মুসলমানদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারে, নিরাপদ বোধ করতে পারে। সোজা কথায়, মুসলমানরা মুসলমান থাকা অবস্থায় হিন্দুরা নিরাপদ বোধ করতে পারে না। গান্ধীর এ এক অসম্ভব শর্ত।

শরতচন্দ্র বোস আবুল হাশিমের সাথে পরামর্শ করে গান্ধীর এ চিঠির জবাব দিলেন। বললেন, "সরকারের শাসন কার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে অন্ততঃপক্ষে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সহযোগিতা থাকতে হবে- আপনার এই প্রস্তাবের ব্যাপারে শহীদের (সোহরাওয়ার্দীর) সঙ্গে আলোচনা করতে পারিনি। আজ বিকেলে প্লেনে করে সে দিল্লী যাচ্ছে। আমি যদি দিল্লী আসি, সেখানে তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। ... শহীদ ও ফজলুর রহমান এই শর্তগুলো নিয়ে জিন্নাহ ও তার ওয়ার্কিং কমিটির সাথে আলোচনা করবে। তাদের সাথে আমার যে সব কথাবার্তা হয়েছে, তাতে বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি একটি সমঝোতায় আসতে পারে, তাহলে জিন্নাহ পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না।"[২৪]

২২। 'Mahatma Gandhi', The Last phase' by pyarelal, vol-II(উদ্ধৃতঃ ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ, সিদ্দিকী বার-এট-ল, পৃষ্ঠা ১৪৪, ১৪৫)।

২৩। 'Mahatma Gandhi', The Last phase' by pyarelal, vol-II(উদ্ধৃতঃ ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ, সিদ্দিকী বার-এট-ল, পৃষ্ঠা ১৪৪, ১৪৫)।

২৪। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by Pyarelal, vol-II (উদ্ধৃত ঃ ভুলে যাওয়া ইতিহাস', পৃষ্ঠা ১৪২, ১৪৩)।

www.amarboi.org

কিন্তু শরৎবসু-আবুল হাশিম ফর্মুলাটি কংগ্রেস কমিটি ও মুসলিম লীগ কমিটিতে আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য কখনও পেশ করা হয়েছিল বলে প্রমাণ নেই। বোধ হয় তার আগেই গান্ধীর ঐ শর্ত ফর্মুলাটিকে গলা টিপে মারে। গান্ধীর জীবনীকার পিয়ারী লাল লিখছেন, "যা হোক, মনে হয় শেষ পর্যন্ত মিঃ শরৎ সার্বভৌম বাংলার সিদ্ধান্তসহ সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে যে অন্ততঃপক্ষে হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সহযোগিতা সমর্থন থাকতে হবে- মিঃ গান্ধীর এই প্রস্তাবে মিঃ সোহরাওয়ার্দী বা মুসলিম লীগকে রাজি করাতে পারেনি।"[২৫] গান্ধীর দ্বিতীয় শর্তটি, বাংলার অভিন্ন সংস্কৃতি হিসেবে মুসলমান সমাজ কর্তৃক হিন্দু উপনিষদ গ্রহণের প্রশ্ন, শরত বাবু সম্ভবত সোহরাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগের কাছে পেশ করতেও সাহস পাননি।

বস্তুত শরত বাবু এবং তার সাথী কিরণ শংকর, প্রমুখের কোন চেষ্টাই হালে পানি পায়নি। হিন্দু সমাজ কিংবা কংগ্রেস কারো কাছেই তাঁরা জায়গা পাননি। শরত বাবু অখণ্ড ও সার্বভৌম বাংলা সংক্রান্ত তাঁর নিজস্ব ফর্মুলা প্রণয়নের (১২ মে, '৪৭) তিনদিন পর এবং শরত-হাশিম ফর্মুলা প্রণয়নের (২০মে, '৪৭) তিনদিন আগে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা বল্লব ভাই প্যাটেল শরৎ বাবুকে সতর্ক করে দিয়ে এই চিঠি লিখেন ঃ "আমি দুঃখিত যে, আপনি সর্বভারতীয় রাজনীতি, এমনকি প্রাদেশিক রাজনীতি থেকেও নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছেন। আপনি আমাদের সাথে কোন যোগাযোগই রাখছেন না। .... আমি আশা করি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপকতর অংশগ্রহণে এগিয়ে আসবেন এবং প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় রাজনীতির ব্যাপারে আপনার কার্যাবলী আমাদের অবহিত করবেন।"[২৬] প্যাটেলের এই চিঠিতে শরৎ বসুর বিচ্ছিন্ন ও অসহায় দশার চিত্রই ফুটে উঠেছে এবং প্যাটেল অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, শরৎ বাবুর কার্যাবলীর সাথে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নেই। ২০মে, '৪৭ তারিখে অখণ্ড ও সার্বভৌম বাংলা সংক্রান্ত-শরৎ হাশিম ফর্মুলা প্রণীত হবার পর অনুরূপ আরেকটা চিঠি সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল লিখেছিলেন কিরণ শংকরকে। সে চিঠিতে বলা হলো ঃ "লোক মুখে এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এমন কিছু, ধূম্রজাল সৃষ্টি হতে দেখছি, যে ব্যাপারে আমরা একদম অন্ধকার। এসব ধূম্রজালের সাথে আপনার এবং শরৎ বাবুর নাম জড়ানো হচ্ছে। আমি মনে করি আপনাদেরই স্বার্থ এটা দেখা যে, এ ধরনের গুজব-ধূম্রজাল আর বেশি ছড়িয়ে না পড়ে। এখন এক সংকটকাল চলছে এবং দেশ ভাগের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ইস্যু। কংগ্রেসের সকল লোকের উচিত ব্যক্তিগত সকল প্রবণতা পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের দলীয় নীতির পেছনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ব্যক্তিগত সকল মত দলীয় নীতির সাথে সংগতিশীল হতে হবে এবং

২৫। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by Pyarelal, vol-II
(উদ্ধৃত ঃ ভুলে যাওয়া ইতিহাস', পৃষ্ঠা ১৪২, ১৪৩)।

২৬। 'অখণ্ড বাঙ্গলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭৪, ১৭৫।

www.amarboi.org

এক্ষেত্রে মতানৈক্যের কোন অবকাশ নেই। আমি নিশ্চিত যে, কংগ্রেসের একজন সুশৃঙ্খল সদস্য হিসাবে আপনি আমার এই পরামর্শকে অভিনন্দিত করবেন।"[২৭] প্যাটেলের এই চিঠিচি শরৎ বসুর কাছে লিখা চিঠির চেয়ে অনেক কঠোর এবং স্পষ্ট। এতে পরিষ্কার ভাবেই কিরণ শংকর ও শরৎ বসুকে অখণ্ড ও সার্বভৌম বাংলার ধূম্রজাল থেকে বেরিয়ে কংগ্রেসের দলীয় নীতির পেছনে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন। অনেকের মতে এই চিঠির পর কিরণ শংকর অখণ্ড বাংলার ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।"[২৮] শরৎ বোসের জন্য গান্ধীর তরফ থেকে আরও বড় আঘাত অপেক্ষা করছিল। সেটা এল ৮ই জুন তারিখে। ৭ই জুন ১৯৪৭, অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে মাউন্ট ব্যাটেনের ভারত বিভাগ গ্রহণ করে এবং গান্ধীও এর প্রতি সম্মতি জানায়। এ উপলক্ষে গান্ধী ৮ই জুন এক প্রার্থনা সভায় যোগ দেন এবং অখণ্ড ও সার্বভৌম বাংলার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। এই তারিখে শরৎ বসুকে লিখা এক চিঠিতে গান্ধী বলেন, "আমি আপন্যর খসড়া পড়েছি। এবার পণ্ডিত নেহেরু ও সরদার প্যাটেলের সঙ্গে স্কীমটি নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করেছি। উভয়েই তাঁরা এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী এবং তাদের অভিমত এই যে, এটা হিন্দু এবং তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে বিভক্ত করার একটা কৌশলমাত্র। তাদের কাছে এ বিষয়টা সন্দেহ মাত্রই নয়, প্রায় একটা দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁরা এও মনে করেন যে, তফসিলী সম্প্রদায়ের ভোট হস্তগত করার জন্য মুক্তহস্তে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। ব্যাপারটা যদি তাই হয়, তাহলে অন্ততঃ বর্তমানের জন্য এ সংগ্রাম আপনার পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, দুর্নীতি দ্বারা ক্রয় করা ঐক্য খোলাখুলি বিভক্তির চেয়ে নিকৃষ্টতর হবে, বিভক্তি হোক হৃদয়ের প্রতিষ্ঠিত বিভক্তির এবং হিন্দুদের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি। এও আমি দেখছি যে, ভারতের দুটি অংশের বাইরে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন আশা নেই।"[২৯]

গান্ধীর এই চিঠি ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ করল শরৎ বোসকে। ৯ই জুন তারিখেই তিনি একটি টেলিগ্রাম মারফত চ্যালেঞ্জ করলেন গান্ধীকে এই বলে ঃ 'অভিযোগ যদি মিথ্যা হয়, তাহলে অভিযোগকারীকে শাস্তি দিন। আর সত্য হলে ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে শাস্তি দিন।"[৩০]

শরৎ বোসের এ অসহায় আবেদন অরণ্যে রোদনে পরিণত হলো। তিনি যেদিন গান্ধীকে ঐ টেলিগ্রাম পাঠান, সেদিনই (৯ই জুন) মিঃ জিন্নাহকে তিনি একটা চিঠি লিখেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেসের দিক থেকে হতাশ হয়ে তিনি জিন্নাহ ও মুসলিম

২৭। 'অখণ্ড বাঙ্গলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭৫।

২৮। 'অখণ্ড বাঙ্গলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭৫।

২৯। Mahatma Gandhi: The Last Phase' by pyarelal, vol-II(উদ্ধৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস. এ. সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ১৪৯)।

৩০। 'Mahatma Gandhi : The Last Phase' by pyarelal, vol-II(উদ্ধৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস. এ. সিদ্দিকী পৃষ্ঠা ১৫০)।

www.amarboi.org

লীগের সহযোগিতা চাইলেন। তিনি লিখলেন, "বাংলাদেশ তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে, কিন্তু এখনও তাকে বাঁচানো যায়। .... যে অনুরোধ আমি আপনার কাছে করছি, তা আমাদের সাক্ষাতকালে আপনি যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তার অনুসরণেই। কিন্তু আমার প্রতীয়মান হয় যে, আপনি যদি আপনার সদস্যদের কাছে শুধুমাত্র আপনার মতামত প্রকাশ করেন, তাহলে পরিস্থিতিকে রক্ষা করা যাবে না। .... বাংলাদেশের আইন পরিষদের মুসলিম সদস্যরা যদি নির্দেশ মত একযোগে ভোট দেন .... আমি মনে করি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন পরিষদের সকল সদস্যের আরেকটি সভা ডাকতে বাধ্য হবেন, যাতে সামগ্রিকভাবে এই প্রদেশ নিজস্ব সংবিধান পরিষদ পেতে চায় কিনা- এই ইস্যুর উপর সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।"[৩১]

শরৎ বসুর এই চিঠিতে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় ঃ (১) জিন্নাহ অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলার পক্ষে ছিলেন, (২) অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলার পক্ষে বাংলার আইনসভার হিন্দু সদস্যেরা ভোট দেবেনা, কিন্তু বাংলার মুসলিম সদস্যরা এক যোগে যাতে এর পক্ষে ভোট দেয় সেই দায়িত্ব জিন্নাহকে গ্রহণ করতে হবে এবং (৩) বাংলার মুসলিম সদস্যরা স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার (পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন) পক্ষে ভোট দেবে না, সুতরাং জিন্নাহকে তাদের রাজি করানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু শরৎ বাবু জানতেন না, তাঁর এই ফর্মুলা কার্যকর হবার মত নয়। কারণ, হিন্দু সদস্যরা যদি বাংলা ভাগ করার পক্ষে ভোট দেয়, তাহলে মাউন্ট ব্যাটেনের ভারত বিভাগ পরিকল্পনা অনুসারে মুসলিম লীগ সদস্যদের কোন প্রকার মতামত ছাড়াই বাংলা ভাগ হয়ে যাবে।

জুন, '৪৭-এর এ সময়কালে শরৎ বাবু এবং তাঁর মত দু'একজন ছাড়া কংগ্রেস এবং হিন্দু সমাজের কেউই অখণ্ড এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পক্ষে ছিল না। শরৎ বোস গান্ধীকে তার সর্বশেষ (বাংলা বিভাগের আগে) চিঠি লিখলেন ১৪ই জুন, ১৯৪৭। তিনি বললেন, "আমি লক্ষ করছি যে, জওয়াহের লাল ও বল্লভ ভাই উভয়েই সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। এটা যে হিন্দু ও তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে বিভক্তি করণের একটা কৌশল মাত্র, তাঁদের এ অভিমতের ব্যাপারে আমি একমত নই। .... যা হোক, আমাকে বলতেই হবে যে, তফসিলী সম্প্রদায়ের ভোট হস্তগত করার জন্য মুক্ত হস্তে টাকা ব্যয় করা সম্পর্কে যে সন্দেহ, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।"[৩২]

এরপর শরৎ বোস কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন। কংগ্রেস এবং হিন্দু সমাজের মতেরই জয় হলো, পরাজিত হলেন শরৎ বোস। এক ব্যক্তি একটি জাতি হতে পারেন না, তা আবার প্রমাণিত হলো।

৩১। 'Mahatma Gandhi : The Last Phase' by pyarelal, vol-II(উদ্ধৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস. এ. সিদ্দিকী পৃষ্ঠা ১৪৮)।

৩২। 'Mahatma Gandhi : The Last Phase' by pyarelal, vol-II(উদ্ধৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস. এ. সিদ্দিকী পৃষ্ঠা ১৫০, ১৫১)।

www.amarboi.org

অন্যদিকে বাংলার মুসলমানরা এবং মুসলিম লীগ একবাক্যে অখণ্ড বাংলা দাবী করেছে। এ দাবী তারা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছে। ছোট খাট বিবৃতি দেয়া ছাড়াও ২৭শে এপ্রিল (১৯৪৭) বাংলার প্রধানমন্ত্রী দিল্লী গিয়ে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দেন অখণ্ড ও সার্বভৌম বাংলার পক্ষে। তিনি বলেন অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ সার্বভৌম বাংলা হবে একটা মহান দেশ, যা হবে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও সমৃদ্ধিশালী।' সোহরাওয়ার্দী তার এ বিবৃতিতে বাংলা বিভাগ দাবী করার জন্য বাংলার একশ্রেণীর হিন্দুর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এটা অসহনশীল হতাশবাদীদের কাজ।'[৩৩] এদিন বিকেলেই সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এই তারিখেই খাজা নাজিমুদ্দীন বাংলা ভাগের বিরোধিতা ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার দাবী করে একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, "আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠন মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্যই কল্যাণকর হবে। একইভাবে বাংলা বিভাগ বাংলার অধিবাসীদের জন্য হবে মারাত্মক।"[৩৪] এর একদিন পর ৩০শে এপ্রিল তারিখে সর্বভারতীয় লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নার একটা বিবৃতি সংবাদপত্রে এল যাতে তিনি বাংলা বিভাগ দাবীর নিন্দা করে বললেন, "এটা একটা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।"[৩৫] এই দিনই বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের একটি দীর্ঘ বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। এ বিবৃতির প্রথম অংশে তিনি অখণ্ড ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলেন এবং দ্বিতীয় অংশে গিয়ে উপসংহার টেনে বললেন, "লাহোর প্রস্তাব কখনই ভারতে একক একটি মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলেনি।" আবুল হাশিমের বিবৃতির ৪ দিন পর ৫ই মে ১৯৪৭, বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খান এক বিবৃতিতে বললেন, "কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে যা থেকে কেউ ধারণা করতে পারেন যে, পাকিস্তান প্রশ্নে লীগ হাই কমান্ড এবং বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে প্রবল চিন্তা-বৈষম্য রয়েছে। সম্পূর্ণভাবে এটা ভিত্তিহীন। বাংলা মুসলিম লীগ দৃঢ়ভাবে ১৯৪০ সালের লাহোর রেজুলেশন এবং কায়েদে আযমের পেছনে রয়েছে। ... পাকিস্তান থেকে পৃথক স্বাধীন বাংলার কোন প্রশ্নই উঠে না। ... যারা হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত বাঙালি জাতির কথা বলেন এবং সেই জাতীয়তার ভিত্তিতে যারা স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম বাংলার কথা বলেন, তারা পরিষ্কারভাবে আমাদের শত্রুদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছেন, যারা মুসলিম বাংলাকে স্যান্ডউইচ করার জন্য বাংলার পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তে দুটি হিন্দু বাংলা দাবী করছে।"[৩৬]

লক্ষণীয় মুসলিম লীগের দুই নেতা, আকরাম খান ও আবুল হাশিম, সম্পূর্ণ দুই বিপরীত কথা বললেন। আসলে সে সময় বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগে যে দুই মত দানা বেঁধে উঠেছিল এটা তারই প্রতিফলন। এই দুই মতের একদিকে ছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, মন্ত্রী ফজলুর রহমান, আবুল হাশিম, প্রমুখ কয়েকজন। আর

৩৩। Days Decisive, Serajuddin Hussain. page 16.

৩৪। Days Decisive, Serajuddin Hussain. page 18.

৩৫। Days Decisive, Serajuddin Hussain. page 21.

৩৬। Days Decisive, Serajuddin Hussain. page 22.

www.amarboi.org

অন্যদিকে ছিলেন বাংলা প্রাদেশিক লীগ সভাপতি আকরাম খান, হাবিবুল্লাহ বাহার, নূরুল আমিন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, তমিজুদ্দিন খান প্রমুখসহ সংখ্যাগুরু লীগ সদস্যগণ। আকরাম খানের এই বিবৃতির মাধ্যমে দুই পক্ষের বিরোধ প্রকাশিত হয়ে পড়ার পর তা বেড়ে চলল। বিশেষ করে ১১ই মে থেকে ১৩ই মে পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান ও মোহাম্মদ আলী গান্ধীর সাথে বার বার দেখা করেন ও আলোচনা করেন। এই আলোচনা মুসলিম লীগের অন্য পক্ষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই বিক্ষুব্ধ হবার একটা কারণ হলো ৯ই মে, ১৯৪৭, মুসলিম লীগ প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটি অখণ্ড বাংলা ও অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুদের সাথে আলোচনার জন্য একটা সাব কমিটি গঠন করে, যার আহবায়ক ছিলেন নূরুল আমিন। সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ এই সাব-কমিটিকে পাশ কাটিয়ে গান্ধী ও হিন্দু নেতাদের সাথে আলাপ করেন। এমনকি ২০ মে শরৎ বসুর বাড়িতে অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় যে মিটিং -এ, সেখানে সাব কমিটির আহবায়ক সহ অনেকেই হাজির ছিলেন না এবং মুসলিম লীগ প্রাদেশিক কমিটিও এ ব্যাপারে কিছু জানতনা। এসব নিয়ে সংশয় সন্দেহ এবং বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে। লীগ কাউন্সিল সদস্য এম, এন, হুদা ১৩ মে'র এক বিবৃতিতে আবুল হাশিম ও অন্যদের আলোচনা করার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করেন।"[৩৭] এম, এন, হুদার সমর্থনে আবুল হাশিম, প্রমুখের অনধিকার আলোচনাকে চ্যালেঞ্জ করে বিবৃতি দেন হাবিবুল্লাহ বাহার ১৪ই মে তারিখে।[৩৮] আবুল হাশিম এর জবাব দিলেন ১৭ই মে। বললেন, ভালো কাজের জন্য কোন দায়িত্ব পাওয়ার দরকার হয় না।[৩৯] ১৪ই মে, ১৯৪৭, সোহরাওয়ার্দী দিল্লী গেলেন সম্ভবত কংগ্রেস ও লীগ হাইকমাণ্ডের সাথে আলোচনার জন্য। এর ১ দিন পরেই বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি আকরাম খানসহ হাবিবুল্লাহ বাহার, নুরুল আমিন, ইউসুফ আলীও দিল্লী গেলেন। উদ্দেশ্য উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে লীগ হাইকমাণ্ডের সাথে আলোচনা করা। পাল্টা পাল্টি এই ব্যাপার কারোরই নজর এড়ায়নি। কিন্তু রেজাল্ট কি হয়েছিল, সুনির্দিষ্টভাবে তার কিছুই জানা যায়নি। কারণ লীগ হাই কমাণ্ড এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। তবে সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে সোহরাওয়ার্দী বাংলা বিভাগ ঠেকাবার জন্য জিন্নাহকে অনুরোধ করেছিলেন।[৪০] অন্যদিকে আকরাম খান মিশনের সদস্যরা কোলকাতা ফিরে বলেন, ১৯শে মে' তারিখে তাদের মিশন সফল হয়েছে। কিন্তু সফলতা কি সেটা তাঁদের কাছ থেকে পরিষ্কার জানা গেল না। আকরাম খান বললেন, "বাংলা বিভাগ নিয়ে মুসলিম লীগের মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ নেই। ...... লাহোর প্রস্তাবের সাথে

৩৭। Days Decisive, Serajuddin Hussain. page 23.
৩৮। Days Decisive, Serajuddin Hussain. page 31.
৩৯। Days Decisive, Serajuddin Hussain. page 36.
৪০। Days Decisive, Serajuddin Hussain. page 30.

www.amarboi.org

অসংগতিশীল এমন কোন প্রস্তাবই আমরা মানব না।"[৪১] হাবিবুল্লাহ বাহার বললেন যে, কোন হিন্দু নেতার কোন প্রস্তাব থাকলে তা নিয়ে মুসলিম লীগের কাছে আসুন।"[৪২] ইউসুফ আলী চৌধুরী বললেন, 'কংগ্রেস কিংবা কোন হিন্দু সংগঠনের সাথে যারা আলোচনা করছেন, তাদের কারো একথা ভাবা ঠিক নয় যে, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে তারা দায়িত্বশীল এবং তারা যা করবেন মুসলিম লীগ তা মেনে নেবে।[৪৩] ১৯শে মে তারিখেই আবুল হাশিম গ্রুপের পক্ষ থেকে মন্ত্রী ফজলুল রহমান তাদের কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন, "আলোচনার শুরুতেই আমরা একথা পরিষ্কার করে দিয়েছি, যে সমঝোতাতেই আমরা পৌছিনা কেন, তা প্রাদেশিক মুসলিম ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। .... আমরা কোন সমঝোতায় এখনো পৌছিনি। কায়েদে আযমের মত সম্পর্কে আমরা অবহিত এবং সে অনুযায়ীই আমাদের আলোচনা চলবে। .... মুসলিম লীগ সোহরাওয়ার্দী, নুরুল আমিন, হাবিবুল্লাহ বাহার, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী ও আমাকে সদস্য করে যে সাব কমিটি গঠন করেছে (আলোচনার জন্য), কিন্তু কমিটির বাইরে কেউ আলোচনা করতে পারবে না এমন কথা মুসলিম লীগের ঐ রেজুলেশনে নেই।"[৪৪] কিন্তু দুঃখের বিষয় ফজলুর রহমানের এই বিবৃতির পরদিনই শরৎ বসুর অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার নীতিমালা প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, সেখানে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও ফজলুর রহমান গেলেন, কিন্তু আলোচনার জন্য দায়িত্বশীল সাব-কমিটির আহবায়কসহ অন্য সদস্যদের সেখানে নেয়া হলো না।[৪৫] তবে আনন্দের ব্যাপারে মুসলিম লীগ এ জন্য কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেনি। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে হাবিবুল্লাহ বাহার ২৪শে মে জানালেন, "শরৎ-সোহরাওয়ার্দী ফর্মুলা আশা করা হচ্ছে ২৭ মে তারিখে এ বিষয়ের জন্য দায়িত্বশীল সাব কমিটিতে পেশ করা হবে এবং ফর্মুলাটি অতঃপর প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে পেশ করা হবে ২৮শে মে তারিখে।"[৪৬]

বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকটি ২৮শে মে তারিখেই অনুষ্ঠিত হলো। ওয়ার্কিং কমিটির ২৭ জন সদস্যের মধ্যে ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিত ছিলেন সোহরাওয়ার্দী, এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী এবং শিক্ষামন্ত্রী মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন। মিটিং এর যে বিবরণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তা এই ঃ

"২৮শে বুধবার রাত ৮টা থেকে ৫ ঘন্টাব্যাপী আলোচনার পর বাংলার রাজনীতি বিষয়ে মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে ঃ

৪১। ৪২, ৪৩। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 35.

৪৪। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 38, 39

৪৫। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 41.

৪৬। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 456.

www.amarboi.org

বাংলার শাসনতান্ত্রিক নিষ্পত্তি (স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা) বিষয়ক যে প্রস্তাব এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে, সে সম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি অথবা গঠিত সাব কমিটির করার কিছুই নেই।

ওয়ার্কিং কমিটি পাকিস্তান দাবীকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে। কমিটি কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করছে এবং ঘোষণা করছে যে, ভারতের মুসলমানদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা ও নিষ্পত্তিতে পৌছানোর ব্যাপারে দায়িত্বশীল একমাত্র তিনিই। বাংলার মুসলমানরা তার সিদ্ধান্তের পেছনে থাকবে।

বাংলার রাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ে আলোচনার জন্য বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটিও বাতিল করা হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য গতকাল (২৯শে মে) এক সাক্ষাৎকারে জানান, যেহেতু বাংলার মানুষের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য দলীয়ভাবে কোন ব্যক্তি বা কমিটিকে দায়িত্ব দেয়নি, তাই লীগের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য সাব কমিটিকে অব্যাহত রাখার কোন অর্থ হয় না।"[৪৭]

এইভাবে মুসলিম লীগের মধ্যকার দ্বন্দ্বমান দু'টি মতের বিলয় ঘটল তখনকার মত দলীয় সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। তবে মুসলিম লীগের মধ্যে কোন বিতর্ক ছিল না অখণ্ড বাংলার ব্যাপারে। মুসলিম লীগের উপরোক্ত প্রস্তাবের ২ দিন পরে মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল্লাহ বাহার বাংলা ভাগ বিরোধী এক জনসভায় বলেন, "এক শ্রেণীর স্বার্থ শিকারী হিন্দু বাংলা ভাগের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে। মুসলমান এবং তফসিলী হিন্দুরা বাংলা ভাগের বিপক্ষে। ...... অখণ্ড বাংলা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হবে।"[৪৮]

লীগ সভাপতি মিঃ জিন্নাহ বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন শেষ পর্যন্ত। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারত বিভাগ পরিকল্পনা নিয়ে লণ্ডন যান ১৮ই মে, ১৯৪৭। বাংলা বিভাগের বিষয়টা তখন জানতে পেরে জিন্নাহ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে।[৪৯] এটুকু প্রতিবাদ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন লন্ডন যাবার পর জিন্নাহ বৃটিশ মন্ত্রিসভার কাছে টেলিগ্রাম করেন বাংলা ভাগের পক্ষে সিদ্ধান্ত না নেবার জন্য।[৫০] তারপর ২রা জুন ১৯৪৭ কংগ্রেস ও শিখরা যখন ভারত বিভাগ পরিকল্পনার প্রতি লিখিত সম্মতি জানাল, তখন মিঃ জিন্নাহ মাউন্ট ব্যাটেনকে গিয়ে বাংলা ভাগের ব্যাপারে তাঁর তীব্র আপত্তির কথা জানালেন।[৫১]

কিন্তু তবু বাংলা ভাগ হলো। কেন ভাগ হলো? কেউ কেউ বলতে চান, বাংলা স্বাধীন-সার্বভৌম হলে, এবং পূর্ব বাংলা পাকিস্তান না হলে বাংলা ভাগ হতো না। এ ধারণা একেবারেই ভুল। বাংলার হিন্দুপ্রধান অঞ্চলকে ভাগ করে নিয়ে পৃথক হিন্দু প্রদেশ

৪৭। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 47, 48.

৪৮। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 47, 48.

৪৯। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৮২।

৫০। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২৮৩।

৫১। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২৮৮।

www.amarboi.org

গঠন করার বিষয়টা ছিল হিন্দুদের স্থির সিদ্ধান্ত। পাকিস্তান না হলেও এটা তারা করতো। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী দিল্লীর এক জনসভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "The Separation must not be dependent on Pakistan. Even if Pakistan is not conceded and some form of a week and loose centre envirage in the Cabinet Mission Scheme is accepted by the Muslim League, we shall demand the creation of new province composed of the Hindu majority areas in Bengal." অর্থাৎ এই 'পৃথক হওয়াটা পাকিস্তান হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এমন কি যদি পাকিস্তান নাও হয়, কোন প্রকার দুর্বল ও শিথিল কেন্দ্রের ব্যবস্থাযুক্ত ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মুসলিম লীগ গ্রহণও করে, তবু আমরা বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ দাবী করব।'[৫২] তাছাড়া কংগ্রেস স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৭) বাংলা প্রদেশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অবশিষ্ট অংশকে ভারতের সাথে একীভূত করার জন্য। মুসলমানরা তাদের এ সিদ্ধান্তের সাথে একমত হবেনা, তাই বাংলা ভাগ তাদের জন্য ছিল অপরিহার্য এবং তারা তাই করেছে।

বাংলা বিভাগে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী। তিনি বাংলা বিভাগকে এবং স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়াকে বাংলার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু যে হিন্দুদের সাথে একত্রে স্বাধীনভাবে ঘর করার সাধ তিনি করেছিলেন, শীঘ্রই সে হিন্দুদের যে চেহারা তিনি দেখলেন তা কিছুতেই তাঁর সাধের সাথে সংগতিপূর্ণ হল না। "হিন্দুজনতা তাঁর চারপাশে গুঞ্জন তুলে বলেছিল ঃ মুসলমান 'শুয়র', 'খুনি ও চোর'। এমন এক চিৎকার তুলেছিল তারা, যা শুধুমাত্র 'ধর্ম নিরপেক্ষ' ভারতেই শোনা যেতে পারে; 'এই অধঃপতিত গরু-খোরকে ফাঁশিতে লটকানো হোক।' এই পরিস্থিতিতে প্রশংসনীয় শান্তভাবে আগাগোড়া বসে থাকলেন মিঃ সোহরাওয়ার্দী।"[৫৩]

স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী বললেন ঃ "যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে এবং বাংলা শীঘ্রই ভাগ হচ্ছে। ..... মুসলিম বাংলাকে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, অর্জন করতে হবে সর্বোচ্চ যোগ্যতা। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে এর খাদ্য সরবরাহ হবে প্রচুর। পাটের উৎপাদনকারী হিসেবে বিশ্বকে সে নিয়ে আসতে পারে পায়ের তলায় এবং এর শিল্প ভবিষ্যৎ নিশ্চিত। ..... পাকিস্তানের আইনসভায় মুসলিম বাংলার থাকবে শক্তিশালী কণ্ঠ, শাসনতান্ত্রিক বিকাশে পারবে সে অবদান রাখতে, অবদান রাখবে সে কৃষির উন্নয়নে এবং পাকিস্তানের সমৃদ্ধি বিধানে।"[৫৪]

৫২। 'অখণ্ড বাঙলার স্বপ্ন'–আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৩৪, (এই তথ্যটি কোলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকার ২২ এপ্রিল ১৯৭৪, সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত)।

৫৩। 'The Last Days of the Brithish Raj', Leonard Moseley(উদ্ধৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস' এস. এ. সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ১৫২)।

৫৪। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 57.

www.amarboi.org

স্বাধীনতা যুদ্ধের সমাপ্তি-দৃশ্য

ভারতীয় লেখক Asoka Raina তার 'Inside Raw : The Story of India's Secret Service' ইতে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দৃশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"ঘটনা দ্রুত গড়িয়ে চললো। পাকিস্তানী প্রতিরোধের দ্বীপগুলো এড়িয়ে ভারতীয় বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হলো ঢাকার দিকে। ভারতীয় RAW এজেন্টদের পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতেই পাকিস্তানী প্রতিরোধ বাহিনীর। চোখে ধুলা দিয়ে এভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল। পাকিস্তানীরা অনেক জায়গায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর দ্বারা নাজেহাল হয়ে এবং ভারতীয় বাহিনীর অব্যাহত সাফল্যে তারা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। ঢাকা ও তার আশেপাশের উপর ক্রমাগত আক্রমণ পাকিস্তানী ইস্টার্ন কমান্ডকে স্থবির করে দিয়েছিল এবং এখান থেকে সৈন্যরা কোন নির্দেশনাই পাচ্ছিল না।

জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা যখন যুদ্ধ বিরতির চেষ্টা করেছিল, ভারত তখন ১২ ডিসেম্বর ঢাকার উপর চূড়ান্ত আঘাতের জন্য তৈরি হচ্ছিল। এ সময় ভারতীয় গোয়েন্দারা একটা বেতার বার্তা ধরে ফেলে, যা ঢাকার উপর চূড়ান্ত আঘাত এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের নিমিত্ত হয়ে দাঁড়ায়। সেই বেতার বার্তাটি ছিল এই ঃ 'আমরা দুপুর ১২টায় গবর্নর হাউজে বৈঠকে বসছি।' এ বার্তা থেকে এটা ধরে নেয়া হলো, একটা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সেখানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বৈঠকটি বানচাল করার পরিকল্পনা নেয়া হলো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো ভারতীয় বিমান বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড বোমা বর্ষণের লক্ষ্যস্থল গবর্নর হাউজের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারছিলো না। বিমান ও সেনাবাহিনী হেড কোয়ার্টারে সকল দৌড়াদৌড়ি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। বয়ে যাচ্ছিলো সময়। বিষয়টা অন্য সংস্থার কাছে পাঠানো হলো। RAW -এর যেসব এজেন্ট ঢাকায় কাজ করছিল দ্রুত তাদের একটি মিটিং ডাকা হলো। এ এজেন্টরা ২৫ মার্চ রাতে সেনা অভিযানের পূর্বক্ষণে ঢাকা ত্যাগ করেছিল। এ এজেন্টদের মধ্যে একজন তার কাছে অবশিষ্ট ঢাকার একটা পর্যটন ম্যাপ মাত্র দিতে পারলো। ম্যাপটার অবস্থা ছিলো খুব খারাপ। তবু কোনো রকমে তাকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে আকাশ থেকে দেখা যায়, এমন একটা ভূমি চিহ্ন নির্দিষ্ট করে গবর্নর হাজউকে চিহ্নিত করা হলো। RAW-এর তৈরি এ নির্দেশনা ম্যাপটি বিমান বাহিনীর পাইলটের হাতে পৌছানো হলো।........ ভারতীয় বিমান বাহিনীর হান্টার বিমান বোমা বোঝাই করে বেলা ১২টার দিকে কোলকাতা থেকে আকাশে উড়লো। বোমা ফেলা হলো।

পরে পাওয়া তথ্যে জানা গিয়েছিলো, গবর্নর মালিক দৌড়ে নেমে গিয়েছিলেন ভূ-গর্ভস্থ বাংকারে। নামায পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে তাঁর মন্ত্রিসভার

www.amarboi.org

সহযোগীদের সমেত তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।[১] তারপর রেডক্রসের নিয়ন্ত্রণাধীন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন পাকিস্তান সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সামরিক প্রশাসক জেনারেল নিয়াজীর উপর যুদ্ধ পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়লো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তখন প্রায় শেষ। এর দুদিন পর নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলেন। আর বাংলাদেশের জন্ম হলো।"[২]

১৬ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় জেনারেল নিয়াজী রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর আত্মসমর্পণের দলিল ভারতীয় জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার হাতে তুলে দিলেন। আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করলেন জেনারেল নিয়াজী এবং জেনারেল অরোরা। এ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি হাজির ছিলেন না। চারটের দিকে জগজিৎ সিং অরোরা এবং অন্যান্য জেনারেলরা এ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য ঢাকা অবতরণ করতে পারলেন। কিন্তু জেনারেল ওসমানির আসা হয়নি। বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানি বিভিন্ন সমরাঙ্গন সফর করার উদ্দেশ্যে ১১ ডিসেম্বর থেকে কোলকাতায় অনুপস্থিত থাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি।[৩] একথা সর্বৈব মিথ্যা ও বানোয়াট। জেনারেল ওসমানির বক্তব্যই এর জলজ্যান্ত প্রমাণ। তিনি বলেন, ঐ দিন এর আগের দিন আমি ময়নামতির রণাঙ্গনে, ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজন করি। ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে তদানীন্তন লেঃ কর্নেল সফিউল্লাহর 'এস' ফোর্স রণাঙ্গন পরিদর্শন করার জন্য আমার যাবার কথা ছিলো। জেনারেল জগজিৎ সিংহ সেদিন না যেতে অনুরোধ। করে বলেন, সেদিন 'এস' ফোর্স পরিদর্শনে অসুবিধা হতে পারে, যেহেতু তারা অগ্রসর হচ্ছেন। আমি তখন আমার সফরসূচি পরিবর্তন করে সিলেটে 'জেড' ফোর্স পরিদর্শনে যাবার সিদ্ধান্ত নেই। .... বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানতেন আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে। তাছাড়া মিত্র বাহিনীর উচ্চতম কর্মকর্তারাও জানতেন আমি কোথায়।[৪]

১। "Mr. A. M. Malik, the governor wrote the draft of his cabinet resignation letter to the president Yahya with shaking ball point on a scrap of office paper as the Indian MIG-21s destroyed his official residence............All morning Mr. Malik and his cabinet had been unable to decide whether to resign or hang on. The Indian air raids finally decided him....... The resignation effectively throws all responsibility for a last-ditch stand on the East Pakistan army Commander Lt. gen A. A. K. Niazi, who yesterday vowed to fight to the last man. "The Times Dec. 15.71.

২। Inside RAW : The story of India's Secret Service Page 60-61

৩। মূলধারা ৭১. পৃষ্ঠা- ২৩৬।

৪। সাপ্তাহিক 'বিক্রম', ১২ ডিসেম্বর, ১৯৮৮।

www.amarboi.org

দেখা যাচ্ছে ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে জেনারেল ওসমানি ও জেনারেল অরোরা এক সাথেই ছিলেন। বিকেল ৪টার সময় জেনারেল অরোরা ঢাকা আসেন। যে সংবাদ পেয়ে জেনারেল অরোরা ঢাকা এলেন, সেই সংবাদ পেলে জেনারেল ওসমানি ঢাকা আসতে পারবেন না কেন? আসলে তাঁকে জানানো হয়নি। জানানো হয়নি তাঁকে ঢাকা আসা থেকে বিরত রাখার জন্যই। জেনারেল ওসমানির মতো করে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য ব্রিগেড কমান্ডারদেরকেও ঢাকা আসতে বাধা দেয়া হয়েছে। জনাব এম. আর. আখতার মুকুল লিখেছেন, "আমাদের যেসব ব্রিগেড কমান্ডার যুদ্ধ করে ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছিলেন, তাঁদেরকে ভারতীয় বাহিনী ঢাকায় আসতে না দিয়ে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। .... সাবরুম সেক্টর থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসরমান তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানকে তাঁর 'জেড ফোর্স' নিয়ে সিলেটের দিকে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো। 'কে ফোর্স-এর অধিনায়ক খালেদ মোশাররফ কসবা আখাউড়া থেকে দুর্বার গতিতে ঢাকার পথে দাউদকান্দি পর্যন্ত এসে হাজির হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বাহিনী কর্তৃপক্ষ তাঁকে পথ পরিবর্তন করে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়। অথচ খালেদ মোশাররফের দুই নম্বর সেক্টরের'ক্র্যাক প্ল্যাটুনের' প্রধান ক্যাপটেন হায়দার তাঁর দলবল নিয়ে ঢাকার আশে-পাশে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।"[৫] 'একাত্তরের রণাঙ্গন' শীর্ষক গ্রন্থে 'এস ফোর্স-এর অধিনায়ক সফিউল্লাহর এক সাক্ষাতকার থেকে জানা যায়, ভারতীয় কমান্ডার তাঁর ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়া পছন্দ করেননি। আখাউড়া দখলের পর ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক তাকে বললেন আখাউড়া প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য এবং তার বাহিনী ভৈরবের দিকে যাবে বলে জানালেন। তখন 'এস ফোর্স' এর অধিনায়ক সামনে এগিয়ে যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক তাঁকে বললেন, 'তাহলে তো আপনাকে নিজস্ব প্রবেশ। পথ নিতে হবে।' 'এস ফোর্স'-এর অধিনায়ক বললেন, তাই হবে। ভৈরবে পৌছে ভারতীয় কমান্ডার বললেন, আপনি ফরটিন্থ ডিভিশনকে ঘিরে রাখুন। তিনি বললেন, ফরটিন্থ ডিভিশন ঘিরে রাখার জন্য কিছু ফোর্স রেখে আমিও ঢাকা যাব।' ভারতীয় কমান্ডার বললেন, আমাদের ফোর্স তো হেলিকপ্টারে নরসিংদী যাচ্ছে, আপনি কিভাবে যাবেন? 'এস ফোর্স-এর কমান্ডার বললেন, ঠিক আছে, আমি হেঁটে চলে যাব। নরসিংদী আসার পর ভারতীয় অধিনায়ক আমাদের কমান্ডারকে বললেন, আপনি নরসিংদী থাকুন, আমরা ঢাকা যাচ্ছি। 'এস ফোর্স-এর কমান্ডার মেজর শফিউল্লাহ বললেন, 'নরসিংদীতে আমার থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমিও ঢাকা যাব।' অতপর নরসিংদীর সব যানবাহন ভারতীয় বাহিনী নিজেরা নিয়ে ডেমরা পৌছেন। আমাদের কমান্ডার তাঁর বাহিনীসহ পায়ে হেঁটে ভোলতা পুলের কাছে আসেন। সেখান থেকে কোণাকুণি পথে রূপগঞ্জ দিয়ে শীতলক্ষ্যা ও বালু নদী অতিক্রম করে ডেমরার পেছনে গিয়ে উঠেন।'[৬]

৫। আমি বিজয় দেখেছি, পৃষ্ঠা-২১৭-২১৮।

৬। 'একাত্তরের রণাঙ্গণ', পৃষ্ঠা ১৫২।

www.amarboi.org

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের এ দুর্দশার কাহিনী প্রমাণ করে, ভারতীয় বাহিনী আমাদের সেক্টর কমান্ডারদের শুধু ঢাকা আসতেই বাধা দেয়নি, মুক্তিবাহিনীকে তারা অনুগত অনুল্লেখযোগ্য বাহিনীর বেশি মর্যাদা দিতে চায়নি। যার কারণে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডাররা পর্যন্ত অত্যন্ত অপমানকর আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন। এমনকি বাংলাদেশ সরকারও তাদের তাচ্ছিল্য ও অপমানকর আচরণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এ সম্পর্কে একটা সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন নবম সেক্টরের কমান্ডার জনাব মেজর এম এ জলিল। তিনি লিখেছেন ঃ

"বরিশাল সদর থেকে নির্বাচিত জনপ্রিয় সংসদ সদস্য (প্রাদেশিক) জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ইতিপূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে বরিশালে ফেরত এসে আমাকে জানালেন যে, লেঃ জেনারেল অরোরা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সর্বাধিনায়ক এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালি সামরিক অফিসারের কাছে অস্ত্র সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। এ তথ্য লাভের মাত্র ১ দিন পরেই আমি কিছু মুক্তিযোদ্ধা সহকারে ভারত অভিমুখে রওয়ানা হয়ে প্রথমে পৌঁছি পশ্চিম বাংলার বারসাত জেলার হাছনাবাদ বর্ডার টাউনে। ঐ অঞ্চলের বি এস এফ-এর কমান্ডার লেঃ কর্নেল শ্রী মুখার্জীর সঙ্গে হয় প্রথম আলোচনা। কমান্ডার মুখার্জী অত্যন্ত সুহৃদ বাঙালি অফিসার। তিনি সর্বান্তঃকরণেই আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সরাসরি লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে নিয়ে গেলেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে তার হেডকোয়ার্টার। তিনি আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। সাক্ষী-প্রমাণ দাবী করলেন আমার। তখনই আমাকে সদ্য ঘোষিত স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এবং সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানি সাহেবের নাম নিতে হয়েছে। উত্তরে জেনারেল অরোরা সাহেব আমাদের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে যা বাজে মন্তব্য করলেন তা, কেবল 'ইয়াঙ্কী'দের মুখেই সদা উচ্চারিত হয়ে থাকে। সোজা ভাষায় তার উত্তর ছিলো 'ঐ দুটো ব্লাডি ইঁদুরের কথা আমি জানি না। ওদের কোনো মূল্য নেই আমার কাছে। অন্য কোনো সাক্ষী থাকলে বলো।'

মহা মুশকিল দেখছি!...... ব্যাটা বলে কি? আমার স্বাধীন বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সম্পর্কেই যে ব্যক্তি এরূপ কদর্য উক্তি করতে ছাড়েননি, তিনি আমার মতো চুনোপুঁটিদের যে কি চোখে দেখবেন তা অনুধাবন করতেই একটা অজানা আতংকে আমার সর্বাংগ শিহরিয়ে উঠলো।[৬-ক]

অন্যান্য অনেক ভারতীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যেও এ মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। মুক্তিবাহিনীর ভূমিকাকে তারা সব সময় তুচ্ছ ও অনুল্লেখযোগ্য করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং তাঁর 'দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ' গ্রন্থে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতাকে সারা সীমান্ত জুড়ে ভোকরানো অভিযান' বলে অভিহিত করেন এবং 'ঘুমন্ত সিংহের উপর পিঁপড়ার

৬। ক- অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃষ্ঠা-২২।

www.amarboi.org

আক্রমণ'-এর সাথে তুলনা করেন।[৭] তিনি লিখেন, 'সকল পর্যায়ে 'যুদ্ধ যুদ্ধ' খেলা থেকে যে স্ট্র্যাটেজী অবশেষে উদ্ভাবিত হলো তা হচ্ছে মুক্তিবাহিনী অপরাশেনের নামে ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে সীমান্ত সজীব রেখে পাকিস্তানী বাহিনীকে বের করে নিয়ে আসা।'[৮] মুক্তিবাহিনীর যোগ্যতার উপর কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার দ্বারা সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা কমে যায়। কারণ, এটা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, এ ধরনের তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর থেকে (পাকিস্তানী) সামরিক আধিপত্য শিথিল করতে সময় লাগবে।[৯] ভারতে ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল লছমন সিংও এ একই সুরে কথা বলেন। তিনি তাঁর Indian Sword Strikes in East Pakistan' গ্রন্থে উত্তর-পশ্চিম সেক্টরের যুদ্ধ-পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'আমি একমত যে, গেরিলাদের একার পক্ষে পাকিস্তান বাহিনীকে ধ্বংস করা অসম্ভব ছিলো, তবে তারা পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিশৃংখলা, গোলযোগ ও সংঘাত অব্যাহতভাবে টিকিয়ে রাখতে পারতো।[১০] মিঃ লছমন সিংহ আরও অগ্রসর হয়ে মুক্তিবাহিনীকে ফায়ফরমাশ খাটা সহকারীর ভূমিকায় নামিয়ে ছেড়েছেন। তিনি বলছেন, 'তারা (মুক্তিবাহিনী) পথপ্রদর্শক স্থানীয় বিষয়াদির ব্যাখ্যা দানকারী, তথ্য ও কাজের লোক সংগ্রহকারী হিসেবে অত্যন্ত উপকারী ছিল।'[১১]

যারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এ দৃষ্টিতে দেখতো, তারা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ককে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ককে ঢাকা আসতে দিয়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হতে দেবে কেন? তারা হয়তো মনেও করেছে যে, যুদ্ধটা পাক-ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক অবান্তর। সম্ভবত এ কারণেই নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল ভারত সরকারই গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব ভারত সরকার তাদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মানেক শ'র হাতে অর্পণ করে।[১২] জেনারেল মানেকশ'ই আত্মসমর্পণের শর্ত-শরায়েত নিয়ে দরকষাকষি করেন। তিনি

৭। The Liberation of Bangladesh. Page, 123.

৮। The Liberation of Bangladesh, Page, 92.

৯। The Liberation of Bangladesh. Page, 106.

১০। Indian sword Strikes in East Pakistan, Page-20.

১১। Indian sword Strikes in East Pakistan, Page-181.

১২। "At 6-30 P.M. on December 14. General Niazi........appearec at the American consulate general in Dhaka seeking help. He wanted the Indians for ceasfire...... V. S. Consul General Herbert Spivak followed protocol to the letter and sent Niazi's plea to Washington for rebroadcasting. It was received in the state departiment at 7-45 P.M Dhaka time. The state Department, despite its public pleas for peace, did not expedite General Niazi's ceasfire message. The cable was

www.amarboi.org

নিছক যুদ্ধ বিরতির নিয়াজীর 'প্রস্তাব প্রত্যাখান করে দাবী করেন, ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাক বাহিনীর শর্তহীন আত্মসমর্পণই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার একমাত্র ভিত্তি হতে পারে।[১৩] যুদ্ধ বিরতির এ প্রস্তাব এবং যুদ্ধ বিরতির এসব শর্ত-শরায়েত সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার এবং সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি কিছুই জানতেন না, তাঁদের অবহিত করা হয়নি। সব যখন শেষ, তখন ১৬ ডিসেম্বর বেলা ১২টার দিকে ভেসে আসা একটা খবরের মতো বাংলাদেশ সরকার জানতে পারলেন যে, আজ আত্মসমর্পণ হচ্ছে।[১৪] এ থেকে প্রমাণ হয়, ভারত যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধ বন্ধ, ইত্যাদি নীতিগত ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীর ভূমিকাকে অবান্তর মনে করতো। অর্থাৎ তাদের কাছে ওটা ছিলো পাক-ভারত যুদ্ধ।[১৫] যৌথ কমান্ডটা যেন ছিলো কৌশলগত ও কূটনৈতিক একটা বর্ম মাত্র।[১৬]

---

forwarded to Ambassador Farland in Islamabad, to have him seck with Yahya.....It was 3-30 A. M. in Dhaka before Washington received sufficient confirmaion from Islamabad........ The message was finally sent to Ambassador keating in New Delhi, Where it was received at 12-56 P. M. It took another hour and a half to decode the message, locate Indian officials and deliver it to them ......"The Anderson paper. PP,-267-268 (মূলধারা, ৭১. পৃষ্ঠা-২৩৩)

১৩। মূলধারা, ৭১, পৃষ্ঠা-২৩৪-২৩৫
"Since you (Niazi) have indicated your desire to stop fighting. I (General Manekshaw) expect you to issue orders to all forces unber your command in Bangladesh to ceasfire immediately to my advancing forces wherever they are located......... Immediately I receive a positive response from you I shall direct Gen, Aurora........ to refrain from all air and ground action against your force." Daily Telegraph, Dec. 16. 1971.

১৪। "১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ কোলকাতাস্থ থিয়েটার রোডে মুজিব নগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে খবর এসে পৌছলো যে, ঢাকার হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণে সম্মত হয়েছে।......... তাজউদ্দীন আহমদ প্রতি মুহূর্তের খবরের জন্যে উদগ্রীব ছিলেন। এমন সময় খবর এলো, আজ বিকেলেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় আত্মসমর্পণ হবে।"-আমি বিজয় দেখেছি'-এম আর আখতার মুকুল, পৃষ্ঠা-৩০৮।

১৫। লক্ষণীয়, ভারতের ইষ্টার্ন নেভাল কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডার ইন-চীফ ভাইস এডমিরাল এস, কৃষ্ণাণ-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের উপর লিখিত 'নো ওয়ে বাট সাবেন্ডার' গ্রন্থের প্রচ্ছদ শিরোনাম ছিলোঃ 'An account of the Indo-Pakistan war in the Bay of Bengal? আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উপর ভারতের মিঃ প্রাণ চোপরার লিখিত একটা বইয়ের নাম ঃ The Second Revoliution of India.

১৬। "আসলে শুধু সামরিক দিক বিবেচনা করলে ভারী অস্ত্রশস্ত্র বিবর্জিত বাংলাদেশ বাহিনীর জন্য এ ধরনের পৃথক মোতায়েন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে এটা দেখানো দরকার ছিলো যে, বৃহৎ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বাহিনী ভিন্নভাবে যুদ্ধ করছে।" দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং, পৃষ্ঠা - ৩৬।

www.amarboi.org

তাছাড়া 'তাঁর (সুখওয়ান্ত সিং) গ্রন্থে যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক এবং প্রবাসী সরকারের নেতৃবর্গের কোনো ভূমিকাই স্বীকার করা হয়নি। তাঁর বর্ণনা মতে যুদ্ধে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে লেঃ জেনারেল কে কে সিং এর নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনীর কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটা টিম।"-(মাসিক ডাইজেষ্ট, জানুয়ারি, ১৯৮৬)

মুক্তিবাহিনীর প্রতি তাচ্ছিল্য ও অমর্যাদাকর ব্যবহার দেখে এটাই মনে হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর প্রতি তারা এ মানসিকতা পোষণ করলেও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানির ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও মর্যাদাবোধকে তারা ভয় করতো। জেনারেল ওসমানি তাঁর দেশ, তাঁর বাহিনীর মর্যাদার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। ভারতীয় বাহিনীর মিলিটারী অপারেশনের ডিপুটি ডিরেক্টর মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং বলেছেন, "তিনি (ওসমানি) মুক্তিযুদ্ধকালে যেখানেই গিয়েছেন, একটা স্বাধীন দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে মর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্তির দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো। আমার মনে আছে, একবার একজন ভারতীয় আর্মি কমান্ডার তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য রানওয়েতে তৈরি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিমান অবতরণ করাতে অস্বীকার করেন, যদিও তাঁর বিমান আগেই এয়ারফিল্ডে এসে পড়ে। বেচারী পাইলটকে প্রায় দশ মিনিট আকাশে চক্কর দিতে হয়। সাথের বিমানে আরোহী ভারতীয় কমান্ডার আগে নেমে তাকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হবার পরই তার বিমান অবতরণ করে। ওসমানির মনোভাব ছিলো যে, তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত হলেও দেশের উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার আছে। তাঁর দেশের জন্য সাহায্য প্রয়োজন, ভিক্ষা নয়। প্রাথমিকভাবে তাঁর সৈন্যরা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু পরাজিত হয়নি। যদিও তিনি জুনিয়র র‍্যাংকের ছিলেন, তবু মর্যাদা ও অন্যান্য যে কোন দিক দিয়েই ভারতীয় প্রতিপক্ষের কোন অংশেই কম ছিলেন বলে মনে করতেন না।[১৭] জেনারেল ওসমানি সাহায্য ছাড়া অন্য কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ও মুরুব্বিয়ানা সহ্য করতে চাইতেন না। সুখওয়ান্ত সিং-ই বলেছেন, "নিজ দেশের স্বাধীন সত্তা সম্পর্কে তাঁর যে ভয়ংকর অহংকার ছিলো তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এটা চেয়েছিলেন। তাঁর বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সাথে সংযুক্ত বলে বিবেচিত হোক, এটা তিনি কিছুতেই চাইতেন না।[১৮] জেনারেল অরোরার একক নেতৃত্বে যৌথ কমান্ড গঠন করাকেও তিনি সহজভাবে নিতে পারেননি, কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করার ক্ষমতাও তাঁর ছিলোনা। "তাই দেখা যায়, যৌথ কমান্ড গঠনের পরও তিনি মুক্তিবাহিনীকে সরাসরি কমান্ড করতেন। কিন্তু কোন বেতার যন্ত্র না থাকায় সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিলো না।[১৯] মেজর জেনারেল লছমন সিং-এর অভিযোগ থেকেও এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি লিখেন, "মুক্তিবাহিনী তাঁর কমান্ডে আসলেও তারা অনেক সময় তাদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো কাজ করতো এবং এর ফলে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের সমস্যা দেখা দিতো। এ ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো পরিষ্কার নির্দেশ পাননি।[২০] কথাটাকে আরও পরিষ্কার করে তিনি লিখেন, "শেষ দিন পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী

১৭। দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৩৪ (মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং)।

১৮। দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৩৪ (মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং)।

১৯। "একাত্তরের রণাঙ্গন" পৃষ্ঠা - ১৮৫।

২০। Indian Sword Strikes in East Pakistan, Page-178.

www.amarboi.org

সরাসরি জেনারেল ওসমানির কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে এসেছে, যা তাদেরকে দেয়া আমাদের পরিকল্পনা ও নির্দেশের সাথে সবসময় সংগতিপূর্ণ হতো না।[২১]

এ ধরনের স্বাধীনচেতা এবং দেশ ও জাতির মর্যাদার ব্যাপারে আপোসহীন মুক্তিযুদ্ধের যে সর্বাধিনায়ক ওসমানি, তাঁকে ঢাকায় নিয়াজীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ডাকা হবে কেন? ভারতীয়রা ভয় করছে যে, নিজ দেশে ভারতীয় জেনারেলের কাছে পরাজিত শত্রু পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের দৃশ্য বসে বসে দেখতে জেনারেল ওসমানি কিছুতেই রাজী হবেন না, এ অসংগত ব্যবস্থা তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না। এ জন্যই আত্মসমর্পণের গোটা ঘটনা তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে এবং কৌশলে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়।[২২] এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শত অনুরোধ সত্ত্বেও জেনারেল ওসমানি কোনো দিনই মুখ খোলেননি, বলা হয়, "যুদ্ধ বিধ্বস্ত নবীন দেশের কর্মবীর হিসেবে হাজারো জটিল সমস্যার সমাধান চিন্তায় ব্যাপৃত .... শেখ মুজিবুর রহমান পুরনো দিনের কোনো কথা নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হোক এটা হয়তো অভিপ্রেত মনে করেননি। আর তাই হয়তো জেনারেল ওসমানিকে কিছু কিছু কথা প্রকাশ না করতে

২১। Indian Sword Strikes in East Pakistan, Page-181.

২২। জেনারেল ওসমানি ১৬ ডিসেম্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানটিতে কেন হাজির থাকেননি তার আর একটা বিবরণ পাওয়া গেছে সাংবাদিক (বর্তমানে 'দৈনিক মানব জমীন' সম্পাদক) মতিউর রহমান চৌধুরীর কাছ থেকে। তিনি বলছেন ঃ
নয় মাস আমরা যুদ্ধ করেছি পাক হানাদার বাহিনীর সাথে। .... পাক বাহিনী শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো প্রায় এক লাখ পাকিস্তানী আধুনিক সৈন্য। মুজিবনগর সরকারের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন মাত্র। এ নিয়ে বিতর্ক ১৯৭২ সাল থেকেই। জেনারেল ওসমানি জীবিত থাকা অবস্থায় বলে যাননি কেন তিনি সোহ্‌রাওয়াদী উদ্যানে আসেননি। তৎকালীন সরকারও কোনো সময় বলেননি। ......১৯৭১ সালের অক্টোবর। প্রবাসী মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকার একটি সমঝোতায় এলেন। সাতটি বিষয়ে সমঝোতা। এ দিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ভারতের একজন কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের ভয়াবহতা ভেবে এ অনুষ্ঠানেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি এ চুক্তি। মুজিবনগর সরকারের অনেকেই জানতেন না। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন মরহুম তাজউদ্দীন...... প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ই ছিল চুক্তির প্রধান লক্ষ্য। প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্যে সিদ্ধান্ত হলো মুক্তিযুদ্ধ করেনি এমন কর্মকর্তাদেরকে চাকরি থেকে অবসর দেয়া হবে অভিজ্ঞ কর্মচারীর শূন্যতা পূরণ করবে ভারতীয় কিছু প্রশাসনিক কর্মকর্তা। লক্ষ্য করে দেখবেন স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ভারতীয় সিভিল সার্ভিস অফিসার ঢাকা এসেছিলেন।
বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না। আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটা প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী থাকবে। যা পরে রক্ষীবাহিনী হিসেবে গঠিত হয়েছিল। প্রশিক্ষণে ছিলেন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাগণ। সামরিক সমঝোতার মধ্যে আরো ছিলো-বাংলাদেশে ভারতের সেনাবাহিনী থাকবে। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ হবে। ৭২ সনের নভেম্বর থেকে এর কাজ শুরু হবে।
বাণিজ্যিক সমঝোতা ছিলো খোলা বাজার প্রতিষ্ঠা। সীমান্তের তিন মাইল জুড়ে চালু হবে খোলা বাজার। কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শুধু বছর শেষে হিসেব-নিকেশ হবে। প্রাপ্য মেটানো হবে পাউণ্ড-স্টার্লিং এর মাধ্যমে। বিদেশ বিষয়ে ভারত যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে। সাউথ ব্লকের এ্যানেকস হবে সেগুন বাগিচা। এক কথায় বলা চলে উল্লিখিত চুক্তি বলে ভারত বাংলাদেশের সামরিক ও পররাষ্ট্র বিষয়ের কর্তৃত্ব পেয়ে যায়।
পাকিস্তানের সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কসহ প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পাবেন না। এ কারণেই জেনারেল ওসমানি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে দর্শকের ভূমিকা পালন করতে রাজী হননি।' (শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন'- মতিউর রহমান চৌধুরী, নাঈমুল ইসলাম খান সম্পাদিত, বাড়ি ৫০ সড়ক ২ এ ধানমণ্ডি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কাগজ', ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১১ জানুয়ারি ১৯৯০)

www.amarboi.org

তিনি অনুরোধ করেছেন। একদিকে বঙ্গোপসাগর আর অপর তিন দিকে বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে হয়তো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সব সত্য কথা সবসময় প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর যেহেতু জেনারেল ওসমানি বঙ্গবন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন, কিছু কিছু কথা প্রকাশ করবেন না, তাই তিনি নীরব রইলেন। 'হাফ ট্রুথ' প্রকাশ করার লোক তিনি ছিলেন না।[২৩] কিন্তু অনেক পরে অবশেষে তিনি মুখ খুলতে চাইলেন। তিনি প্রকাশ করতে চাইলেন অন্ধকারের ঘটনাগুলো। ১৯৮৩ সালের ২৪ নবেম্বর বিচিত্রা এক সাক্ষাতকার নেয়ার সময় তাঁকে প্রশ্ন করে, 'পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ আপনার কাছে হলো না কেন? জেনারেল ওসমানি বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের এমন অনেক ঘটনা আমি জানি[২৪] যাতে অনেকেরই অসুবিধা হবে। আমি একটা বই লিখছি। তাতে সব ঘটনাই পাবেন।" চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাওয়ার প্রাক্কালে সি এম এইচ হাসপাতালে দেয়া জীবনের এ সর্বশেষ সাক্ষাতকারে অসুস্থ জেনারেল জানান ঃ

"আমার একটা দুঃখ আছে-আমি বাংলা ভাষা দিয়ে লিখতে পারি না। ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া করেছি তাই। তবে আমি বসে নেই-আমি অনেক ঘটনার নোট টুকে রেখেছি। ইংরেজিতে। একটা আত্মজীবনী লিখবো। অনেক অজানা ইতিহাস থাকবে তাতে। জেনারেল ওসমানির জীবনী গ্রন্থ হবে না সেটা-সেটা হবে বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাস। দেশবাসীর কাছে আমি ঋণী। অনেক আগের পাওনা তাদের।......... বইটা

২৩। জেনারেল ওসমানি নীরব রইলেন কেন? এম. মমিন উল্লাহ, মাসিক ভাইজেষ্ট, জানুয়ারি ১৯৮৬।

২৪। অনেক ঘটনার মধ্যে দিল্লীর সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের গোপন চুক্তিও একটা। সাংবাদিক জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী গোপন চুক্তির যে বিবরণ উপরে দিয়েছেন, তার চেয়েও সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন প্রধান স্বাধীনতার পর দিল্লীতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার, পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে (১৯৯৬-২০০১) জাতীয় সংসদের স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। তিনি একটি সাক্ষাতকারে বলেন, "১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এক লিখিত চুক্তিতে, প্যাক্ট নয়, এগ্রিমেন্টে আসেন। ওই চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট অনুসারে দুপক্ষ কিছু প্রশাসনিক , সামরিক ও বাণিজ্যিক সমঝোতায় আসেন। প্রশাসনিক বিষয়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের যে প্রস্তাবে রাজি হন, তাহলো যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকিদের চাকরিচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশে এসে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিব) এসে তাদেরকে বের করে দেন।

সামরিক সমঝোতা হলো-বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন অবস্থান করবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুননীরিক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না।

অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

ওই লিখিত সমঝোতাই হচ্ছে বাংলাদেশে রক্ষী বাহিনীর উৎস। আর ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ বিষয়ক সমঝোতাটি হলো-সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনী সর্বাধিনায়ক নন। যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

চুক্তির এ অনুচ্ছেদটির কথা মুক্তিবাহিনী সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে জানান হলে তীব্র ক্ষোভে তিনি ফেটে পড়েন। এর প্রতিবাদে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকেন না।"

www.amarboi.org

শেষ করে প্রকাশ না করতে পারলে আমার মৃত্যুর সাথে সাথে আমার লাশের মতো অনেক অজানা কথা, অনেক অপ্রকাশিত ইতিহাস কবরের মাটিতে চাপা পড়বে। এটা হওয়া উচিত না........ ভাবছি, ভালো হয়ে ফিরে এসে অবশ্যই বইটি লিখবো-আর কিসের ভয়। কারে ভয়। এক বঙ্গবন্ধুকে ভয় করতাম।[২৫] সেই লোকটারে কথা দিয়েছিলাম, কিছু কিছু কথা লিখবো না, বলবো না। তিনিও নাই, আমার দেওয়া কথাও নাই। এই সব কথা বর্তমান ও আগামী দিনের নাগরিকদের জানা দরকার। হ্যাঁ, আমি লন্ডন থেকে ফিরেই লিখবো নিয়মিত।"[২৬]

কিন্তু জেনারেল ওসমানি আর ফিরে আসেননি। ফিরে এলো তাঁর লাশ। তিনি জাতিকে যা জানাতে চেয়েছিলেন, তা অজানাই থেকে গেল। যা বলা তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন, তা তাঁর না বলাই রয়ে গেল। অজানা রয়ে গেল, কি ছিল সে ষড়যন্ত্র যার শিকার হয়েছিল দেশ, দেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তিনি! বলার অনেক কথা, অনেক ইতিহাস জমেছিল তাঁর বুকে। ১১নং সেক্টরের অধীনস্থ মুক্তিযুদ্ধের ইনটেলিজেন্স গ্রুপের সৈয়দ আবুল হোসেন রাজার একটি উক্তি ঃ "সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে দিল্লীতে বাংলাদেশের অস্থায়ী কেবিনেটের যে সভা হয়,[২৭] , তাতে যোগদান শেষে দেশে ফিরে (জেনারেল ওসমানি) রণাঙ্গনে দেয়া তাঁর ভাষণে আমাদের বলতেন ঃ 'আজ থেকে আমাদের তিনটি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এর একটি হচ্ছে পাক হানাদার বাহিনী, আরেকটি হলো আমাদের যুদ্ধকালীন সরকারের দুটি বিভক্ত শিবির। কিন্তু তৃতীয় শত্রুর কথা তিনি মোটেই বললেন না। উনি ব্যথিত সুরে বলতেন, প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে আজাদ করার জন্য আমাদের নেতৃত্বে আজ যারা যুদ্ধ করছেন, তাদের নিকট আমার সতর্কবাণী ঃ আমরা কারো করুণার পাত্র রূপে যুদ্ধ করছি না।"[২৮]

তৃতীয় শত্রুটির নাম সেদিন জেনারেল ওসমানি ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে না বলতে পারলেও সে শত্রুকে আমরা চিনি। কিন্তু কি জেনে, কি দেখে, কি বুঝে, কোন কারণে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি সেদিন হানাদার পাক-বাহিনীর সাথে স্বাধীন বাংলা সরকার ও ভারতকে একই শত্রুর কাতারে শামিল করলেন, তা আর কোনো দিনই জানা যাবে না। জানা যাবে না, কি তিনি বলতে চেয়েছিলেন আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে লন্ডন যাবার প্রাক্কালে! এ জানাটা বাদ দিয়ে বর্তমানে প্রচলিত ইতিহাস শুনে কি জাতির, যে প্রয়োজন তা মিটাতে পারে![২৯]

২৫। এ ভয় কিন্তু তাকে নীতিচ্যুত করতে পারেনি। শেখ মুজিব যখন ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠন করে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করলেন, তখন তিনি এর প্রতিবাদে জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

২৬। বিচিত্রা, নভেম্বর ২৪, ১৯৮৩

২৭। ২৮ সেপ্টেম্বর ইন্দিরা গান্ধী মস্কোতে রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশ ব্যাপারে চূড়ান্ত বোঝাপড়ায় বসার আগে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সম্ভবত ভারত বাংলাদেশ সরকারের সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে।

২৮। 'আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ওসমানি না থাকার নেপথ্য কথা-গোলাম ফারুক, বিক্রম ডিসেম্বর, ১২, ১৯৮৮

২৯। "এই যে এতো স্বাধীনতা যুদ্ধের বই বাজারে-আমি তার অনেকগুলোই দেখেছি। পাবলিক লাইব্রেরীতে গেছি-দেখেছি সব মুক্তিযুদ্ধের রূপকথা।......."-জেনারেল ওসমানি, সাক্ষাতকার, বিচিত্রা ২৪ নভেম্বর, ১৯৮৩।

www.amarboi.org

আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার

সেই ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ক্লাসে প্রথম শুনি যে, ধর্ম-জ্ঞান, গবেষণা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরোধী। তারপর এই কথা নানাভাবে আরও অনেকের কাছে শুনেছি। লেখা-পড়া যাদের মূর্খ বানিয়েছে, তারা এখনও এসব কথা বলে থাকেন সুযোগ পেলেই। এদের রাগ ইসলামের উপরই বেশি। খ্রিস্টান ধর্ম প্রধানত পাশ্চাত্যের এবং হিন্দুধর্ম ভারতের, তাই এসব ধর্ম ওদের কাছে প্রগতিশীল। কিন্তু মুসলিম দেশগুলো অনুন্নত ও দরিদ্র বলে ইসলামকেও ওরা জ্ঞান-বিজ্ঞান বিমুখ ও অনুন্নয়নের প্রতীক বলে চলছে। অথচ ইসলাম সবচেয়ে বিজ্ঞানমুখী ও সবচেয়ে প্রগতিশীল ধর্ম। ইতিহাসের সাক্ষ্যও এটাই। Prof. Joseph Hell বলেন, "মানব জাতির ইতিহাসে স্বীয় ছাপ মুদ্রিত করা সব ধর্মেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য। ......কিন্তু ইসলাম যতটা দ্রুতবেগে ও অকপটভাবে বিশ্ব মানবের হৃদয় স্পর্শকারী মহা পরিবর্তন সাধন করেছে, জগতের অন্যকোন ধর্ম তা পারেনি।"[১] এই কথাই আরও স্পষ্ট করে বলেছেন ঐতিহাসিক O. J. Thatcher Ph. D এবং F. Schwill Ph. D তাদের ইতিহাস গ্রন্থে, "পয়গম্বর মোহাম্মদের মৃত্যুর পর পাঁচশ' বছর তার অনুগামিরা এমন এক সভ্যতার পত্তন ঘটায় যা ইউরোপের সবকিছু থেকে বহুগুণ অগ্রগামী।"[২] আর Meyrs তার Mediaeval and Modern History' তে বলেন, "সেখানে এমন এক সভ্যতার উত্থান ঘটে, দুনিয়া যা দেখেছে এমন সবকিছুকেই তা অতিক্রম করে যায়।"[৩]

সত্যই ইসলামের উত্থানের সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এবং সভ্যতার গতিধারায় এক বিস্ময়কর পরিবর্তন সূচিত হয়। ইউরোপ যখন অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও স্বৈরাচারের গভীর ঘুমে অচেতন তখন এশিয়া-আফ্রিকায় ইসলামের আলোকধারা জ্ঞান ও সভ্যতামণ্ডিত নতুন এক বিশ্বের জন্ম দেয়। মানবাধিকার, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক সুবিচার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন সবদিক থেকেই মানব জাতিকে ইসলাম এক অন্যান্য সভ্যতা দান করে।

পাশ্চাত্যের ওরা এখন গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সাংঘাতিক প্রবক্তা সেজেছেন। আর ইসলামকে বলা হচ্ছে মানবতা বিরোধী, অসহিষ্ণু ইত্যাদি। এসব কথা বলার সময় তারা অতিতের দিকে তাকায় না এবং নিজের চেহারার উপর একবারও নজর ফেলেনা। যে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, সে সভ্যতায় গণতন্ত্রতো দূরের কথা কোনপ্রকার সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের কোন স্থান নেই। আভ্যন্তরীণভাবে তাদের নীতি ছিল 'সারভাইভেল অব দা ফিটেস্ট/ এবং আন্তর্জাতিকভাবে তারা অনুসারী ছিল 'মাইট ইজ রাইট'। গ্রীকরা বলতো 'যারা গ্রীক নয় তারা গ্রীকদের কৃতদাস হবে এটা প্রকৃতির ইচ্ছা।' আর রোমানরা মনে করতো, তারাই

www.amarboi.org

পৃথিবীর মালিক, পৃথিবীর সব সম্পদ তাদের জন্যই। ইউরোপের এই অন্ধকার যুগে মানবাধিকার বলতে কোন ধারণার অস্তিত্ব ছিল না। পরাজিত ও ভাগ্যাহতদের নিহত হওয়া অথবা চিরতরে দাসত্বের নিগড়ে বন্দী হওয়াই ছিল ভবিতব্য। নারীদের অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ অধিকার থাকা দূরের কথা তারা পূর্ণ মানুষ কিনা তা নিয়েই ছিল বিতর্ক। শত্রু ও বাদী জাতীয় লোকদের কোন মানবিক অধিকার স্বীকৃত ছিলনা।

এই দুঃসহ অন্ধকারের হাত থেকে ইসলাম মানুষকে মুক্ত করে, পৃথিবীকে নিয়ে আসে আইনী শাসনের আলোকে। চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলাম ঘোষণা করে, বংশ, বর্ণ, জাতি, দেশ নির্বিশেষে সব মানুষ সমান। এই নীতি হিসেবে ইসলাম সব মানুষকেই আইনের অধীনে নিয়ে এসেছে এবং মানুষকে রক্ষা করেছে যথেচ্ছচার থেকে। শত্রু ও পরাজিত বন্দীদেরকেও ইসলাম মানুষ হিসাবে দেখতে বলে। কোন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে এবং তাদের স্থানে মানবসুলভ, মেহমানসুলভ ব্যবহার করতে বলেছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে বন্দীদের সুখাদ্য দিতে হবে, বন্দীদের উত্তাপ ও শৈত্য থেকে রক্ষা করতে হবে, কোন কষ্ট অনুভব করলে দ্রুত তা দূর করতে হবে, বন্দীদের মধ্যে কোন মাতাকে তার সন্তান থেকে, কোন আত্মীয়কে অন্য আত্মীয় থেকে আলাদা করা যাবে না। বন্দীদের মান-মর্যাদা রক্ষাসহ তাদের কাছ থেকে জবরদস্তী কোন কাজ নেয়া যাবে না। যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত এ নীতিমালা ইসলাম দেয় চৌদ্দশ' বছর আগে, পাশ্চাত্য এই শিক্ষা, আংশিকভাবে, গ্রহণ করে মাত্র ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের এক প্রস্তাব আকারে। ইসলাম চৌদ্দশ' বছর আগে বিধান দেয় যে, চিকিৎসা পুরাপুরি মানবীয় সেবা। চিকিৎসক ও সেবাদানকারীদের কোন অনিষ্ট করা যাবে না। ইসলামের এই শিক্ষা গ্রহণ করেই পাশ্চাত্য মাত্র ১৮৬৪ সালে রেডক্রস গঠনের মাধ্যমে চিকিৎসা সুযোগকে শত্রু-মিত্র বিবেচনার উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। মানবতা বিরোধী দাস প্রথা বিলোপের ব্যবস্থা করে ইসলাম চৌদ্দশ' বছর আগে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস প্রথা বিলুপ্ত হয় ১৮৬৩ সালে। ইসলামে পুরুষের মতই নারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক ইসলামের এই শিক্ষার পরও ১১শ' বছর পর্যন্ত পাশ্চাত্য নারীদের শিক্ষার উপযুক্ত ভাবেনি। অবশেষে ১৮৩৫ সালে মার্কিন মেয়েরা প্রথম স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। আর নিজ নামে সম্পত্তি ভোগের অধিকার পায় ১৮৪৮ সালে। অথচ ইসলাম নারীদের এ অধিকার দেয় চৌদ্দশ' বছর আগে। পাশ্চাত্য যেখানে ১৯৪৮ সালের জেনেভা কনভেনশনের আগ পর্যন্ত বিজিত দেশের মানুষকে দাস মনে করতো এবং এখনও লুটতরাজের যোগ্য মনে করে, সেখানে ইসলাম বিজিত দেশের মানুষকে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে দেখে। খিলাফতে রাশেদার যুগে কোন নতুন ভূখণ্ড মুসলমানদের দখলে এলে সেখানকার মানুষকে আর শত্রুর দৃষ্টিতে দেখা হতোনা। মুক্ত মানুষ হিসাবে তাদের এ অধিকার দেয়া হতো যে, তারা একবছর সময়কালের মধ্যে যেন সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা পছন্দের কোন দেশে চলে যাবে, না মুসলিম দেশের নাগরিক হিসাবে বসবাস করবে।

www.amarboi.org

মানবতাকে ইসলাম সম্মান করে বলেই ইসলাম ও মুসলমানরা সহিষ্ণুতার প্রতীক। একটা উদাহরণ এখানে যথেষ্ট। ক্রুসেডের যুদ্ধে খ্রিস্টানরা যখন মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম দখল করে, তখন তারা ৭০ হাজার নাগরিককে হত্যা করে। আর মুসলমানরা যখন খ্রিস্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করে, তখন একজন খ্রিস্টানের গায়েও হাত দেয়া হয়নি। চৌদ্দশ' বছর ইসলাম যে বিচার ব্যবস্থা পত্তন করে, বিশ্ব সভ্যতায় তা অন্যান্য সংযোজন। ইসলামের বিচার ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হয়নি। শুরু থেকেই ইসলাম শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করেছে। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতিদের নিয়োগ করতেন, কিন্তু বিচারপতিরা শাসন-কর্তৃত্বের অধীন হতেন না। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান কিংবা শাসনকর্তারা অভিযুক্ত হলে তারা সাধারণ আসামিদের মতই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারের সম্মুখিন হতেন। অনেক মামলায় নিরপেক্ষ সাক্ষীর অভাবে খলিফারা হেরেছেন। এবং এই হেরে যাওয়াকে তারা মাথা পেতে নিয়েছেন।

মানবাধিকারের মত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইসলাম বিশ্ব সভ্যতায় অনন্য এক কল্যাণ ধারার সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় তখন পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ব্যক্তিস্বার্থ সমূহের পদতলে সামষ্টিক স্বার্থ নিক্ষেপ হতো। ইসলাম ব্যক্তি স্বার্থ ও সামষ্টিক স্বার্থ উভয়কেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করে এবং উভয়ের মধ্যে কল্যাণকর এক ভারসাম্য বিধান করে। সমাজের একক ইউনিট হিসেবে ইসলাম পরিবার ব্যবস্থাকে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। তারপর পরিচয় ও সহযোগিতার জন্য বংশ ও সামাজিকতাকে এবং শাসন ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ আখ্যায়িত করেছে। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনীতির বিতরণধর্মীতা ও পুঁজিগঠন উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়েছে। তবে ইসলামে ম্যাক্রো অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রো অর্থনীতি। ব্যক্তিগত বৈধ সম্পত্তির ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ ইসলাম করেনি, কিন্তু শর্ত দিয়েছে প্রতিবেশী কেউ যেন না খেয়ে না থাকে এবং সঞ্চয়ের বদলে সম্পদ যেন বিনিয়োগমুখী হয়। চৌদ্দশত বছর আগের ইসলামের এই অর্থনীতি আজকের আধুনিক অর্থনীতির চেয়েও আধুনিক ও কল্যাণকর।

সবশেষে আগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের অবদানের কথা। ইসলাম জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর ধর্ম বলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলাম বিশ্বসভ্যতাকে নতুন সাজে সজ্জিত করেছে। খ্রিস্টায় এগার শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞান চর্চার অপরাধে পাশ্চাত্য যেখানে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, সেখানে অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কাল ছিল মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চা ও আবিষ্কারের স্বর্ণযুগ। বিজ্ঞানের ইতিহাসকার জর্জ মার্টন তার পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও আবিষ্কারে ইসলামের অবদানকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন।[৪] তাঁর এই ইতিহাস বলে, ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ- নিরবচ্ছিন্ন এই ৩৫০ বছর জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের চূড়ান্ত আধিপত্যের যুগ। এই সময় যেসব

www.amarboi.org

মুসলিম বিজ্ঞানী পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন জারীর, খাওয়ারিজাম, রাজী, মাসুদী, ওয়াফা, বিরুনী, ইবনে সিনা, ইবনে আল হাইয়াম এবং ওমর খৈয়াম। এই বিজ্ঞানীরা যখন পৃথিবীতে আলো ছড়াচ্ছিল, তখন সে আলোকে স্নাত হচ্ছিল অন্ধকার ও ঘুমন্ত ইউরোপ। ইউরোপীয় ছাত্ররা তখন স্পেন ও বাগদাদের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের পদতলে বসে জ্ঞান আহরণ করছিল। মুসলিম বিজ্ঞানীদের এই ইউরোপীয় ছাত্ররাই জ্ঞানের আলোক নিয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ফল হিসেবে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের পর ইউরোপে ক্রিমোনোর জেরার্ড, রজার বেকন-এর মত বিজ্ঞানীদের নাম সামনে আসতে থাকে। বিজ্ঞানের ইতিহাসকার জর্জ মাটনের মতে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দু'শ পঞ্চাশ বছরের এ সময়ে বিজ্ঞানে অবদান রাখার সম্মানটা মুসলমানরা ও ইউরোপ ভাগাভাগি করে নেয়। এই সময়ের মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন নাসিরউদ্দিন তুসী, ইবনে রুশদ এবং ইবনে নাফিসের মত বিজ্ঞানীরা। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দের পর মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চায় গৌরবপূর্ণ সূর্য অস্তমিত হয় এবং পাশ্চাত্যের কাছে হারতে শুরু করে মুসলমানরা। অবশ্য এর পরেও মুসলমানদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চমক কখনও কখনও দেখা গেলেও (যেমন ১৪৩৭ সালে সমরখন্দে আমির তাইমুর পৌত্র উলুগ বেগের দরবার এবং ১৭২০ সালে মোগল সম্রাটের দরবারে জীজ মোহাম্মদ শাহীর সংকলন) তা ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী।

তবে বিজ্ঞানে ছয়'শ বছরের যে মুসলিম অবদান তা ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং বিজ্ঞান-রেনেসাঁর জনক। মুসলমানরা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থারও জনক। 'ইউরোপ যখন গির্জা ও মঠ ব্যতীত অপর সকল শিক্ষালয়ের কথা কল্পনাও করেনি, তার শত শত বছর আগে মুসলমানরা বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিল, যেখানে হাজারো ছাত্র উন্নত পরিবেশে পাঠগ্রহণ করতো।[৫] গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নও ইসলামি সভ্যতার অবদান। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল লাখো গ্রন্থে ঠাসা। ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর তখন ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছিল। ঐতিহাসিক Dosy-এর মতে স্পেনের আলমেরিয়ার ইবনে আব্বাসের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে অসংখ্য পুস্তিকা ছাড়া শুধু গ্রন্থের সংখ্যাই ছিল ৪ লাখ।[৬] এসব মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারটি ছিল বিজ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির সুতিকাগৃহ।

বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ছিল মুসলমানদের গৌরবজনক বিচরণ। গণিত শাস্ত্রে রয়েছে মুসলমানদের মৌলিক অবদান। আমরা যে ৯ পর্যন্ত নয়টি সংখ্যা ব্যবহার করি, তার অস্তিত্ব আগে থেকেই ছিল। কিন্তু 'শূন্য' (Zero)-এর বিষয়টি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে মোহাম্মদ ইবনে মুসা সর্বপ্রথম 'শূন্য' আবিষ্কার করেন। গণিত শাস্ত্রে ইনিই সর্বপ্রথম 'দশমিক বিন্দু' (decimal notation) ব্যবহার করেন। সংখ্যার স্থানীয় মান' (value of position) তারই আবিষ্কার। বীজগণিত বা 'এলজেব্রা' মুসলমানদের সৃষ্টি। মুসলিম গণিতজ্ঞ আল জাবের-এর নাম অনুসারে'এলজেব্রা' নামকরণ হয়। শিঞ্জিনী (sine), সার্শ-জ্যা (tangent) ও প্রতি

www.amarboi.org

স্পর্শ-ক্যক (co-tangent) প্রভৃতি আবিষ্কার করে বর্তুলাকার ত্রিকোণমিতির উন্নতি করেন মুসলিম বিজ্ঞানীরা। আলোক বিজ্ঞানে focus' নির্ণয়, চশমা আবিষ্কার মুসলিম বিজ্ঞানী আল হাজানের কীর্তি। কিন্তু রজার বেকন এই আবিষ্কার পাশ্চাত্যে আমদানি করে নিজেই এর আবিষ্কারক সেজেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'মানমন্দির'(observatory) ব্যবহার মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার। এর আগে 'মানমন্দির' সম্পর্কে কোন ধারণা কারও ছিল না। গণনা দ্বারা রাশি- চক্রের কোণ (angle of the ecliptic), সমরাত্রি দিনের প্রাগয়ন(pre- cission of the equinoxes), Almanac (পঞ্জিকা), Azimuth (দিগন্তবৃত্ত), Zenith (মস্তকোর্দ্ধ নভোবিন্দু), Nadir (অধঃস্থিত নভোবিন্দু), প্রভৃতির উদ্ভাবন মুসলিম বিজ্ঞানীদের কীর্তি। মুসলিম বিজ্ঞানীরাই চিকিৎসার বিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞানে রূপ দান করেন।[৭] ইউরোপ যখন খ্রিস্টান গির্জা ঔষধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা রোগের ব্যবস্থা দিতেন, তখন চিকিৎসা বিজ্ঞান মুসলমানদের হাতে এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীয় আল রাজীর চিকিৎসা বিষয়ক 'বিশ্বকোষ' দশখণ্ডে সমাপ্ত। এই চিকিৎসা বিশ্ব-কোষ ও ইবনে সিনা'র ব্যবস্থা' ইউরোপী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা কেমিস্ট্রির নামকরণই হয় মুসলিম বিজ্ঞানী 'আল কেমী'র নাম অনুসারে। কেমিষ্ট্রি'-এর সুবাসার (Alcohol), কাঠ ভস্ম-ক্ষারের ধাতার্বকমূল (patassium), পারদ বিশেষ (corrosive sublimate), কার্যকি (Nitrate of silver, যবক্ষার দ্রাবক (Nitric Acid) গন্ধক দ্রাবক(Sulphuric Acid), জুলাপ (Julep), অন্তসার (Elixer), কর্পূর (Caurphar), এবং সোমামুখী (senna), প্রভৃতি। মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার। ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। ইউরোপ যখন মনে করতো পৃথিবী সমতল, তখন বাগদাদে গোলাকার পৃথিবীর পরিধী নির্ণিত হয়েছিল। চন্দ্র যে সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়, একথা মুসলিম বিজ্ঞানীরা জানতেন। মুসলিম বিজ্ঞানীরাই চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের কক্ষ নির্ধারিত করেন। অতি গুরুত্বপূর্ণ কম্পাস যন্ত্র মুসলিম বিজ্ঞানির আবিষ্কার। মুসলমানরা নকশার বৈচিত্র ও সৌন্দর্য এবং শিল্প কৌশলের পূর্ণতা বিধানে ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বি। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিতল, লৌহ, ইস্পাত, প্রভৃতির কাজে তারা ছিলো দক্ষ। বস্ত্র শিল্পে এখনও মুসলমানদের কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। উত্তম কাচ, কালী, মাটির পাত্র, নানা প্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করাসহ রং পাকা করার কৌশল ও চর্ম-সংস্কারের বহুবিধ পদ্ধতি সম্পর্কে মুসলিম কুশলীরা ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। তাদের এসব কাজ ইউরোপে খুব জনপ্রিয় ছিল। সিরাপ ও সুগন্ধি দ্রব্য তৈরিতে মুসলমানদের ছিল একাধিপত্য। মুসলমানদের কৃষি পদ্ধতি ছিল খুবই উন্নত। তারা স্পেনে যে কৃষি পদ্ধতির প্রচলন করেন, ইউরোপের জন্য তা তখনও বিস্ময়। পানি সেচ পদ্ধতি তাদের উৎকৃষ্ট ছিল। মাটির গুণাগুণ বিচার করে তারা ফসল বপন করতেন। সারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা জানতেন। 'কলম' করা ও নানা প্রকার ফল-ফুলের উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনে তারা ছিলেন খুবই অভিজ্ঞ।

www.amarboi.org

বহু শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা বাণিজ্য-জগতের ছিল একচ্ছত্র সম্রাট। নৌ যুদ্ধে তারা ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তারা ছিলেন অতুলনীয় সমুদ্রচারী। তাদের জাহাজ ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত সাগর ও চীন সাগরে এককভাবে চষে ফিরত। মুসলিম নাবিকদের ছাত্র হিসাবেই ইউরোপীয়রা গভীর সমুদ্রে প্রথম পদচারণা করে। ভন ক্রেমার বলেন, আরব নৌবহর ছিল বহু বিষয়ে খ্রিস্টানদের আদর্শ।' মুসলমানদের যুদ্ধ-পদ্ধতি ও যুদ্ধ বিদ্যাও ইউরোপকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ইউরোপের Chivalry স্পেনীয় মুসলিম বাহিনীর অনুকরণ।

মোট কথা, বলা যায়, মুসলমান ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার যে অবদান রাখেন, তা এক নতুন সভ্যতার জন্ম দেয়, বিশ্ব সভ্যতাকে করে নতুন এক রূপে রূপময় যা চিন্তা, চেতনা, আচার-আচরণ, জীবন-যাপন, জীবনাপোকরণ সবদিক দিয়েই আধুনিক। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে সভ্যতার এই নতুন উথান-যাত্রা থেমে না গেলে আরও কয়েকশ' বছর অগেই বিশ্ব আধুনিক বিজ্ঞান যুগে প্রবেশ করতো। কিন্তু তা হয়নি। না হলেও তাদেরই ছাত্র ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা আরও কয়েকশ' বছর পরে হলেও মুসলমানদের কাজ সম্পন্ন করেছে। ইসলামি সভ্যতাকে বাদ দিলে বা মুসলমানদের অবদান মাইনাস করলে ইউরোপীয় রেনেসাঁ আর থাকে না, তার সভ্যতাও অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

লিওনার্দো এজন্যই লিখেছেন, "আরবদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর সভ্যতা, জ্ঞানচর্চা, সামাজিক ও মানসিক সমৃদ্ধি এবং অভ্রান্ত শিক্ষা-প্রথা বিদ্যমান না থাকলে ইউরোপকে আজও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকতে হতো।[৯]

রেফারেন্স ঃ

১। S. Khuda Bakhsh, M. A. BCL. Bar-at Law, প্রণীত 'Arab civilization গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬
২। 'A general History of Europe, Vol-1 Page-172
৩। Mayers, 'Mediaeval and Modern History' Page-54
৪। নোবেল বিজ্ঞানী আবদুস সালাম' এর 'Ideas and Realities' গ্রন্থে উদ্ধৃত (বাংলা অনুবাদঃ 'আদর্শ ও বাস্তবতা,' পৃষ্ঠা, ২৬৮
৫। Mayers, "Mediaeval and Modern History,' Page, 56
৬। Dozy, Spanish Islam'. Page 610
৭। Thateher Ph. D and F. Schwill Ph. D, 'A general History Europe', vol-1 page, 173
৮। Von Kremar এই উক্তি S. khuda Bakhsh- এর 'Arab civilization' এর উদ্বৃত, Page, 72
৯। Thatcher and F. Schwill, 'A general History of Europe, Vol-1 pages, 174-188

www.amarboi.org

অপরাধ দমনের দর্শন

মানুষের উপায় উপকরণগত দিকের বিচারে এই গ্রহ জীবনের উন্নতি যথেষ্টই হয়েছে। কিন্তু উন্নতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্য যদি হয় মানুষের সুখী জীবন, তাহলে বলতে হবে উন্নতি সমৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী থেকে ক্রমেই বিদায় নিচ্ছে। হত্যা, সংঘাত, সংঘর্ষ এবং অশান্তি–অস্বস্তিতে ভরে উঠছে এই পৃথিবীটা। লক্ষণীয়, অনুন্নত দেশগুলোর চাইতে উন্নত দেশগুলোতেই এই পাপ কর্মের পরিমাণ-পরিধি বেশি। আরও লক্ষণীয়, যে, সব দেশে কিছু পরিমাণেও ইসলামের আইন চালু আছে, সে সব দেশে অপরাধ সংগঠনের হার আশ্চর্যজনক কম। এর মধ্যে দিয়ে অপরাধ দমনে ইসলামি আইনের কার্যকারিতা এবং পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবন দর্শনের শূন্য গর্ভতা প্রমাণিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে আজকের দুনিয়ায় কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি যতটা হয়েছে, মনের মানবিক বিকাশ ততটা হয়নি। হয়নি শুধু নয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এক প্রকারের অবৈজ্ঞানিক মূর্খতা অনেক ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে বসেছে। সেকুলার ও নিরীশ্বরবাদী সমাজ চিন্তা এর দৃষ্টান্ত। এই অবৈজ্ঞানিক দর্শন ব্যক্তি চিন্তা এবং পরিবার ও সমাজ সম্পর্কের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে। এমন কি নীতিনিষ্ঠ ও মূল্যবোধ সমৃদ্ধ ধর্মীয় সমাজেও যখন কারিগরি জ্ঞানের আড়াল দিয়ে এই দর্শনের প্রবেশ ঘটছে, তখন সেই সমাজ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত নীতি–নিয়ম ও মূল্যবোধের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ফলে নীতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু শূন্যতা বলতে কোন জিনিস সৃষ্টিতে নেই। নীতিবোধ যখন কোথাও থেকে বিদায় নেয়, তখন সে জায়গটা শূন্য থাকে না। দুর্নীতি এসে সেখানে আসন গেড়ে বসে। শৃঙ্খলা যখন কোথাও থাকে না, সেখানে তখন বিশৃঙ্খলা আসেই। এইভাবে পাপবোধ যখন মানুষের মন থেকে লয় পেয়ে যায়, তখন অপরাধ সংঘটন আর তার কাছে অন্যায় মনে হয় না। পশ্চিমী সভ্যতা এবং পশ্চিমী সভ্যতা প্রভাবিত সমাজগুলোর এই অবস্থা এমন বীভৎস সমাজ দেহের জন্ম দিয়েছে যার তুলনা মাকাল ফলের সাথেই চলে। ব্যভিচার অপরাধের প্রায় সামাজিকরণ হয়ে গেছে সেখানে। ধর্ষণ পাপের এমন সয়লাব সেখানে যার জন্য পুরুষদের ঘর থেকে বের হবার বিরুদ্ধে কারফিউ জারির দাবি উঠে নারী সমাজের পক্ষ থেকে। খুন, ডাকাতি, সন্ত্রাস, রাহাজানি সেখানে মারাত্মক রকমে বাড়ছে। সভ্যতার চাকচিক্যপূর্ণ উপরি কাঠামোর আড়ালে সেখানে কি ধরনের পশু মানসিকতার সৃষ্টি হয়ে আছে, তার একটা বড় প্রমাণ পাওয়া গেছে গত কয়েক বছর আগে নিউইয়র্ক সিটিতে কয়েক মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ চলে যাবার ঘটনায়। প্রাচ্যের দেশগুলোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি রাতভর বিদ্যুৎ না থাকার ঘটনা অহরহই ঘটে, কিন্তু নিউইয়র্ক সিটিতে কয়েক মিনিট বিদ্যুৎ না থাকায় যা ঘটেছিল,

www.amarboi.org

তার এক আনাও অন্য কোথাও ঘটে না। বিদ্যুৎ না থাকার সুযোগে সেদিন নিউইয়র্ক সিটিতে হাজার হাজার ডাকাতি ও দোকান লুটের ঘটনা ঘটে। রাস্তা-ঘাট ও বাড়িতে ধর্ষিতা হয় হাজার হাজার নারী। ধর্মবোধকে বাদ দিয়ে এবং প্রতিষ্ঠিত নীতি ও মূল্যবোধকে হত্যা করে সভ্যতাকে যেভাবে ভারসাম্যহীন করা হয়েছে তারই ফল এটা। ইসলামি নীতি ও মূল্যবোধ এমন সমাজ জীবনের জন্ম দেয় যেখানে অপরাধমূলক ঘটনার এই সয়লাব কল্পনাই করা যায় না। আর এই নীতি ও মূল্যবোধই পারে এই সয়লাব রোধ করে সমাজে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে। ইসলামি আইনের এই ভূমিকাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ কি, এটা আমাদের প্রথমে জানা দরকার। ইসলামি আইনবেত্তাগণ বলেন, যা শাস্তিযোগ্য এমন কিছু কাজ করা অথবা যা করার নির্দেশ রয়েছে তা পরিত্যাগ করার নামই অপরাধ। এই সংজ্ঞা অনুসারে অবাধ্যতা, পাপ এবং হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, কারো বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে ঘৃণা ছড়ানো ইত্যাদির মত অন্যায় কর্মকাণ্ড ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে 'সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান' অর্থাৎ 'হুদুদ'-এর আওতায় পড়ে এমন সব কাজ এবং 'বিবেচনামূলক শাস্তির বিধান' অর্থাৎ 'তা'জীর' - এর আওতায় পড়ে এমন সব কাজকেই আমরা অপরাধ বলব। ইসলামি শাস্তি আইনে 'বিবেচনামূলক শাস্তি' অর্থাৎ 'তা'জীর'-এর ক্ষেত্র ব্যাপক। ইসলামি শরিয়ত বা ইসলামি জীবন বিধানের বাস্তবায়ন ও রক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখিত সব অপরাধই এর আওতায় পড়ে। 'হুদুদ'-এর মত এক্ষেত্রে শাস্তির বিধানটা সুনির্দিষ্ট নয়। বিচারক তদন্তের মাধ্যমে সব কার্য-কারণ বিচার করে এক্ষেত্রে শাস্তির বিধান দিয়ে থাকেন। সমাজ জীবনের সুস্থতা বিধানের জন্য 'তা'জীর' 'হুদুদ'-এর মতই আজ সমাজ গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামের শাস্তি আইনের উদ্দেশ্য মানুষকে কষ্ট দেয়া নয়। বরং অপরাধী, অপরাধ প্রবণ ও অন্যান্যদের নিরুৎসাহিত এবং তাদের সামনে ভয়ের বড় বাধা সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য। এজন্যই ইসলাম প্রকাশ্য স্থানে এবং সকলের সামনে অপরাধীদের শাস্তি কার্যকর করার বিধান দিয়েছে যাতে করে একজনের শাস্তি দেখে দশজন সংশোধন হতে পারে এবং সকলে অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ইসলামের এই দৃষ্টিভংগি অত্যন্ত সুবিবেচনা প্রসূত এবং বৈজ্ঞানিক যা অপরাধ দমনে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে, এখনও রাখছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে।

অন্যদিকে ইসলামি শাস্তি আইনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অপরাধের নিরাময় ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে। ইসলামি শাস্তি আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহে এখানে নিম্নলিখিতভাবে তুলে ধরা যায় ঃ

(এক) ইসলামের আইন-বিধান স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কর্তৃক প্রদত্ত। মানুষ এই বিধান মেনে নেয় পরকালীন জওয়াবদিহী ও শাস্তির ভয়ে, ইহজাগতিক কর্তৃপক্ষের ভয়ে শুধু নয়। এই বৈশিষ্টের দিক দিয়ে ইসলামি আইন জগতে অতুলনীয়।

(দুই) ইসলামের শাস্তি বিধান অপরাধের সাথে ভারসাম্যমূলক। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়তি জুলুম এখানে নেই।

www.amarboi.org

(তিন) ইসলামি আইন সুনির্দিষ্টভাবে শুধু অপরাধিকেই শাস্তি দান করে, একের অপরাধে অন্যের শাস্তি বিধান এখানে নিষিদ্ধ।

(চার) ইসলামি আইনের সামনে সকলেই সমান। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট, শক্তিশালী-দুর্বল, রাজা-প্রজা ইত্যাদির মধ্যে কোন ভেদ ইসলাম করে না। একজন দরিদ্র নাগরিকের অভিযোগে একজন রাষ্ট্র প্রধানকে এই আইনের অধীনে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হয় এবং শাস্তি মাথা পেতে নিতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যও অতুলনীয়।

(পাঁচ) ইসলামি আইন নৈতিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করে এবং সমাজকে ইসলামি শিক্ষা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে।

(ছয়) ইসলামি আইন বিধান যে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে, তার নিশ্চয়তা বিধানও ইসলামি আইন করে থাকে।

ইসলামি আইন মানুষের মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক। এই অধিকারগুলো যেমন ধর্ম, জীবন, জ্ঞান, ছেলে-সন্তান এবং সম্পদ-এর বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের জন্য পরকালিন শাস্তির অতিরিক্ত ইহকালীন শাস্তির ব্যবস্থা ইসলাম করেছে। প্রতিটি মানুষের অপরিহার্য এই অধিকার সংরক্ষণের কাজ ইসলাম দুইভাবে করেছে। প্রথমতঃ এটা করছে মানুষের অন্তঃকরণে ধর্মীয় সচেতনতা সৃষ্টি এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে তার মধ্যে মানবিক সতর্কতার উত্থান ঘটানোর দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ হুদুদ, কিসাস ও তা'জীর এর আওতায় শাস্তির বিধান দাঁড় করিয়ে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, ইসলামের কোন কোন শাস্তি আইন কারো কারো কাছে (যেমন পশ্চিমের তথাকথিত মানবতাবাদীরা) কঠোর মনে হতে পারে; কিন্তু এ আইন, এ বিধান সমাজের সার্বিক ভালাই ও বৃহত্তর মংগলের জন্যই প্রয়োজন। একজন অপরাধীর দিকে করুণার দৃষ্টি ফেলার সাথে সাথে যদি সমাজের অন্যান্য মানুষের মৌলিক অধিকারের মূল্য ও তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করা হয় তাহলে এটা বুঝা যাবে। পশ্চিমের অনেক দেশ শাস্তি আইনের ক্ষেত্রে অহেতুক উদার হতে গিয়ে দেশকে সীমাহীন অপরাধ সংঘটনের ভাগাড়ে পরিণত করেছে। ইতিহাস সাক্ষী, যে দেশে যে সমাজে ইসলামি আইন কার্যকরী হয়েছে, সেখানে অপরাধ কমে গেছে এবং যেখানেই যে কারণেই হোক অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি-বিধান থেকে পিছু হটা হয়েছে, সেখানেই অপরাধ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণেই আজ আধুনিক আইনতত্ত্ব ইসলামি বিধানের দাবি মেনে নিয়ে বলতে শুরু করেছে যে, অপরাধের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা একান্তভাবেই সমাজ এবং সমাজ শৃঙ্খলার প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যই অপরিহার্য।

ইসলাম অপরাধীদের প্রতি যে দৃষ্টিভংগি পোষণ করে, সে দৃষ্টিভংগিও সমাজ থেকে অপরাধের মূলোচ্ছেদে সহায়তা করে থাকে। ইসলাম কাউকেই আরোগ্যের অযোগ্য বলে মনে করে না। তওবার মাধ্যমে সংশোধন হওয়ার পথ ইসলাম খোলা রেখেছে। জঘন্য অপরাধীও তওবা করে ভালো হয়ে যেতে পারে। অপরাধীদের এইভাবে ভালো হওয়ার সুযোগ ইসলাম সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করে থাকে। নৈতিক

www.amarboi.org

মূল্যবোধ উজ্জীবনের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলাম তিনটি কাজের নির্দেশ দেয়। কাজগুলি নিম্নরূপ -

(এক) সুসংস্কৃত জনমত গঠন। ইসলাম মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে। সমাজের যারা ভালো ও চরিত্রবান, তাদেরকে ইসলাম দায়িত্ব দেয় মন্দ কাজ থেকে অন্যদের ফিরিয়ে রাখতে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংশোধনের এ দায়িত্ব সমাজে পালিত হলে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মুল করা সহজ হয়ে যায়।

(দুই) ভালোবাসা ও সহমর্মীতার অনুশীলন। ইসলাম প্রতিটি বিশ্বাসীকে সুকুমার এই হৃদয়বৃত্তিতে সজ্জিত হতে বলে এবং অপরাধকে ঘৃণা করে অপরাধীকে ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে অনুপ্রেরণা দেয়। সমাজের ভালো লোকদের এই সহমর্মীতা অপরাধীদের মনে সৎবৃত্তির উত্থান ঘটায় এবং অপরাধ সংঘটনে তাকে নিরুৎসাহিত করে।

(তিন) অশ্লীল কথা ও কাজের প্রচার না করা। অশ্লীলতার প্রচার না করলে তা যেমন গুরুত্ব হারায়, তেমনি অন্যান্য মানুষের পক্ষে এ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলছেন, কোন পাপের প্রচার না করলে ক্ষতি শুধু অপরাধীরই হয়, কিন্তু তা প্রচার করলে আল্লার রোষকেই উদ্দীপ্ত করা হয়।

মানুষের সংশোধন ও সমাজে অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে ইসলামের নৈতিক কর্মসূচী অত্যন্ত সুফলদায়ক। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেছেন, সংশোধনের নৈতিক পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষকে সব পাপপঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করা যায়।

মানুষের মধ্যে সৎবৃত্তি উজ্জীবনের নৈতিক কর্মসূচী ছাড়াও অপরাধ বিরোধী সামাজিক প্রতিরোধ কর্মসূচী ইসলাম দেয়। এই প্রতিরোধ কর্মসূচীকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করতে পারি।

(এক) অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য ইসলাম ৫টি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলে ঃ

(ক) মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ বৃদ্ধি এবং তাদেরকে পদস্খলন থেকে বাঁচানোর জন্য সহায়তার হাত প্রসারিত করা।

(খ) মানুষের মধ্যে ভালো কাজের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা।

(গ) ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার প্রবণতা সৃষ্টি করা।

(ঘ) মানুষকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক নির্দেশনা দান।

(ঙ) পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ বিনিময়ের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করা।

(দুই) অপরাধের প্রচার না করে বেড়ানো এবং অপরাধীদের অপরাধ করে চলতে না দেয়া।

(তিন) সন্দেহমুক্ত 'হুদুদ'-এর আওতাধীন অপরাধের ক্ষেত্রগুলোতে যথাযথভাবে শাস্তি আইনের প্রয়োগ করা। অনুরূপভাবে 'তা'জীর' এর ক্ষেত্রগুলোতে অর্থনৈতিক, সামাজিকসহ সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা।

www.amarboi.org

(চার) অপরাধীদের জন্য তওবার অবাধ পরিবেশ উন্মুক্ত রাখা।

(পাঁচ) অপরাধীদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না করা এবং অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের জন্য শাস্তির বাইরে কোন নিন্দা না করা।

(ছয়) অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী হবার জন্য উৎসাহিত করা।

(সাত) সকলের সমৃদ্ধ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানকারী নৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সামাজিক যে দায়িত্ব ইসলামি জীবন বিধান নির্দিষ্ট করেছে, তার বাস্তবায়নের প্রতি যত্ন নেয়া।

উপরে অপরাধ দমন এবং সমাজকে অপরাধ মুক্ত করার ক্ষেত্রে ইসলামের যে নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আইনগত বিধান ও কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হলো, তা শুধু আজকের বিশ্বে নয়, যে কোন সময়ে যে কোন যুগে অপরাধ দমন ও অপরাধের মূলোচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট। আজকের দুনিয়ায় ব্যাপক অপরাধ সংঘটন ও আইনভংগ করার মত প্রবণতার মধ্যে যে কারণগুলো নিহিত রয়েছে তা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকা।

(খ) উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না থাকার কারণে শাস্তির ভয় কমে যাওয়া।

(গ) আইন ও শাস্তিকে পাশ কাটানোর সুযোগ থাকা।

(ঘ) শাস্তি পদ্ধতি অপরাধীকে সংশোধন না করে আরও বড় অপরাধীতে পরিণত করা।

(ঙ) সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সংশোধনের ব্যবস্থা না থাকা।

(চ) ভাল হয়ে সমাজে মর্যাদার সাথে পুনর্বাসিত হবার সুযোগ অপরাধীরা না পাওয়া।

(ছ) নৈতিক সংস্কারের কোন সুযোগ না থাকা।

(জ) ধর্মবোধ, পাপ-পুণ্যের ধারণা এবং কৃত কর্মের জন্য পরকালীন জওয়াবদিহী ও শাস্তির ভয় না থাকা।

বিশ্বের অপরাধ পীড়িত দেশের সমাজ ব্যবস্থাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাদের দুরবস্থার মূলে উপরের একাধিক অথবা সবগুলো কারণই সক্রিয় রয়েছে। আজ জগতে এই কারণগুলো দূর করার ক্ষমতা একমাত্র ইসলামি আইনই রাখে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইসলামে অনেকটা সহজাত। ইসলামি বিধানাবলি যেহেতু আল্লার দেয়া সেহেতু এর প্রতি মানুষ বিশেষ ভয় ও শ্রদ্ধাপোষণ করে যা মানব রচিত আইনের ক্ষেত্রে কল্পনাই করা যায় না। ইসলাম নির্ধারিত শাস্তি আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং ইসলামের শাস্তি বিধানকে অপরাধীরা ভয় করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে ইসলামি সমাজে ধনী, প্রতিপত্তিশালী, উজির-নাজীর কারো পক্ষেই শাস্তিকে পাশ কাটানোর সুযোগ নেই। ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফাকেও এখানে কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হয়। এই কারণে ইসলামি আইনের অধীনে সমাজের প্রতিপত্তিশালী-পরাক্রমশালীরাও ইসলামের শাস্তি আইনকে ভয় করে চলে। ইসলামি আইন একজন অপরাধীকে নামকা-ওয়াস্তে শাস্তি দিয়ে আরো অপরাধ সংঘটনের জন্য সমাজে ছেড়ে

www.amarboi.org

দেয় না। খুন, ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতির এমন কঠোর শাস্তি ইসলাম দেয় যার ফলে অপরাধীরা এই অপরাধের পুনরাবৃত্তির আর কোন সুযোগ সাধারণতঃ পায় না। 'তা'জীর'-এর আওতাধীন অপরাধের ক্ষেত্রেও রয়েছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা। এ সব শাস্তির পাশাপাশি ইসলাম দিয়েছে সহযোগিতামূলক সংশোধন, অপরাধীদের মর্যাদাপূর্ণ পুনর্বাসন এবং নৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি। সর্বোপরি ইসলামি সমাজে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করা হয় ধর্মবোধ, পাপ-পুণ্যের ধারণা এবং কৃত কর্মের জন্য পরকালীন জওয়াবদিহী ও শাস্তির ভয়। ইসলামের এই ব্যবস্থা দুনিয়াতে অদ্বিতীয়। দুনিয়ার অনেক দেশেই আইন আছে, আইনের কড়াকড়িও আছে, কিন্তু ধর্মীয় এই ভিত্তি সেখানে অনুপস্থিত। যা এমনকি এককভাবেই মানুষের মন থেকে যাবতীয় অপরাধ প্রবণতার মূলোচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম। খোদায়ী আদেশ নিষেধ বিশ্ববাসীদের জন্য এমন একটা আইন যার বাস্তবায়নের জন্য কোন পুলিশের দরকার হয় না, কোন পাহারার দরকার পড়ে না। মদ খাওয়া বন্ধ করার ক্ষেত্রে আমেরিকান চেষ্টার ব্যর্থতা এবং মহানবীর চেষ্টার সাফল্যও আজকের দুনিয়াতেও মুসলিম দেশে মদ খাওয়া হারাম বা পাপের ব্যাপার। এমন খোদাভীরু লোকদের যে সমাজ সে সমাজই হয় সুখের, শান্তির এবং প্রকৃত সমৃদ্ধির। আর এ ধরনের লোক তৈরিই ইসলামি আইন বিধানের মৌল প্রোগ্রাম। ইসলামের এ প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হলে শুধু একটি সমাজে নয়, শুধু একটি দেশে নয়, গোটা বিশ্বে অপরাধ প্রদমিত হয়ে, অপরাধের মুলোচ্ছেদ ঘটে আসতে পারে অনাবিল এক শাান্তি ও স্বস্তি যার জন্য বিশ্বের মানুষ আজ হাহাকার করছে।

অনাবিল শান্তি ও স্বস্তির এই সমাজ আমরা দেখেছি ইসলামের স্বর্ণযুগে যখন ইসলামের আইন বিধান পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীকালে উমাইয়া, আব্বাসীয়, ওসমানীয় শাসনামলে যখনই কোন শাসক ইসলামি বিধানাবলির অনুকরণ ও প্রয়োগে জোর দিয়েছেন, তখনই অপরাধের উদ্যত মস্তককে আমরা প্রদমিত হতে দেখেছি, কায়েম হতে দেখেছি সমাজে শান্তি ও স্বস্তি। আজকের যুগেও এই দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত নয়। সউদি আরবের দৃষ্টান্ত আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'রিসার্চ সেন্টার ফর প্রিভেনশন অব ক্রাইম'-এর ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ ফারুক আবদুর রহমান মুরাদ তার এক নিবন্ধে বলছেন-

"বিভেদ বিশৃঙ্খলার শিকার আরব উপদ্বীপকে সৌদি শাসন একক একটি রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে নিয়ে আসার পর পরই সেখানে জীবনের সকল স্তরে শরিয়াতী বিধানের বাস্তবায়ন শুরু হয়। অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের প্রতি। ফলে বিশৃঙ্খলার বদলে ঐক্য, সামাজিক অস্থিরতা ও গোত্র-দ্বন্দ্বের পরিবর্তে আসে স্থিতিশীলতা এবং জীবন, সম্মান ও সম্পদ নিয়ে দুশ্চিন্তার বদলে আসে নিরাপত্তার আরামদায়ক অনুভূতি। এর আগে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সকল সুবিধা কুক্ষিগত ছিল এবং অন্য পনর আনা মানুষ 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যেত। এখন আইনের চোখে সবাইকে সমান মর্যাদা দেয়া হলো যার ফলে মানুষ শান্তি, সামাজিক সুবিচারের মুখ দেখল।"

www.amarboi.org

ISBN : 984-8685-56-1